ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রথম খণ্ড : প্রাচীন যুগ

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২ :: ১৯৭৪

এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ ভট্টাচার্য শুধু বিপুল তথ্যরাজিরই সমাবেশ ঘটাননি, সেগুলির ভিত্তিতে পাঠক-পাঠিকারা যাতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধারণা গঠন করতে পারেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, যার ফলে প্রাচীনতম যুগ থেকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতি-প্রকৃতির একটা জীবন্ত চিত্র পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। কয়েকটি মূল সূত্রের সাহায্যে এই গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা করা এবং সংশ্লিষ্ট বিপুল তথ্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য আবিষ্কার করা যে সত্যই সম্ভব, এই গ্রন্থে তাও প্রদর্শিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস, তিনখণ্ডে প্রকাশিতব্য যে গ্রন্থের আরও দুটি খণ্ড, মধ্য ও আধুনিক যুগ, পরে প্রকাশিত হবে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রথম খণ্ড : প্রাচীন যুগ

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ফার্মা কে: এল. মুখোপাধ্যায়
২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
১৯৭৪

প্রকাশক—ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৭৪

মূল্য : লাইব্রেরী সংস্করণ, কুড়ি টাকা
পেপারব্যাক সংস্করণ, পনের টাকা

মুদ্রক : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড,
কলিকাতা-৩৭

ডঃ অমিতা রায়
বন্ধুবরেষু

মুখবন্ধ

বর্তমান গ্রন্থটির কোন বিশেষ ভূমিকা লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না, কেননা এখানে প্রত্যেকটি অধ্যায়েরই বিষয়বস্তু উপস্থাপনার আগে ভূমিকা হিসাবে কিছু কথা বলা আছে, যা থেকে বিচক্ষণ পাঠক-পাঠিকারা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতি প্রকৃতির মূল সূত্রগুলিকে সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অপরাপর ধারার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে আগ্রহী ব্যক্তিরা দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর *Introduction to the study of Indian History* এবং *Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline* এই বই দুখানি পড়ে দেখতে পারেন। এতদ্ব্যতীত বর্তমান গ্রন্থের শেষে প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর অধিকতর চর্চার উপযোগী, এবং এই গ্রন্থ রচনায় যে সকল বই ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলির একটি অধ্যায়-ভিত্তিক তালিকা, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠাঙ্ক সহ, দেওয়া হয়েছে। একটি বিষয়-ভিত্তিক নির্দেশিকাও এখানে সংযোজিত হয়েছে, যা প্রস্তুত করতে গিয়ে বন্ধুবর সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য পেয়েছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
৫১।২, হাজরা রোড
কলিকাতা-১৯

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৪

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ট্রাইব থেকে রাষ্ট্র

১ ॥ জনজীবনের অসম বিকাশ

ভারতবর্ষের সর্বত্র রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ একই সময়ে হয়নি, যার মূল কারণ ভারতীয় জনজীবনের অসম বিকাশ, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় *uneven development*। এমন কি আজকের যুগেও গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে জনজীবনের এই অসম বিকাশের চেহারাটাই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। আর বিকাশ অসম বলেই, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন মানের সংস্কৃতির সীমায় আবদ্ধ থাকার দরুণ, এবং সেগুলির পারস্পরিক যোগসূত্র ক্ষীণ হবার কারণেই, যাদের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও বিবর্তনকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে চালানো হয়, তারা মূলত উচ্চবর্ণের মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ নয়। ভারত-ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এই কথাটি সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার।

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি, ধর্মব্যবস্থা ও সামাজিক মূল্যবোধ-সমূহের বিবর্তন, শিল্পকলা ও সাহিত্যের ভঙ্গী ও পদ্ধতিসমূহ, সব কিছুই উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কসমূহের বিকাশের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। তাই ইতিহাসের কোন শাখাকেই অপরাপর শাখাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না, যদিও এই বিচ্ছিন্ন করে দেখার পদ্ধতি চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নততর কলাকৌশলের সঙ্গে অর্ধোন্নত ও একান্ত অনুন্নত কলা-কৌশলের বিচিত্র সহাবস্থান আজকের যুগের ভারতবর্ষের মত প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষেরও বৈশিষ্ট্য ছিল, এবং তার বহু বাস্তব চিত্র অতীত যুগের রচনাবলী থেকে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে পিছিয়ে-পড়ে-থাকা ট্রাইবাল মানুষদের যে চিত্র আঁকা আছে, তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির যে বর্ণনা দেওয়া আছে, সেগুলির সঙ্গে আজকের যুগের পিছিয়ে-পড়ে-থাকা ট্রাইবাল জীবনের বিশেষ পার্থক্য নেই, কালধর্মে হয়ত বহিরঙ্গের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে এই মাত্র। নিম্ন ও উচ্চ শিকারজীবী পর্যায়ের এবং নিম্নকৃষি ও পশুপালক পর্যায়ের প্রাচীন

সংস্কৃতিগুলির কিছু অবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন। তবে এদেশে প্রাক-লিপি প্রত্নতত্ত্বের এখনও শৈশবাবস্থা এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে আজকের দিনের ট্রাইবাল জীবন ও প্রাচীন যুগের সাহিত্যগত তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় নি। খাদ্য সংগ্রাহক স্তর থেকে খাদ্য উৎপাদনের স্তরে উত্তরণ, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, উদ্বৃত্তের সৃষ্টি ও তা থেকে প্রাচীন নগরসমূহ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার পদ্ধতি নিয়ে এ পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তা যৎসামান্য।

ট্রাইব বলতে আমরা কাদের বোঝাচ্ছি, ট্রাইবাল ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার পার্থক্য কোথায়, কিভাবে ট্রাইবাল ব্যবস্থা ভেঙে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়, সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা দরকার। রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা আমরা জানি তা হচ্ছে এই যে, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকবে, সেখানে মানুষ থাকবে, সেই মানুষদের জন্য একটি সরকার থাকবে, এবং সেই সরকারকে সার্বভৌম হতে হবে, এবং এই শর্ত যেখানে পূর্ণ হবে সেখানে রাষ্ট্র রয়েছে বলে আমরা ধরে নেব। ট্রাইবও যে এই চারটি শর্ত পূর্ণ করে, সেটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নজর এড়িয়ে গেছে, এবং অনেক বড় বড় পণ্ডিতই ট্রাইব ও রাষ্ট্রের পার্থক্য অনুধাবন করেন নি। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সদস্যদের কোন আত্মিক বন্ধন নেই, ট্রাইবের ক্ষেত্রে এটাই সব, জ্ঞাতিভিত্তিক সম্পর্কটাই এখানে বড় কথা। একটা ট্রাইব গঠিত হয় কয়েকটি ক্লান নিয়ে, প্রতি ক্লানেরই প্রতি সদস্যের মর্যাদা সমান। সাবালক হলে ক্লানের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তিকেই বিশেষ অনুষ্ঠানের মারফৎ ক্লানের পূর্ণ সদস্য করা হয় এবং তাদের সামাজিক নিয়মসমূহের সঙ্গে পরিচিত করা হয়। ক্লানের আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে পূর্ণবয়স্ক সকলেই অংশগ্রহণ করে, এবং বিভিন্ন ক্লানের দলপতিদের নিয়ে গড়ে ওঠে ট্রাইবাল-কাউন্সিল যা গোটা ট্রাইবটার স্বার্থ দেখাশোনা করে। একটা ট্রাইব যে সম্পদ আহরণ করে তা সমভাবে বিতরিত হয় তার অন্তর্গত ক্লানসমূহের মধ্যে, এবং ক্লান-কাউন্সিল তা ভাগ করে দেয় সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে। সহজ কথায়, ট্রাইবাল সমাজে সামাজিক শ্রেণীভেদ অনুপস্থিত, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কিন্তু বিপরীতটিই সত্য। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত, যার উপরতলার মানুষেরা বিশেষ সুবিধাভোগী, আর তাদেরই স্বার্থরক্ষার জন্য আইনকানুন, পুলিশ ও সামরিক ব্যবস্থা, প্রশাসক-বর্গ, রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা ইত্যাদি।

কিভাবে ট্রাইবাল ব্যবস্থা ভেঙে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। বর্তমান পৃথিবীর টিঁকে থাকা ট্রাইবগুলিকে নানাভাবে চিহ্নিত করার

চেষ্টা হয়েছে, মোটামুটি সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে হবহাউস, হুইলর ও গীনস্‌বার্গ অনুসৃত পদ্ধতি থেকে, যাঁরা খাদ্য আহরণ ও খাদ্য উৎপাদনের সবচেয়ে মৌলিক ব্যবস্থার দিক থেকে টিঁকে থাকা ট্রাইবগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন—শিকারজীবী, পশুপালনজীবী ও কৃষিজীবী। শিকারজীবী পর্যায়ের দুটি স্তর। নিম্নস্তরের শিকারজীবীরা ফলমূল আহরণ ও পশুশিকারের দ্বারা খাদ্যের সংস্থান করে। অস্ত্র ব্যবহারের দিক থেকে তারা তীরধনুকের ব্যবহারে অভ্যস্ত। তা ছাড়া এই স্তরে হাঁড়িকুড়ি তৈরী, কাপড় বোনা, এবং পশুকে পোষ মানাবার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এভাবে বিভিন্ন পেশার উদ্ভব হলেও সমাজ বিকাশের এই স্তরে পেশাদার শ্রেণী সৃষ্টি হয়নি। পশুপালনজীবী পর্যায়ের দুটি স্তর, উচ্চতর স্তরটিতে পশুপালনের সঙ্গে কৃষিকাজ যুক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে কৃষিজীবী পর্যায়ের তিনটি স্তরের মধ্যে উচ্চতম স্তরটির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেখানে কৃষিকাজের সঙ্গে পশুপালনও যুক্ত হয়েছে, পশুবাহিত লাঙ্গলের প্রচলন ঘটেছে। অধ্যাপক জর্জ টমসন দেখিয়েছেন যে পশু-পালনজীবী ও কৃষিজীবী পর্যায়ের উচ্চতর স্তরগুলিতে কারিগরী, স্থায়ী আবাস স্থাপন ও ধাতুর ব্যবহার বহুলাংশে বেড়ে যায়, এই স্তরগুলিতেই উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়, সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়, আর তারই ফলে শেষ পর্যন্ত ট্রাইবাল ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে, রাষ্ট্রশক্তির লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে রচিত বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথির সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে এদেশে উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থাগুলির পাশাপাশি আদিমতম জীবনধারণ পদ্ধতি অর্থাৎ শিকার-নির্ভরতা টিঁকে আছে। আজকের ভারতবর্ষেও বহু ট্রাইব শিকার ও সংগ্রহের স্তরে আবদ্ধ রয়েছে, যেমন আসামের কুকি ও কোনিয়াক, বিহারের খারিয়া ও বিরহোর, উত্তর প্রদেশের রজি, মধ্য প্রদেশের পার্বত্য মারিয়া, উড়িষ্যার জুয়াঙ্গ, দক্ষিণ ভারতের কোয়া, কোন্টা-রেড্ডি, পলিয়াম, কাদার, পার্বত্য পান্তারাম প্রভৃতি। অনুরূপভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার পরবর্তী পর্যায়গুলিতেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আবদ্ধ রয়েছে, যেমন নিম্ন-পশুপালক পর্যায়ে আবদ্ধ রয়েছে নীলগিরি পাহাড়ের টোডারা, উচ্চ পশুপালক পর্যায়ে আবদ্ধ রয়েছে অসংখ্য ট্রাইব যার নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব ভারতের অনেক জনগোষ্ঠী আজও নিম্ন-কৃষি পর্যায়ে আবদ্ধ রয়েছে। গর্ডন চাইল্‌ডের মতে, প্রত্নতত্ত্বে যাকে বলা হয় নবাশ্মীয় যুগ, তখন থেকেই উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সূত্রপাত ঘটেছে। পাকাপোক্ত গ্রামনিবেশ মানব-ইতিহাসের এই পর্যায়েই

হয়েছিল এবং ভূমির উদ্বৃত্ত ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল কয়েকটি নূতন অর্থনৈতিক শ্রেণীর দ্বারা, যারা প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ছিল না। এই শ্রেণীগুলি ছিল কারিগর, পুরোহিত, পরিচালক, বণিক প্রভৃতি, যাদের হাতে সামাজিক উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ চলে এসেছিল যা থেকে নগর ও নাগরিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। এই গুণগত পরিবর্তনটি ত্বরান্বিত হয়েছিল তামা ও ব্রোঞ্জ আবিষ্কারের পর, ভারতবর্ষে যার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় সিন্ধু সভ্যতায়। অত্যন্ত সুবিস্তৃত কৃষিকাজের পটভূমি ছাড়া হরপ্পা, মোহেঞ্জোদরো প্রভৃতি শহরগুলির বিকাশের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে শিকারজীবী পর্যায় থেকে পশুপালনমূলক পর্যায়ে উত্তরণের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত হলেও, তার ফলশ্রুতির দিকটি বৈদিক সাহিত্যের কৃপায় আমাদের অজানা নেই। ঋগ্বেদের রচনাকালে ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ হলেও সেখানে যে জীবনধারার কথা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময় থেকে উত্তর ভারতের অনেকটা অংশ জুড়েই পশুপালনমূলক অর্থনীতির বিজয় ঘটেছিল।

ঠিক একশো বছর আগে হাণ্টার মন্তব্য করেছিলেন, ভারতবর্ষ যেন জাতিতত্ত্বের, অর্থাৎ উৎপাদনব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে আটকে থাকে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর, একটি বিরাট জাদুঘর যেখানে মানুষকে তার সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা যায়। হাণ্টারের সামনে ছিল আংশিকভাবে কৃত ১৮৭১-এর সেন্সাস রিপোর্ট, যাতে দেখানো হয়েছিল ১৮৬০ লক্ষ ভারতীয়ের মধ্যে ১৮০ লক্ষ ট্রাইবাল, সরকারী ভাষায় অ্যাবরিজিনাল। বাকি ১৬৪০ লক্ষের মধ্যে ১৬০ লক্ষ উচ্চবর্ণের মানুষ যারা নাকি আর্যবংশীয়। অবশিষ্ট ১৫২০ লক্ষ মানুষ কোথা থেকে এসেছিল তার কোন হিসাব নেই। বলা হল, এরা আদিতে ছিল অনার্য ও সভ্যতাবিহীন, আর্যরা তাদের ক্রমে ক্রমে সভ্য করেছে, একালের ইংরাজদের মতই। এই ট্রাইবাল মানুষদের 'সভ্য' করার পদ্ধতি হচ্ছে, হাণ্টার যা বলেছেন, তথাকথিত 'সভ্য' সমাজগুলির জন্য এদের থেকে মানুষ সংগ্রহ করা, চাষের প্রয়োজনে, উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যান্য প্রয়োজনে এবং সামরিক প্রয়োজনে। ১৮৭১ এর সেন্সাস রিপোর্টকারদের মতে যদি ১৫২০ লক্ষ লোকের 'সভ্য' হবার ইতিহাস এই হয়, তাহলে এই ইতিহাস খুবই প্রাচীন হতে বাধ্য এবং সত্যই তাই। বহুপূর্বে কৌটিল্য খোলাখুলিই বলেছিলেন, যে কোন উপায়েই হোক গণ বা সংঘগুলিকে, অর্থাৎ ট্রাইবাল সমাজগুলিকে, ভেঙে

চুরমার করতে হবে, এবং তারপর সেই ট্রাইবাল মানুষদের গণবন্ধন থেকে মুক্ত করে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে, বৃত্তিমূলক কর্মে এবং সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কৌটিল্য যে পদ্ধতির সুপারিশ করেছিলেন, সেই পদ্ধতিই যুগের পর যুগ ধরে কার্যকর রয়েছে, আর এই অট্রাইবীকরণ, process of detribalisation, আজও সমানে চলেছে, যদিও তা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯৫১র সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের আদিবাসী বা ট্রাইবাল মানুষদের সংখ্যা ১৯১ লক্ষ, প্রতি ১০০০ ভারতীয়ের মধ্যে ৫৪ জন। ১৯৬১র রিপোর্টে ওই সংখ্যা তিন কোটির কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১-এর সেন্সাস রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি, তবে কাঁচা হিসাব যা প্রকাশিত হয়েছে তা অনুযায়ী ট্রাইবাল মানুষের বর্তমান সংখ্যা ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৫৩ জন। এরা ছাড়া আরও যে কোটি কোটি মানুষ আমাদের সমাজব্যবস্থার নিম্নতর স্তরগুলিতে অবস্থান করছে, নিম্ন বলে কথিত অসংখ্য বৃত্তির কোন একটিকে অবলম্বন করে টিঁকে আছে, তারা নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত process of detribalisation-এর ফলশ্রুতি। নানাপ্রকার প্রলোভনের দ্বারা বিভিন্ন ট্রাইব থেকে মানুষ এনে তাদের গ্রামে জনপদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের উপর নির্দিষ্ট পেশা আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে ট্রাইবাল পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে তারা প্রথমে পরিণত হয়েছে পেশাদার গোষ্ঠীসমূহে (occupational groups), এবং পরে এই পেশাদার গোষ্ঠীগুলি, তাদের পেশার গুরুত্ব অনুযায়ী, বৃহত্তর হিন্দু সমাজের আওতায় বিভিন্ন মর্যাদার caste বা জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য ব্যাপারটি যে একতরফা ঘটেছে তা নয়। বহু ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে নিজেদের অভ্যস্ত পরিবেশে জীবিকাসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে, ট্রাইবাল মানুষেরা নিজেরাই লোকালয়ের দিকে এগিয়েছে, অপেক্ষাকৃত উন্নততর মানবগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন পেশা অবলম্বনে টিঁকে থাকতে চেয়েছে এবং কালক্রমে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। অধিকতর আদিম ট্রাইবসমূহ, যারা কোন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি, অন্যকথায় যাদের মধ্যে উৎপাদন-মনস্কতা গড়ে ওঠে নি, যারা ছিল মূলত শিকার ও সংগ্রহজীবী, বহুক্ষেত্রে এমন অবস্থাও ঘটেছে যে নিজেদের আরণ্যক পরিবেশে খাদ্যসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে তারা বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু কোন উৎপাদনমূলক বৃত্তি অবলম্বন করতে না পেরে তারা ভিক্ষুক ও চোরডাকাতে পরিণত হয়েছে।

ট্রাইবাল পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে এইভাবে যারা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের আওতায় এসেছে, বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন caste বা জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এদের নিয়ে শাস্ত্রকারদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। প্রাচীন পুঁথিপথে যে চতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা একটা কল্পিত সামাজিক আদর্শ, যার বাস্তব অস্তিত্ব কোন দিনও ছিল না, আজও নেই, যা ছিল বা আছে তা হচ্ছে পেশার ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজ, নির্দিষ্ট পেশাসহ অসংখ্য জাতি। শাস্ত্রকারদের সমস্যা ছিল এই হাজার হাজার জাতিকে চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে ঢোকাবার এবং তা ব্যাখ্যা করার সমস্যা, আর তা করতে গিয়ে তাঁরা আজগুবি বর্ণসংকর তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন। প্রাচীন পুঁথিপত্রের সাক্ষ্য থেকে অন্তত একটা নিয়ম প্রমাণিত হয় যে পুত্রের জাতি পিতার জাতির দ্বারাই নির্ধারিত ছিল, এবং সেই হিসাবে বর্ণসংকর তত্ত্বের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। রিচার্ড ফিক দেখিয়েছেন, যে সকল জাতিকে বর্ণসংকর আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলির উৎস সম্বন্ধে নানারকম কাল্পনিক কাহিনীর প্রচার করা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশেরই নাম স্থানবাচক বা ট্রাইববাচক।

আমাদের দেশে পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের মধ্যে বাস্তবে ট্রাইবাল ব্যবস্থা ও জাতব্যবস্থার সীমারেখা মোটেই স্পষ্ট নয়, বিভিন্ন সূত্র থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করেছেন এবং সুনিশ্চিতভাবে দেখিয়েছেন যে জাতিভেদ প্রথা আসলে ট্রাইবাল সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিণাম—ট্রাইবাল সমাজের ধ্বংসাবশেষ এরই মধ্যে টিঁকে আছে, যদিও ট্রাইবাল সমাজের মূল প্রাণশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংসাবশেষটির আদি তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের দেশে উৎপাদন কৌশলের উন্নতির উপর নির্ভর করে ট্রাইবাল সমাজ ভিতর থেকে ভেঙে সর্বক্ষেত্রে নূতন সমাজের পথ করে দেয়নি। এখানে স্থানে স্থানে রাষ্ট্রশক্তি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তাদের ঘিরে ছিল পুরোনো ট্রাইবাল সমাজ, যেগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কেরা এই সমাজগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন, এবং এই সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে গ্রামনিবেশ করেছিলেন। আর এই পদ্ধতির অনুসরণ চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। স্বভাবতই ভারতের গ্রামজীবনের মধ্যে ট্রাইবাল সমাজের চিহ্ন অনেক স্পষ্টভাবে টিঁকে আছে, যেমন জাতিভেদ, গ্রামসমবায়, লোকন্যায়মূলক আইন, লোকায়তিক ধর্ম-আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি, যেগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেনি, যদিও এই স্মারকগুলির আদি তাৎপর্যের রূপান্তর ঘটেছে।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নিঃসন্দেহে ভারতীয় জনজীবনের অসম বিকাশের প্রতিচ্ছবি, যা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখব। শুধু প্রাচীন বা মধ্য যুগেরই নয়, অতি আধুনিক যুগের ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির গতিপ্রকৃতিও উপরি-উক্ত পরিস্থিতিগুলির দ্বারা যে নিয়ন্ত্রিত আশা করি এটা বুঝতেও অসুবিধা হবে না। কিন্তু ভূমিকাকে আর দীর্ঘতর করার প্রয়োজন নেই, এখন দরকার সুদূর অতীতে প্রত্যাবর্তন করার।

২ ॥ আদিপর্ব : প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য : আদি অশ্ম যুগ

রিচার্ড ফিক বলেছিলেন, ভারতের আধুনিক পরিস্থিতিতেও প্রাচীন অবস্থার অনেক কিছু টিঁকে আছে, তাই প্রাচীন অবস্থাকে বোঝাবার জন্য আধুনিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। উৎপাদন ব্যবস্থার নিম্নতর পর্যায়গুলিতে আটকে থাকা বহু ট্রাইব আজও ভারতবর্ষে বর্তমান রয়েছে, নিজেদের সামাজিক জীবনে যারা স্বশাসিত, কিন্তু যাদের মধ্যে কোন রাষ্ট্রীয় চেতনা গড়ে ওঠেনি। এদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি প্রাচীন যুগের মানবগোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রার পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে। প্রাচীন যুগে রচিত পুঁথিসমূহে, এমন কি হেরো-ডোটাস বা মেগাস্থেনেসের মত বিদেশীদের রচনাতেও, এই শ্রেণীর মানুষদের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নিখুঁতভাবে জানতে গেলে আমাদের প্রয়োজন, নৃতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্য যে সকল তথ্য হাজির করে, সেগুলিকে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাবলীর আলোয় বিচার করা, কেননা আদিম মানুষ যা 'করেছিল' তারই নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ব আমাদের সামনে হাজির করে।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, তামিলনাড়ু, বিহার, বাংলা ও আসাম থেকে মুখ্যত কোয়ার্টজাইট বা স্ফটিকধর্মী পাথরে তৈরী বহু অমসৃণ হাতিয়ার আবিষ্কার করেছেন যেগুলি ইউরোপের প্রত্নাশ্মীয় বা প্যালিওলিথিক হাতিয়ার সমূহের অনুরূপ, কিন্তু যেহেতু সেগুলি প্রধানত এখান-ওখান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সামগ্রী, সেগুলিকে কোন নির্দিষ্ট ভূতাত্ত্বিক যুগে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৩৫-এ ডি. টেরার নেতৃত্বে ইয়েল-কেম্ব্রিজের একটি সমীক্ষক দল ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ের তুষার যুগগুলির সঙ্গে এখানকার প্রাচীন মানব সংস্কৃতিগুলির সম্পর্ক নির্ণয় করার একটা সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায়, যার ফলে জানা যায় যে প্রথম অন্তর্হিমবাহ যুগের অবসানকালে এবং দ্বিতীয় তুষার যুগের সূত্রপাতকালে হিমালয়ের দক্ষিণ পশ্চিমে, পাঞ্জাবের আটক ও রাওয়ালপিণ্ডি

জেলায় এবং জম্মুতে, সোয়ান, হারো এবং সিন্ধু-ঝিলমের মধ্যবর্তী অপরাপর নদী অঞ্চলে, মানব জাতির অস্তিত্ব ছিল, এবং বাস্তবিকই এই সব অঞ্চল থেকে কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে, প্রত্নতত্ত্বের ভাষায় যেগুলিকে বলা হয় flake। এগুলি হচ্ছে একটা গোটা পাথরের চারপাশ ছেঁটে ফেললে যে ধারালো ফালিগুলি পাওয়া যায় সেইগুলি। Flake-গুলি খসিয়ে নেবার পর পাথরের যে মূল অংশটি অবশিষ্ট থাকে তা দিয়েও অস্ত্র তৈরী হত, যেগুলিকে বলা হয় core। ভারতবর্ষে আমরা উভয় শিল্পেরই বিকাশ দেখতে পাই, flake প্রধানত উত্তরে এবং core মূলত দক্ষিণে।

প্রথম অন্তর্হিমবাহ যুগের শেষ দিকে মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে পাঁচ জায়গায়, ঝিলম ও তার শাখানদীগুলির উপত্যকায় কল্লার, চৌমুখ ও মলকপুরে, জম্মুর নিকটে চেনাব নদীর শাখা তবই-এর তটভূমিতে এবং সোয়ান নদীতটে আডিয়াল নামক স্থানের নিকটে। পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয় অন্তর্হিমবাহ যুগে, সোয়ান শিল্পধারার বিকাশ আরও স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। এই শিল্পধারাকে মোট দুভাগে ভাগ করা হয়—আদি ও পরবর্তী। আদি সোয়ান হাতিয়ারসমূহ পাওয়া গেছে কুশলগর, মকহদ ও ইঞ্জরাতে এবং হারো নদীর উপত্যকায় গরিয়াল নামক স্থানে। হাতিয়ারগুলি মূলত কোয়ার্টজাইট পাথরের তৈরী, এছাড়া নদীস্রোতে বাহিত মসৃণ উপলখণ্ড দিয়ে তৈরী নানা ধরণের হাতিয়ারের সন্ধানও পাওয়া গেছে। আদি-সোয়ান ও পরবর্তী-সোয়ানের অন্তর্বর্তী যুগটি তৃতীয় তুষার যুগ নামে পরিচিত, যা ওই অঞ্চলের আবহাওয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। শ্রেণী এবং ধরণের দিক থেকে পরবর্তী-সোয়ান শিল্পকে দুটি দলে ভাগ করা হয়েছে, যার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। প্রাপ্ত হাতিয়ারসমূহের অধিকাংশই প্রস্তুত হয়েছে, হয় উপল (pebble) থেকে, না হয় উপযুক্ত পাথরের মূল (core) অথবা ফালি (flake) থেকে। সোয়ান নদীতটে চৌনত্রা নামক স্থানে একটি বিশেষ ধরণের নুড়িপাথর থেকে তৈরী হাতিয়ার পাওয়া গেছে যা তৃতীয় অন্তর্হিমবাহ যুগের। উপরিউক্ত হাতিয়ারগুলির কিছু কিছু প্রস্তুত করা হয়েছে লেভালোয়া (levallois) পদ্ধতিতে। এগুলির পিছনে কিছু প্রাথমিক পরিকল্পনা আছে যা অনুযায়ী flake বার করার আগে পাথরটিকে তার অনুরূপ করে নেওয়া হত। তুষার ও অন্তর্হিমবাহ যুগের হিসাবটা ভূতত্ত্বের এলাকাভুক্ত। প্রথম তুষার যুগের ঠিক কবে শুরু তা জানা নেই, সম্ভবত তা দশ থেকে ছ লক্ষ বছর আগেকার হবে, তবে তা

শেষ হয়েছে আজ থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ বছর আগে। তুষার যুগ মোট চারটি, যদিও এটা সকলের মত নয়, সোভিয়েট বিজ্ঞানী গ্রোমোভ বলেন তুষার যুগ এসেছে মাত্র একবার। সে যাই হোক বর্তমানে চতুর্থ তুষার যুগ থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণতর হয়ে উঠেছে যা মানবসভ্যতা বিকাশের পক্ষে অনুকূল। ভূতত্ত্বের হিসাবে পৃথিবীর শেষ যুগ-পরিবর্তন ঘটেছে প্রায় দশ হাজার বছর আগে, যখন প্লাইস্টোসেনি (pleistocene) যুগের শেষ হয়েছে ও হলোসেনি (holocene) যুগের সূত্রপাত ঘটেছে। আমাদের প্রত্নাশ্ম যুগ ওই প্লাইস্টোসেনির শেষার্ধের প্রায় সমসাময়িক।

পাঞ্জাবের পর রাজস্থানে আমরা প্রত্নাশ্মের বিকাশ দেখি। জয়পুর, বুন্দি ও ইন্দরগড় থেকে কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে যেগুলি কোয়ার্টজাইট এবং লালচে বাদামী রঙের পাথরে তৈরী, বেশির ভাগই হাত-কুড়াল। রাজস্থানের পর গুজরাট, যেখানে সাবরমতী উপত্যকায় অনুসন্ধান চালিয়ে অনেকগুলি প্রত্নাশ্ম-ক্ষেত্র পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত হাতিয়ারসমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের হাত-কুড়াল, ছেদক প্রভৃতি বর্তমান, তা ছাড়া flake ও উপল নির্মিত অস্ত্র তো আছেই। সাবরমতীর অনুরূপ হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে ওরসাঙ্গ উপত্যকায়, বাহাদুরপুরে। ওরসাঙ্গ ও নর্মদার উপনদী কর্জনের তটেও হাত-কুড়াল, ছেদক প্রভৃতি প্রত্নাশ্মীয় হাতিয়ার পাওয়া গেছে! নর্মদা উপত্যকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ধরণের শিল্পধারার সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলির সঙ্গে উত্তর পশ্চিমের সোয়ান ধারাগুলির সম্পর্ক টানার চেষ্টা হয়েছে। মধ্য ভারতের সৌগড়, দামো, রেওয়া ও বুন্দেলখণ্ডে সন্ধানকার্যের ফলে যে প্রত্নাশ্মীয় নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে, ধরণের দিক থেকে সেগুলি রাজস্থান ও উত্তর গুজরাটের অনুরূপ। বাংলাদেশ থেকে প্রত্নাশ্মীয় নিদর্শন অল্পই পাওয়া গেছে, তবে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের কুলিয়ানাতে তা পাওয়া গেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

বিন্ধ্যের দক্ষিণে, নর্মদা উপত্যকার পর, গোদাবরী উপত্যকায় মুঙ্গি ও নন্দুরে মধ্য প্লাইস্টোসেনি যুগের ফসিল পাওয়া গেছে, মুঙ্গি থেকে আগেট পাথরে প্রস্তুত একটি flake-এরও সন্ধান মিলেছে যে সূত্র ধরে ওই উপত্যকায় হাল্কা ধরণের কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে। সালসেটি দ্বীপে এবং কোঙ্কন এলাকায় প্রত্নাশ্মের সন্ধান মিলেছে, কিন্তু পশ্চিমের চেয়ে পূর্বেই তার বিকাশ বেশি, বিশেষ করে মাদুরা, ত্রিচিনোপলী, উত্তর ও দক্ষিণ আর্কট, চিঙ্গলেপুত, চিত্তুর, কুড্ডাপা, অনন্তপুর, বেলারী, নেলোর কুর্নুল, গুণ্টুর ও কৃষ্ণা জেলাগুলি প্রত্নাশ্মীয় নিদর্শনে

পরিপূর্ণ। এইগুলির মধ্যে আবার উত্তর আর্কট, চিঙ্গলেপুত, কুড্ডাপা, বেলারী ও কুর্নূল জেলা অধিকতর সমৃদ্ধ। এইসব অঞ্চলে দ্বিমুখী হাতিয়ারের প্রাধান্য, পাথরগুলির আকৃতি অনেকটা পেয়ারার মত, সবটা ঘিরেই ধার। এই জাতীয় হাতিয়ারের প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব ভারত হলেও, দেশের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলেও এর নমুনা পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিন্ধ্যের দক্ষিণে নর্মদা-গোদাবরী ও তাদের উপনদীগুলির তটভূমিতে ক্ষুদ্রায়তন হাতিয়ারেরও অজস্র নিদর্শন মিলেছে, যেগুলি ক্যালসিদনি, আগেট প্রভৃতি আধা-দামী উপকরণে প্রস্তুত। অধিকন্তু ক্ষুদ্রায়তন হাতিয়ারের আরও সন্ধান পাওয়া গেছে সুদূর দক্ষিণে, অন্ধ্রপ্রদেশে, গুজরাটের কোন কোন স্থানে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার বীরভানপুরে। বলাই বাহুল্য এগুলি প্রত্নাশ্মীয় যুগের শেষ পর্যায়ের অথবা পরবর্তী পরিবর্তন-যুগের নিদর্শন, এদেশে প্রত্নাশ্ম যুগ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সর্বত্র আবির্ভূত হয়নি, আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে সব জায়গা থেকে অপসৃত হয়নি। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে ভারতে প্রত্নাশ্ম যুগের হাতিয়ারগুলি এখানকার মানবসভ্যতার সর্ব-প্রাচীন নিদর্শন, তবে সবগুলিই নয়। ওইগুলির ব্যবহারকারীরা একান্তই শিকার-জীবী ছিল, তারা দলবদ্ধ হয়ে বাস করত এবং মৃতদেহকে সমাধিস্থ করত। এই মানুষদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্ভব হওয়া সম্ভব ছিল না।

৩ ॥ নবাশ্মীয় যুগ

প্রত্নাশ্মীয় যুগ ও তার পরবর্তী নবাশ্মীয় যুগের মধ্যবর্তী একটি পরিবর্তন-যুগ ইউরোপ ও আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে দেখা গেছে, যে যুগটিকে বলা হয় Mesolithic বা মধ্যাশ্মীয় যুগ। পূর্ববর্তী যুগের মত এই যুগের অধিবাসীরাও খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি, তারাও ছিল মুখ্যত শিকারজীবী। কিন্তু হাতিয়ারের ক্ষেত্রে এই মধ্যবর্তী যুগে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যাশ্মীয় হাতিয়ারগুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র, যে কারণে সেগুলির নামকরণ করা হয়েছে ক্ষুদ্রাশ্ম (microlith), কোন কোন ক্ষেত্রে যা এক ইঞ্চির চেয়েও বড় নয়। এই জাতীয় বহু ক্ষুদ্রাশ্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সকল জেলায়, বিশেষ করে টিনেভিলিতে এবং অন্ধ্র প্রদেশের কয়েক স্থানে ও তৎসহ গুজরাটে, মধ্য ভারতে ও ছোটনাগপুরে। এগুলিও এখান ওখান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস এবং সেই হিসাবে কোন নির্দিষ্ট যুগে এগুলিকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। কোন কোন স্থানে এই ক্ষুদ্রাশ্মগুলি বেশ আধুনিক

যুগের, খৃষ্টপূর্ব চারশো অব্দের কাছাকাছি, তবে অধিকাংশই বেশ প্রাচীন। সাম্প্রতিক কালে খননকার্যের ফলে মহীশূরের ব্রহ্মগিরিতে ও গুজরাটের লংঘনাজে প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্ম পাওয়া গেছে যা নিঃসন্দেহে মধ্যাশ্মীয় যুগের। অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রাশ্মের কেন্দ্র হিসাবে আমরা পাঁচমারির মহাদেও পাহাড়, পাঞ্জাবের নওসেরার নিকটবর্তী উচালি, উত্তর গুজরাটের হীরাপুর প্রভৃতি স্থানের নাম করতে পারি।

ভারত ইতিহাসে প্রত্নাশ্মীয় যুগ ও মধ্যাশ্মীয় যুগের মত নবাশ্মীয় যুগও কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলেনি, বরং নবাশ্মীয় যুগের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি আরও বিরাট। গর্ডন চাইল্ড দেখিয়েছেন যে সারা পৃথিবীর পটভূমিকায় নবাশ্মীয় যুগের বিকাশ খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ সাল থেকে খৃষ্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত, এবং কথাটি ভিত্তিহীন হয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যায় এখনও বহু ট্রাইব নবাশ্মীয় যুগে বাস করছে। প্রত্নাশ্মীয় যুগের সঙ্গে নবাশ্মীয় যুগের মৌলিক পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে শেষোক্ত ক্ষেত্রে হাতিয়ারে বিশেষ কৌশলে ধার দেবার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। অস্ত্রটি ভিজে পাথরের গায়ে ঘষে পালিশ ও ধার আনা হত। এইভাবে অস্ত্রগুলির কার্যকারিতা অনেক বেশি বেড়ে যাবার ফলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। নবাশ্মীয় যুগেই মানুষ যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিল। কৃষিকাজ ও পশুপালন এই যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। পুরাতন যুগের খাদ্য সংগ্রাহকের দশা থেকে খাদ্য উৎপাদনের পর্যায়ে উত্তরণ, নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নবাশ্মীয় যুগেই মানুষ তার ব্যবহারোপযোগী মৃৎপাত্র গড়তে শুরু করেছিল, যদিও তার সূত্রপাত হয়েছিল প্রত্নাশ্মীয় যুগের শেষ পর্যায় থেকে। নবাশ্মীয় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্যায় থেকে ধাতুর ব্যাপক ব্যবহারেরও সূত্রপাত ঘটেছিল। বয়নশিল্পও নবাশ্মীয় যুগের অবদান। চাইল্ড বলছেন যে এই সময় থেকেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছিল, কিছু লোক খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল, বিভিন্ন পেশাদার শ্রেণীও গড়ে উঠেছিল। কাজেই অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলেও, রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পূর্ব-শর্তগুলি নবাশ্মীয় যুগ থেকেই দেখা দিতে শুরু করেছিল। নবাশ্মীয় হাতিয়ার ভারতের প্রায় সব রাজ্য থেকেই কিছু না কিছু পাওয়া গেছে।

৪॥ তাম্রাশ্মীয় যুগ : হরপ্পা সভ্যতা

আমরা আগেই বলেছি যে নবাশ্মীয় যুগের দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই ধাতুর

ব্যবহারের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু সে ব্যবহার সীমিত হবার দরুণ, পাথরের হাতিয়ার ও উপকরণের ব্যবহারের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে ধাতুর ব্যবহার শুরু হলেও ধাতব যুগের সূত্রপাত হয়নি। হাতিয়ার ও উপকরণের ক্ষেত্রে তামা বা ব্রোঞ্জের ব্যবহার আরও বেশি ব্যাপক হবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা আর একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হল। ব্রোঞ্জ ও তামার হাতিয়ার অনেক বেশি কার্যকরী, সেগুলিতে বারবার ধার দেওয়া যায়, জিনিষটা নষ্ট হয়ে গেলে তাকে আবার নূতন করে গড়া চলে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাথরের অস্ত্র বা উপকরণ বিলুপ্ত হয়নি, ধাতুর পাশাপাশি সেগুলিও কার্যকর ছিল। এই কারণেই নবাশ্মীয় যুগের পরবর্তী যুগকে তাম্রাশ্মীয় আখ্যা দেওয়া হয়। এমনকি আজকের লৌহ যুগেও, উন্নত সভ্যতার দিনেও, আমরা পাথরের হাতিয়ার বা উপকরণ ত্যাগ করতে পারিনি। আজও পর্যন্ত পেষাই-এর কাজে পাথরের হাতিয়ার—যেমন শিল-নোড়া, যাঁতা ইত্যাদি—বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, আর প্রস্তর নির্মিত উপকরণ তো বহুল পরিমাণেই।

সে যাই হোক, মোহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার জমকালো আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত তামা ও ব্রোঞ্জের কিছু কিছু হাতিয়ার ও উপকরণ মুখ্যত গঙ্গা যমুনা দোয়ার অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া প্রাক্তন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত কল্লুর এবং নাগপুর, মাদুরা ও মহীশূরের কোন কোন স্থান তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও উপকরণে সমৃদ্ধ। হাতিয়ারের মধ্যে কুঠার ও তরবারিই প্রধান, কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্শাও পাওয়া গেছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাম্রযুগের নিদর্শন সমূহ নিঃসন্দেহে হরপ্পা-পরবর্তী।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে দয়ারাম সাহনি পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারি জেলায় হরপ্পা নামক স্থানে খননকার্য শুরু করেন। পর বৎসর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খননকার্য শুরু করেন সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা তালুকের অন্তর্গত মহেঞ্জোদরোতে। উভয় স্থানের প্রাপ্ত নিদর্শন সমূহের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় প্রমাণিত হয় যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো একই সভ্যতার অন্তর্গত। এই সভ্যতার নামকরণ হয় সিন্ধু সভ্যতা, বর্তমানে হরপ্পা সভ্যতা বা হরপ্পা সংস্কৃতি নামটিই অধিকতর ব্যবহৃত। মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত সীলগুলির অনুরূপ কিছু সীল ইরাকের কয়েক স্থানে আবিষ্কৃত হয়, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ ছিল। প্রাক্-লৌহযুগের এই সভ্যতার হাতিয়ার ও উপকরণ সমূহ ছিল কাংস্যনির্মিত, অর্থাৎ তামা ও রাঙের

মিশ্রণে প্রস্তুত। পাশাপাশি পাথরের উপকরণেরও ব্যবহার ছিল যে কারণে এই সভ্যতাকে তাম্রাশ্মীয় (chalcolithic) আখ্যা দেওয়া হয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, যা ভারত-সভ্যতার ইতিহাসকে বেশ কয়েক শতাব্দী পিছনে ঠেলে দিয়েছিল, খুবই সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং এই সভ্যতার উদ্ভব ও বিস্তৃতি সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সিন্ধু ও বালুচিস্তানে ব্যাপক খনন কার্য চলে। এর ফলে বালুচিস্তানের কুল্লী, মেহী, নাল, অম্রী প্রভৃতি স্থানে তাম্রাশ্মীয় যুগের প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। ঝুকড় এবং চানহুদরোতে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শনের উপর নূতন এক সংস্কৃতির অবশেষ পাওয়া যায়। বালুচিস্তানে শাহীতুম্পে হরপ্পা পরবর্তী যুগের এক সমাধি ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাক্-হরপ্পা ও হরপ্পা পরবর্তী এই সংস্কৃতি-গুলির প্রকৃতি ছিল সীমাবদ্ধ ও গ্রামীন। প্রত্নতত্ত্বে culture বা সংস্কৃতি শব্দটি একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় খনন কার্যের ফলে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দের যে সব বাস্তব জীবনোপকরণের নিদর্শন পাওয়া যায়—যেমন ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র, অলংকার ইত্যাদি—সামগ্রিকভাবে সেইগুলি সেই বিশেষ স্থানটির সংস্কৃতি নামে পরিচিত। যদি দুই বা ততোধিক স্থানের প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি হুবহু একই ধরণের হয়, তাহলে ওই সকল স্থানগুলিকে একই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে মনে করা হয়, যেমন হরপ্পা সংস্কৃতি। এর কেন্দ্র বহু বলে, এবং সার্বিক ভাবে সেগুলি একটি বিশেষ জীবনাদর্শ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচায়ক হিসাবে প্রতিভাত হওয়ায় হরপ্পা সভ্যতা শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে বালুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশের অন্যান্য জায়গায় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত যে নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে সেগুলির ধরণ পরস্পরের চেয়ে পৃথক হবার জন্যই স্থাননামের ভিত্তিতে সেগুলির বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে, যেমন কুল্লি-সংস্কৃতি, ঝোব-সংস্কৃতি, অম্রী-সংস্কৃতি, ঝুকর-সংস্কৃতি, ঝুঙ্গর-সংস্কৃতি, শাহীতুম্প-সংস্কৃতি, ইত্যাদি।

১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের পর হরপ্পা সভ্যতার জানা কেন্দ্রগুলি পাকিস্তান ভুক্ত হওয়ায়, ভারতীয় এলাকার মধ্যে ওই সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা তা দেখার চেষ্টা হয়েছে, যার ফলে ওই সভ্যতার বহু বসতিস্থল আবিস্কৃত হয়েছে—আম্বালা জেলরে শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত রূপড়ে, হিণ্ডন নদীর তীরবর্তী মীরাট জেলার অন্তর্গত আলমগীরপুরে, উত্তর রাজস্থানের অন্তর্গত কালিবঙ্গায়, গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলার অন্তর্গত রংপুরে, ক্যাম্বে

উপসাগরের অনতিদূরে সারগওয়ালা গ্রামের নিকটবর্তী লোথালে, এবং আরও বহু স্থলে।

হরপ্পা সভ্যতার সম্যক পরিচিতির জন্য মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পা এই দুটি শহরের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। মহেঞ্জোদরো শহরটি উপর্যুপরি সাতবার নির্মিত হয়েছিল, এবং হরপ্পা আটবার, এবং প্রতিবারেই একই পদ্ধতিতে নগর বিন্যাস হয়েছিল, দুটি নগরই ছিল সুবিন্যস্ত, পথগুলি ছিল সমান্তরাল, গৃহগুলি ছিল পোড়া ইটের তৈরী। প্রত্যেক বাড়ীতেই পাকা কূপ ও স্নানাগার ছিল, এবং একটি সুপরিকল্পিত ড্রেন প্রথা জলনিকাশের জন্য বহাল ছিল। মহেঞ্জোদরো নগরীতে একটি বিশিষ্ট স্নানাগার ও সার্বজনীন গৃহাদি ছিল। পরবর্তীকালের খনন কার্যে উভয় নগর থেকেই প্রতিরক্ষা প্রাচীর ও দুর্গের চিহ্ন পাওয়া গেছে। শস্য মজুত রাখার জন্য বড় বড় গোলাঘর উভয় শহরেই পাওয়া গেছে। সোনা রূপা, দামী ও আধা দামী পাথরের অলংকার পাওয়া গেছে প্রচুর, অস্ত্রও পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরণের। প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলিও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপুর্ণ। মূর্তি নির্মাণ ক্ষেত্রেও হরপ্পীয়দের দক্ষতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ছোট ছোট মাতৃকামূর্তি ছাড়াও, ধর্মনিরপেক্ষ কয়েকটি চুনাপাথরের মূর্তি ও ব্রোঞ্জ মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। ছোট ছোট চতুষ্কোণ পাথরের বহু সীল পাওয়া গেছে, যেগুলির উপর জীবজন্তুর ছবি ও এক বা একাধিক পঙতিবিশিষ্ট লিপি বর্তমান। এই লিপিগুলির এখনও পাঠোদ্ধার হয়নি। ইরাকে প্রাপ্ত প্রায় তিরিশটি হরপ্পীয় সীল ওই দেশের সঙ্গে হরপ্পীয়দের বাণিজ্য সম্পর্ক সূচিত করে। এই সীলগুলিই আবার হরপ্পা সভ্যতার কালনির্ণয়ের প্রধান উপকরণ। ইরানীয় প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে ওই সীলগুলি আক্কাদ নৃপতি সারগণের সমসাময়িক, অর্থাৎ আনুমানিক ২৩৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি। হরপ্পা সভ্যতার আয়ুষ্কাল খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত ধরা হয়। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের কাল আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ।

পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো নগর দুইটি বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল। সেখানকার জনসমাজের প্রকৃতি ছিল মিশ্র। কয়েকটি প্রাপ্ত কংকাল পরীক্ষা করে চারজাতীয় মানুষের সন্ধান সেখানে পাওয়া। হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি। এখানকার ধর্মব্যবস্থার মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির কারণেই হরপ্পা সভ্যতায় মাতৃ-কেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। অজস্র মাতৃকামূর্তি, লিঙ্গ ও যোনির

প্রতীক সমূহ, প্রভৃতি এই মাতৃকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় দেয়। একটি কোন ভাঙা সীলে পশু পরিবৃত একটি দেবতার মূর্তি অংকিত আছে যা পরবর্তীকালের শিবেরই কোন আদিরূপ বলে অনুমিত হয়। হরপ্পার ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব পরবর্তী যুগের হিন্দুধর্মে বহুল পরিমাণে বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রাক-হরপ্পা ঝোব ও কুল্লি সংস্কৃতিতেও মাতৃকামূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এইগুলিই সম্ভবত ভারতের আদিতম cult image।

কিভাবে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংস হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আবহাওয়ার পরিবর্তন, বন্যার প্রকোপ, আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ বা বৈদেশিক আক্রমণ-এর যে কোন একটি হরপ্পা-সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। কিছুকাল আগে মনে করা হত যে বৈদেশিক আক্রমনেই হরপ্পাসভ্যতার ধ্বংস হয়েছিল, এবং আক্রমণকারীরা ছিল তথাকথিত আর্যজাতির মানুষ যারা এখানে পরবর্তীকালে বৈদিক সভ্যতার পত্তন করেছিল। এই সম্ভাবনাটির কথা প্রথম বলেছিলেন রমাপ্রসাদ চন্দ। হরপ্পার দুটি কবরখানার নাম দেওয়া হয়েছে cemetery R-37 এবং cemetery H। প্রথমটি অনেক পুরাতন এবং প্রকৃত হরপ্পা সংস্কৃতির পরিচায়ক, কিন্তু দ্বিতীয়টি অনেক পরের যুগের, সেখানে কবর দেবার পদ্ধতিও অন্য রকম এবং সেখানে একটি আগন্তুক সংস্কৃতির চিহ্ন প্রকট। এ থেকে ১৯৪৩ সালে গর্ডন চাইল্ড এই কবরখানাকে আক্রমণকারী তথাকথিত আর্যদেরই হওয়া সম্ভব বলে মনে করলেন। ১৯৪৬-এর খননকার্য এই সম্ভাবনাকে আরও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করল, দেখা গেল যে হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যায়ে নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, নগরবাসীরা যেন কোন বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। চানহুদরোর ধ্বংসস্তূপ থেকেও মোটের উপর একই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। সেখানকার সর্বনিম্ন স্তরে বিশুদ্ধ হরপ্পা সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে দুটি স্বতন্ত্র ও আগন্তুক সংস্কৃতির নিদর্শন রয়েছে। পারিপার্শ্বিক আরও নানা প্রমাণ থেকে পিগট ও হুইলার পাকাপাকিভাবে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে হরপ্পা সভ্যতা লিপিহীন এক বহিরাগত জাতির আক্রমণে বিনষ্ট হয়েছিল, এবং তারা সম্ভবত ছিল বৈদিক আর্য বলে ভারত-ইতিহাসে যারা পরিচিত। হুইলার এ বিষয়ে ঋগ্বেদ থেকেও কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদদের একাংশের মতে এই বহিরাক্রমণ-মতবাদের পিছনেও কিছু ফাঁকি আছে, কেননা হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রগুলির উপরে যে সব অপকৃষ্ট সংস্কৃতিগুলির নিদর্শন মিলেছে সেগুলি

বৈদিক আর্যদেরই নিদর্শন কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। আর্যদের কোন প্রত্যক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ভারতে নেই, এবং সত্যই যদি কোন বহিরাগত আর্য আক্রমণ এদেশে হয়ে থাকে তার সালতারিখ আমাদের অজ্ঞাত, কেননা আর্য সংক্রান্ত আমাদের ধারণাগুলি বহুলাংশেই অনুমাননির্ভর। কাজেই বহিরাক্রমণেই হরপ্পার ধ্বংস হয়েছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় না বলেই আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদদের একাংশ মনে করেন। বিকল্প কারণগুলিকে নিয়ে তাঁরা গবেষণা চালাচ্ছেন, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এখনও আসা যায়নি।

৫ ॥ হরপ্পার রাষ্ট্র ব্যবস্থা

১৯৩০ সাল পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল পাঞ্জাবে, সিন্ধুপ্রদেশ ও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে তা থেকে মার্শাল অনুমান করেছিলেন যে এই সভ্যতার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত ছিল। ১৯৪৭ এ হুইলার বলেন যে আরব সাগরের তীর থেকে সিমলা পাহাড় পর্যন্ত হাজার মাইল ব্যবধানের মধ্যে অন্তত ৩৭ জায়গায় হরপ্পা সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে। ১৯৫০-এ পিগট হরপ্পার বিস্তৃতি হিসাবে মাকরান কাথিয়াবার ও উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ৯৫০ × ৭০০ × ৫০০ মাইল মাপের একটি ত্রিভূজের কল্পনা করেন যার মধ্যে অন্যূন ৪০টি গ্রাম ও নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে একই ধরণের নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১৯৫৪-তে চাইল্ড বলেন হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃতি 'প্রাচীন-সাম্রাজ্য' যুগের মিশরের প্রায় দ্বিগুণ এবং সুমের ও আক্কাদ সভ্যতার চারগুণ। এই এলাকার সবটুকু যে একই শাসন ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল এটা না মানলে বিভিন্ন দূরবর্তী স্থান সমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। নগর পরিকল্পনার দিক থেকে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর সাদৃশ্য প্রমাণ করে যে নগর দুটি যুগ্ম-রাজধানী হিসাবে ব্যবহৃত হত। নগর দুটির দূরত্ব ৩৫০ মাইল যা থেকে সহজেই ওই নামহীন রাষ্ট্রের পরিধি অনুমান করা যায়। ওই নগর দুটি ছাড়া ওই রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল কিছু ছোট নগর এবং অসংখ্য গ্রাম। ওই গ্রামগুলির উদ্বৃত্তেই নগরগুলি জীবিত ছিল। অত্যন্ত সুবিস্তৃত কৃষিকাজের পটভূমিকা ব্যতীত এই নগর সভ্যতার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভবপর নয়। খাদ্য উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে বহুসংখ্যক মানুষ মুক্তি না পেলে নগরজীবন গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। দৃশ্যতই হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো নগরদ্বয় ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। নগরবাসী বলতে শাসক সম্প্রদায়, পুরোহিত, সওদাগর,

দোকানদার কারিগর ও শ্রমিকদের বোঝাত। হরপ্পার সমাজ ছিল শ্রেণীবিভক্ত, যা স্পষ্টতই ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয়। অভিজাত ও সমৃদ্ধিশালী লোকদের সারিবদ্ধ প্রাসাদসমূহ যেমন দেখা গেছে, তেমনই দেখা গেছে নগরীর উপকণ্ঠে শ্রমিকদের বস্তি। অর্থাৎ আধুনিক যুগের রাষ্ট্রের যে লক্ষণ সমূহ বর্তমান, হরপ্পা-সভ্যতায় তার সবগুলিই ছিল, এবং সেই অর্থে এটা ছিল 'আদিম আধুনিক রাষ্ট্র' এবং ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম রাষ্ট্রশক্তি।

কিন্তু হরপ্পার ধ্বংস হয়েছিল চূড়ান্তভাবে। যেভাবেই ধ্বংস হোক এবং যারাই ধ্বংস করুক না কেন, তাতে হরপ্পা সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বনিয়াদ একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল সন্দেহ নেই, নতুবা ওখানে পুনরায় সাম্রাজ্য গড়ে উঠত। পরবর্তী ইতিহাসে আমরা দেখি যে ওই অঞ্চলে দীর্ঘকাল আর কোন রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি, এখানে ওখানে অসংখ্য ট্রাইবাল সমাজ গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালের বৈদিক সাহিত্য থেকে ওই সব অঞ্চলে পশুপালক ট্রাইব সমূহের পরিচয় মেলে, কোন সুগঠিত রাষ্ট্রের পরিচয় একেবারেই অনুপস্থিত। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে সিন্ধু ও গন্ধার অঞ্চলদ্বয় পারসিক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল বলে জানা গেছে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে আক্রমণ চালিয়েছিলেন তখন তক্ষশিলায় এবং নিম্ন ঝিলম অঞ্চলে দু' একটি ছোট রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও, আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যাদের যুদ্ধ হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল ট্রাইব। আলেকজাণ্ডারের পর অবশ্য এই অঞ্চলগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যের এলাকায় আসে। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব।

৬॥ বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতা

খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত সারা উত্তর ভারতে আমরা একটি বিশিষ্ট, অথচ মিশ্র ও পরিবর্তনশীল বিভিন্ন সংস্কৃতির সমবায়ে গঠিত সভ্যতার পরিচয় পাই, যা বৈদিক সভ্যতা নামে কথিত। এই সভ্যতার কোন সুনির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই কিন্তু আর এক ধরণের প্রমাণ আছে। ওই সভ্যতার মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বিচিত্র সাহিত্য সম্ভার রচনা করেছিল, যা বৈদিক সাহিত্য নামে পরিচিত। বৈদিক কথাটি বেদ থেকে এসেছে।

এই মানুষদের ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে বাইরের দেশের কয়েকটি প্রাচীন

ভাষার সাদৃশ্য দেখে একদা পণ্ডিতেরা অনুমান করেছিলেন যে এই সব ভাষাগুলির সৃষ্টি হয়েছে একটি আদি ভাষা থেকে যার ব্যবহারকারীরা কোন একটি কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের নামকরণ করা হয়েছিল আর্য। ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এই আর্য নামক ধারণাটি অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। যেহেতু আদি আর্য বা তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে ইউরোপের প্রাচীন ভাষাগুলির যোগ বেশি, এবং যেহেতু ইউরোপীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতর, সেই হেতু ওই আর্য নামক ধারণাটির সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়, যার ফলে আর্যদের বংশধরত্বের দাবিদারও হয়ে ওঠে অসংখ্য দেশ, ইউরোপীয় দেশগুলি তো বটেই, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষও। আর্য ধারণাটি বৃটিশ শাসনাধীন শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভারতীয়দের হীনমন্যতা দূরীকরণের কিছুটা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, উচ্চবর্ণের ভারতীয়রা ও তাদের মনিব ইংরাজরা যে আসলে একই গাছের ফল, এই রকম একটা বিশ্বাস এদেশে সহজেই দানা বেধেছিল। সেই হিসাবে আর্য শব্দটি এখানে আজও জনপ্রিয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন জীবনের যা কিছু ভাল দিক তা সবই নাকি ওই আর্যসভ্যতার দান আর যা কিছু খারাপ ও কুসংস্কারমূলক সবই নাকি অনার্য। আজকাল বাংলায় আবার আর্যেতর বলে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যেহেতু বৈদিক সাহিত্য কোন একটি সংস্কৃতির পরিচয় দেয়না, যেহেতু সেখানে বহু জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ও পরিবর্তনশীল বহু সংস্কৃতির নিদর্শন মেলে, আর্য-অনার্য প্রসঙ্গ ভারত ইতিহাসে একেবারেই মূল্যহীন, কাজেই আর্যরা কারা ছিল, তারা কোন দেশ থেকে এসেছিল এ সকল কথা ঐতিহাসিক বোঝাপড়ার পক্ষে একেবারেই অবান্তর। আমরা শুধু এটুকু বলব যে ভারত-ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল যে সাহিত্য থেকে ওই যুগের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের জীবনযাপন সম্পর্কে বহু কথা জানা যায়, যাদের সংস্কৃতি বিভিন্ন হলেও ভাষার ক্ষেত্রে একটি বন্ধন ছিল, এই পর্যন্ত।

বৈদিক সাহিত্য প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি এবং মূলত চার শ্রেণীতে বিভক্ত —সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা প্রধানত গান, স্তোত্র, মন্ত্র প্রভৃতির সংকলন, এবং সংখ্যায় তা চারটি—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত যাগযজ্ঞ বিষয়ক সুবিশাল সাহিত্য যা সংহিতার সঙ্গে যুক্ত। আরণ্যক অরণ্যে রচিত এক জাতীয় সাহিত্য, বিশ্বরহস্যের সমাধান অন্বেষনই যার লক্ষ্য। উপনিষদেরও উদ্দেশ্য তাই। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে

সীমারেখা সবসময় সুস্পষ্ট নয়। নিম্নলিখিত ছকটি থেকেই বৈদিক সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় মিলবে।

সংহিতা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ
ঋগ্বেদ	ঐতরেয় কৌষীতকি	ঐতরেয় কৌষীতকি	ঐতরেয় কৌষীতকি
সামবেদ	পঞ্চবিংশ, বা তাণ্ড্যমহা ষড়বিংশ জৈমিনীয়	আরণ্যক সংহিতা আরণ্যক-গান জৈমিনীয় উপনিষদ্-ব্রাহ্মণ	ছান্দোগ্য কেন
যজুর্বেদ	কঠ তৈত্তিরীয় শতপথ	কঠ তৈত্তিরীয় শতপথ	কঠ তৈত্তিরীয় মৈত্রায়নীয় শ্বেতাশ্বতর বৃহদারণ্যক ঈশা
অথর্ববেদ	গোপথ		মণ্ডুক মাণ্ডুক্য প্রশ্ন

এইগুলি ছাড়া কিছু সহায়ক গ্রন্থকে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যেগুলি বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে রচিত। এগুলিকে বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাঙ্গ মোট ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) শিক্ষা, যথা ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য সূত্র, অথর্ববেদ প্রতিশাখ্য সূত্র, বাজসনেয়ী-প্রাতিশাখ্য সূত্র, পুষ্পসূত্র, পঞ্চবিধান (২) কল্প, যথা শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র, গৃহসূত্র, শুল্বসূত্র ; (৩) ব্যাকরণ (৪) যাস্ক-রচিত নিরুক্ত, রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৭০০-৫০০র মধ্যে ; (৫) ছন্দ ও (৬) জ্যোতিষ।

এই বিশাল সাহিত্য সম্ভার একযুগে রচিত হয়নি। পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে, পরবর্তী সংহিতা ও প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৮০০র মধ্যে, পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনতর আরণ্যক উপনিষদগুলির রচনাকাল ৮০০ থেকে ৬০০র মধ্যে, পরবর্তী উপনিষদ ও সূত্রগ্রন্থগুলির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৬০০র পর থেকে। এই সুদীর্ঘ ৬০০

কি তার চেয়েও বেশি বছর ধরে যে সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে তা স্বাভাবিক নিয়মেই একটি পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বৈদিক মানুষেরা তাদের আদিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজকে পিছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল, যার যথাযথ পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়।

৭ ॥ বৈদিক সমাজ, অর্থনীতি ও ধর্ম

ঋগ্বেদের যুগের অর্থনীতি প্রায় সর্বাংশেই ছিল পশুপালন নির্ভর, আর এখানেই ছিল প্রাক-বৈদিক হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার প্রধান প্রভেদ, কেননা তা ছিল সর্বাংশে কৃষি নির্ভর। পশু পালক সমাজ নাগরিক সভ্যতার সৃষ্টি করতে পারেনা, এবং সেই কারণেই আদি-বৈদিক সভ্যতার প্রকৃতি গ্রামীন। অসংখ্য নজীর তুলে দেখানো যায় যে ঋগ্বেদের কবিদের কল্পনায় পশু ভিন্ন আর কিছু ছিলনা। মোট ১০,৪৬২টি শ্লোকের মধ্যে মাত্র ২৫টিতে কৃষিকাজের উল্লেখ আছে, কিন্তু ২৫টি শ্লোকের মধ্যে ২২টির স্থান ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশে, যা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে রচিত, বাকি তিনটিতেও (২।১৪।১১ ; ৫।৫৩।১৩ ; ৬।৬।৪) কৃষিপ্রসঙ্গ এত পরোক্ষভাবে উল্লিখিত যে তা থেকে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। এগুলি যদি বৈদিক মানুষদের মধ্যে কৃষিকাজের অবধারিত পরিচায়ক হয় তাহলেও বৈদিক অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গৌণত্বই প্রমাণিত হবে, কেননা তুলনায় 'গো' ও তৎজাত শব্দ সহস্রগুণ। বস্তুত সমগ্র ঋগ্বেদই যে পশুর কামনায় ভরপুর, একথা বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। গরু সম্বন্ধে বৈদিক কবিদের উৎসাহ এমনই অসম্ভব যে তাঁরা দেবতাদেরও গো-জাত বলে কল্পনা করতে দ্বিধা করেন নি।

পশুপালন নির্ভর সমাজ পুরুষ প্রধান, অতএব পশুপালকদের চিন্তাচেতনাতেও পুরুষ প্রাধান্যের পরিচয় স্বাভাবিক। ঋগ্বেদে তাই দেবীদের তুলনায় দেবতাদেরই প্রাধান্য। পক্ষান্তরে, কৃষিপ্রধান অর্থনীতির প্রাথমিক স্তরে সমাজ ব্যবস্থা মাতৃ-প্রধান, এ পর্যায়ের চিন্তাক্ষেত্রেও তাই মাতৃপ্রাধান্য অনিবার্য, কৃষি ভিত্তিক হরপ্পা সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারই রেশ টিঁকে থেকেছে। ঋগ্বেদে আমরা দেখি যে তখনকার মানুষেরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা হিসাবে স্বীকার করেছে। বৈদিক দেবতারা তিন শ্রেণীর—দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিত্র, পূষা, বিষ্ণু, উষা, আদিত্যগণ, অশ্বিদ্বয় ইত্যাদি ;

অন্তরীক্ষ বা আকাশের দেবতা, যথা ইন্দ্র, ত্রিত আপ্ত্য, মাতরিশ্বা, রুদ্র, মরুদ্‌গণ, বায়ু, পর্জন্য, ইত্যাদি ; এবং ভূলোক বা পৃথিবীর দেবতা, যেমন অগ্নি, পৃথিবী, সোম ইত্যাদি। অধিকাংশ দেবতার প্রাকৃতিক পটভূমি খুবই খুবই স্পষ্ট, যেমন ঊষা অগ্নি, সূর্য, বায়ু, আপঃ, পৃথিবী, দ্যৌঃ ইত্যাদি ; অনেকের ক্ষেত্রে তা অর্ধস্বচ্ছ, যেমন ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু প্রভৃতি ; অনেকের ক্ষেত্রে তা একেবারে অস্বচ্ছ, যেমন অশ্বিদ্বয়, অদিতি প্রভৃতি। গোড়ার দিকে প্রত্যেক দেবতার মর্যাদা ছিল সমান, এবং তাঁদের এই সাম্যাবস্থাকে মক্ষমূলর *henotheism* নামে অভিহিত করেছেন। নিঃসন্দেহে তা ছিল আদি বৈদিক ট্রাইবাল মানুষদের সামাজিক সাম্যের প্রতিচ্ছবি। কালক্রমে সমাজে শ্রেণীভেদ এসেছে, ইন্দ্রের যজ্ঞভাগের পরিমাণও বেড়েছে।

পশুপালক ঋগ্বেদের মানুষদের একটি শিকারজীবী অতীত ছিল, যে যুগের আচার অনুষ্ঠানগুলি পশুপালক পর্যায়ের নূতন ধর্মব্যবস্থার মধ্যে এসেও তারা ছাড়তে পারেনি। শিকারজীবী মানুষদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ভক্ষ্য পশুগুলির ভূমিকা থাকে। নিহত পশুটির উপর একধরণের পবিত্রতা আরোপ করা হয়, তারপর সকলের নানাপ্রকার ধ্বনি ও নৃত্যের মাধ্যমে তাকে ভক্ষণ করা হয়। এই *collective eating ritual* থেকেই বলিদান প্রথার সূত্রপাত। ঋগ্বেদের দেবকল্পনায় প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ বিরাজ করলেও তাদের সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে তাদের শিকারজীবী পর্যায়ের ঐতিহ্য অর্থাৎ বলিদান প্রথা তারা পরিত্যাগ করেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাচীন জাদু অনুষ্ঠানগুলি (*magic*) যার ফলে যজ্ঞপ্রথা গড়ে উঠেছিল। বৈদিক যজ্ঞ আদিতে জাদু অনুষ্ঠানই ছিল, যা সম্পাদিত হত সমবেতভাবে। জাদু অনুষ্ঠানের মূল কথা হচ্ছে নানাধরণের কাল্পনিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে প্রকৃতিকে সরাসরি বশ করার প্রচেষ্টা—বাস্তব কলাকৌশলের অসম্পূর্ণতার পরিপূরক কাল্পনিক কলাকৌশল। একমাত্র আদিম যৌথ জীবনের পটভূমিতেই জাদুর আসল তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। আদিম জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের মূলসূত্রগুলির সাদৃশ্য এত বেশি, যে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রথমটির প্রভাব কোন দায়িত্বশীল বেদবিদই অস্বীকার করেননি। অবশ্য যজ্ঞের আদি রূপ ও উত্তর-রূপ এক নয়।

ঋগ্বেদের গোড়ার দিকে সামাজিক শ্রেণীভেদের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। চতুর্বর্ণ প্রথা ঋগ্বেদের আদি অংশে অনুপস্থিত। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত (১০।৯০), যেখানে জাতিপ্রথার কথা রয়েছে, ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশের মধ্যেই

পড়ে, যা নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালে রচিত। ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশে মেয়েদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবত তখনও সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভূমিকা খুব দৃঢ় হয়নি। ওই ভূমিকা দৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গেই, সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্বের প্রয়োজনে, মেয়েদের সতীত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনটা পুরুষদের পক্ষে অবধারিত হয়ে পড়ে, আর তখন থেকেই মেয়েদের জীবনে বন্ধন আসে, জগতের সর্বত্রই এই নিয়ম, এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

ঋগ্বেদ রচিত হতে সময় লেগেছিল দীর্ঘকাল। প্রাক-বিভক্ত পর্যায় থেকে সমাজ ততদিনে শ্রেণী বিভক্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ঋগ্বেদ শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই রচনা, তবুও তার এখানে ওখানে বহু জায়গায় প্রাক-বিভক্ত সাম্য-সমাজের বহু স্মারক রয়েছে যা খুঁজে নিতে মোটেই অসুবিধা হয়না। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যুগে সামাজিক শ্রেণীভেদ আরও অনেক ব্যাপক হয়েছে। এই যুগেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক ধারার মিশ্রণ ঘটেছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নগরজীবনেরও সূত্রপাত হয়েছে। আগের যুগের পশু-পালকরা কৃষির ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার ফলে, কৃষিকার্যে গবাদি পশুর ব্যবহার হবার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে, ও তার ফলভোগী একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদয় হয়েছে। এই নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহকে একেবারে পরিবর্তিত করেছিল। পুরোদস্তুর পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার দরুন মেয়েরা চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে তাদের শূদ্র, কাক ও কুকুরের সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য অথর্ববেদ ৬।১১।৩; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৫, তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।৫।৮।২)। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশার উদ্ভব হয়েছে, এবং নিম্নবৃত্তি সমূহের অধিকারীরা শূদ্র নামে পরিচিত হয়েছে, তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নিপীড়নের বোঝা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাদের যথা-কাম-বধ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ তারা যে কোন সময়ই প্রহৃত হবার উপযোগী। আমরা পরে দেখব পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগেই রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার উদ্ভব হয়েছে। ধর্মব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। পুরাতন আমলের দেবদেবীরা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধিরা, দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন, তাঁদের জায়গায় নূতন দেবতা সৃষ্টি হয়েছে, যেমন প্রজাপতি। ইনি স্রষ্টা এবং সকলের প্রভু, মর্তের রাজার আদর্শেই যেন কল্পিত, এবং রাজারাও উপাধি নিতেন প্রজা-পতি।

একেশ্বরবাদেরও উদ্ভব এই যুগ থেকে, এবং তারই চরম পরিণতি উপনিষদের ব্রহ্ম-কল্পনা, সেই এক ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। যজ্ঞ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের লক্ষণসমূহ প্রকটিত হয়েছিল। উৎপাদন কৌশলের অগ্রগতির ফলে আদিম যৌথ জীবনের অবসান হলেও জাদু-বিশ্বাসের রেশ সম্পূর্ণ মুছে যায় না। কিন্তু তার আদি তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আদিম জাদুবিদ্যা ক্রমশই সুবিধাভোগী শ্রেণীর গুহ্যবিদ্যায় রূপান্তরিত হয়, তা পুরোহিতদের অলৌকিক শক্তি বলে প্রচারিত হয়। বৈদিক যজ্ঞের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল। এখন যজ্ঞের হোতা আর যজমান নয়। একটি বিশেষ পুরোহিত শ্রেণী—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা—যারা অর্থের বিনিময়েই যজমানের হয়ে যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করত। পুরোনো আমলের সাদামাটা যজ্ঞ উঠে গিয়েছিল, তার জায়গায় এসেছিল বিরাট বিরাট ব্যয়বহুল যজ্ঞ—অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, পুরুষমেধ ইত্যাদি—যেগুলি রাজা বা প্রচণ্ড ধনী ছাড়া বাকি সকলের সাধ্যের অতীত ছিল।

উপনিষদ ও সূত্রগ্রন্থগুলির যুগে, উচ্চবর্ণগুলির বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটলেও, সামাজিক শ্রেণীভেদ আরও বেড়ে গিয়েছিল, এবং বলাই বাহুল্য নিম্নবৃত্তি সমূহের অধিকারীরা, অর্থাৎ শূদ্রেরাই, এই ব্যবস্থায় ছিল সবচেয়ে উৎপীড়িত। পাণিনি (খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক) শূদ্রদের দুভাগে বিভক্ত করেছেন, নিরবসিত ও অনিরবসিত, যা থেকে প্রমাণ হয় যে শূদ্রদের মধ্যে অনেককে নগর বা গ্রামের সীমানার বাইরে অচ্ছুতের জীবন যাপন করতে হত। উপনয়নাদির সংস্কার শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মসূত্রগুলি থেকে জানা যায় যে একই অপরাধে যেখানে উচ্চবর্ণের লোকের সাজা কম হত, শূদ্রদের উপর কথায় কথায় মৃত্যুদণ্ড প্রযুক্ত হত। বৈশ্যদের অবস্থাও খুব ভাল ছিল না। যদিও কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে এই শ্রেণী বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল, সেই সমৃদ্ধি ভোগ করার স্বাধীনতা তাদের ছিল না। নিরাপত্তার নামে তাদের উপর প্রচুর করভার চাপানো হত, যে কোন অজুহাতে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত, এবং সামাজিক কাঠামোতেও তাদের স্থান খুব সম্মানের ছিলনা। গবাদি পশুই যেহেতু সেকালে ছিল প্রধানতম সম্পদ, বিনিময়ের মাধ্যম, যাগযজ্ঞের নামে ওই সম্পদের অকারণ বিনাশ তারা চাইত না, এবং তাদের এই দাবিই পরবর্তীকালে বুদ্ধ ও মহাবীরের কণ্ঠে ভাষা পেয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপের এটাই ছিল অর্থনৈতিক কারণ, যে কারণে বহু শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের

শরণ নিয়েছিলেন, যে কারণে আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় প্রধানত জৈন ধর্মের অনুগত। উপনিষদের যুগের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দেরও মধ্যেও একটা বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। উপনিষদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার উদ্গাতারা ছিল, ক্ষত্রিয় শ্রেণী, ব্রাহ্মণেরা নয়। ব্রহ্মবিদ্যার মূলকথাগুলি বহুক্ষেত্রেই বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপের প্রতিকূল মনোভাব ব্যক্ত করেছিল। ব্রহ্মবিদ্যা সর্বসাধারণের কাছে খুব বেশি আবেদন রাখতে না পারলেও বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ের চিন্তাধারার উপর পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ বিরোধী চারটি প্রধান ধর্মব্যবস্থার উদ্ভবের কিছু পরোক্ষ প্রেরণা ঔপনিষদীয় চিন্তাধারা জুগিয়েছিল। এই চারটি ধর্মের মধ্যে দুটি হচ্ছে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম, যে ধর্ম দুটির মূল দেবতা, যথাক্রমে বিষ্ণু ও শিব, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রূপে কল্পিত, মর্তলোকের রাজার যেন দৈব প্রতিচ্ছবি। এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ভক্তির দ্বারা, কোন যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নয়, যে ভক্তি মর্তে রাজাও আশা করেন। গীতায় সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে নরগণের মধ্যে রাজাই হচ্ছেন ঈশ্বর। বাকি দুটি ধর্ম জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। এ দুটিও যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরোধী। কিন্তু বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও লালিত পালিত হয়েছিলেন ট্রাইবাল পরিবেশে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, তাই রাজার কল্পনা তাঁদের চিন্তাজগতে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে নি, কাজেই কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা তাঁরা চিন্তা করেন নি, যে কারণে তাঁদের প্রবর্তিত ধর্ম নিরীশ্বরবাদীই রয়ে গেছে।

৮ ॥ বৈদিক যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা : উদ্ভব ও বিবর্তন

বৈদিক যুগের সমাজ সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা যা পেলাম তা থেকে অনুমান করা যায় যে ঋগ্বেদের আদি পর্যায়ে আধুনিক অর্থে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির যুগ থেকে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে, তার সূত্রপাত হয়েছে, এবং উপনিষদ ও সূত্রগ্রন্থগুলির যুগে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে তা দানা বাঁধতে শুরু করেছে, যার প্রতিক্রিয়া সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে দেখা গেছে। এবার দেখা যাক এবিষয়ে খোদ বৈদিক সাহিত্য কি বলে।

ঋগ্বেদে রাজন্ বা রাজা শব্দটির ব্যবহার দেখেই পণ্ডিতেরা সাব্যস্ত করে নিয়েছিলেন যে ঋগ্বেদের যুগে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। ‘বৈদিক ট্রাইবরা রাজার

দ্বারা শাসিত হত' এই রকম কথা অনেক বড় বড় পণ্ডিত না বুঝেই লিখে ফেলেছেন, সম্ভবত এই 'রাজা শব্দটির উল্লেখ দেখেই, কেননা সহজ বুদ্ধিতেই তাঁদের এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে 'রাজা' বলতে আমরা যা বুঝি ট্রাইবের প্রধান বোঝাতে তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কেননা ট্রাইব রাষ্ট্র নয়, তাই ট্রাইবের প্রধানও, আমরা যে অর্থে রাজা শব্দটিকে বুঝি তা নয়। ঋগ্বেদেই বলা হয়েছে রাজা হচ্ছে গণের সেনানী এবং ব্রাতের প্রথম (১০।৩৪)। গণ ও ব্রাত দুটি শব্দই টাইবকে নির্দেশ করে। তাহলে রাজা বলতে ঋগ্বেদে বুঝিয়েছে ট্রাইবের যুদ্ধনেতা ও প্রথম ব্যক্তি, সোজা কথায় *tribal chief*। দ্বিতীয়ত বৈদিক সাহিত্যের বহু জায়গায় সভা ও সমিতিতে বহুবচনে রাজাদের আগমন ও উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে, যা নিশ্চয়ই রাজতন্ত্রের দ্যোতক নয়। রাজতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে রাজার একত্ব এবং অনন্যত্ব। দলে দলে রাজারা সভায় বা সমিতিতে হাজির হয়েছে, এ সম্ভব নয়, কিন্তু *tribal chief*রা একত্র হয়েছে এটা খুবই সম্ভব।

ঋগ্বেদের যুগের প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা হচ্ছে দাশরাজ্ঞ, যার মধ্যে রাজা শব্দটির ব্যবহার দেখে পণ্ডিতেরা ঘটনাটিকে *battle of ten kings* বা দশজন রাজার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। আসলে এটি কিন্তু ট্রাইবদেরই ব্যাপার, এর সঙ্গে রাজা বা রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই। ঘটনাটি ছিল তৃৎসু-ভরতদের সঙ্গে পুরু, যদু, তুর্বশ, অনু ও দ্রুহ্য এই পাঁচটি সম্মিলিত ট্রাইবের যুদ্ধ। শেষোক্তদের দলে আরও পাঁচটি ছোট ট্রাইব সামিল হয়েছিল, যাদের নাম অলিন, পক্‌থ, ভলানঃ, শিব ও বিষানী। এই যুদ্ধে তৃৎসু-ভরতরাই জয়ী হয় যাদের নেতা ছিলেন সুদাস। তাঁর নেতৃত্বে তৃৎসু ভরতরা অজ, শিগ্রু ও যক্ষু নামক ট্রাইবদেরও পরাস্ত করেছিল। তৃৎসু-ভরতদেরই দুজন পূর্বতন নেতার নাম আমরা পাই, দিবেদাস এবং পিজবন। দিবোদাস পুরু, যদু ও তুর্বসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, এ ছাড়া তিনি অবৈদিক দাস-দলপতি শম্বর ও পণিদের পরাস্ত করেছিলেন। পশুপালক ট্রাইবদের মধ্যে সম্পদ লাভের জন্য পারস্পরিক যুদ্ধটা খুবই সাধারণ ছিল। অপরের গোসম্পদ হরণ করার ব্যাপারটার নাম ছিল গো-গ্রহণ। এই কারণেই পশুপালক ট্রাইবগুলির নেতৃত্ব মূলত সামরিকই হত।

ভরতরা বাস করত সরস্বতী ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, তৃৎসু এবং সৃঞ্জয়রা সম্ভবত যাদের ছিল শাখা। তৃৎসুদের এলাকা ছিল পরুষ্ণী (বর্তমান রাভী, ইরাবতী) নদীর পূর্বে, এবং সৃঞ্জয়রাও নিকটবর্তী এলাকায় বাস করত। পুরুরা

বাস করত সরস্বতী নদীর দুই তীরে। সিন্ধু ও অসিক্লীর (চেনাব, চন্দ্রভাগা) মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করত ক্রিবিরা যারা পরে আরও পূর্বদিকে সরে এসেছিল। দ্রুহ্য, তুর্বশ ও অনুরা বাস করত ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। একেবারে উত্তর পশ্চিমে বাস করত গন্ধারি, পক্থ, অলিন, ভলান ও বিষানীরা। সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বাস করত শিব, পর্শু, কেকয়, বৃচীবন্ত, যদু, অনু, তুর্বশ এবং দ্রুহ্যরা। আরও পূর্বে বাস করত তৃৎসু, ভরত, পুরু এবং সৃঞ্জয়রা। মৎস্য ও চেদিরা বাস করত পাঞ্জাবের দক্ষিণে।

যেহেতু ঋগ্বেদ এই প্রতিটি গোষ্ঠীকে বহুবচনে চিহ্নিত করছে তাদের ট্রাইব বলে সনাক্ত করতে কোন অসুবিধা নেই। দেখা যাচ্ছে ঋগ্বেদ যে ট্রাইবগুলির উল্লেখ করছে তারা মূলত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজস্থানের কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। পূর্বে আধুনিক হরিয়ানার সীমা সদ্য ছাড়িয়ে যমুনা পর্যন্ত এসেছে। এরা ছাড়াও ঋগ্বেদে আরও কয়েকটি মানবজাতির উল্লেখ আছে, যারা চেহারা এবং ভাষার দিক থেকে বৈদিক মানুষদের চেয়ে পৃথক। এদের পণি, দাস ও দস্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে। পণিদের কোন ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই। তবে তাদের বিষয়ে যে তথ্য দেওয়া আছে তা থেকে এটুকু প্রতীয়মান হয় যে তারা বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, এবং সম্ভবত তাদের রাষ্ট্রও ছিল। দাসদের বলা হয়েছে কৃষ্ণত্বক, অনাস এবং মৃধ্রবাক, অর্থাৎ কালো-চামড়া চেপটা নাক এবং দুর্বোধ্য ভাষা। তাদের নগর ও দুর্গের কথাও বলা হয়েছে যা থেকে বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দস্যুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা ক্রিয়াহীন (অকর্মণ), দেবগণের প্রতি বিমুখ (অদেবয়ু), ভক্তিহীন (অব্রহ্মন), যাগযজ্ঞবিহীন (অযজ্জন), রীতিবিহীন (অব্রত) অন্য রীতি অনুসারী (অন্যব্রত) ইত্যাদি।

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগে এবং আরও পরের উপনিষদ ও সূত্রগ্রন্থগুলির যুগে আমরা একটি পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিচয় পাই। পুরাতন বহু ট্রাইবের আর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সময় মধ্যদেশে, অর্থাৎ বর্তমান হরিয়ানা থেকে শুরু করে প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, কুরু-পঞ্চালদের একটি একটি বৃহত্তর ট্রাইবাল-কনফেডারেসী গড়ে উঠেছিল, যদিও পরবর্তীকালে তা দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সংযুক্তির একদিকে ছিল পুরাতন আমলের তৃৎসু, ভরত ও পুরুরা অপরদিকে ছিল সৃঞ্জয় ও ক্রিবিরা। কুরু ও পঞ্চাল ছাড়াও মধ্যদেশে বশ, উশীনর, মৎস্য এবং শাল্বরা বাস করত। পশ্চিমের বাসিন্দাদের

মধ্যে ছিল নীচ্য, অপাচ্য, বাহীক এবং অম্বষ্ঠরা। উত্তরাঞ্চল বা উদীচ্যের বাসিন্দা ছিল উত্তরকুরু, উত্তর মদ্র, মুজবন্ত, মহাবৃষ, গন্ধারি, বাহলীক, কেশী, কেকয় এবং কম্বোজরা। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির যুগে আমরা পূর্বাঞ্চলেরও সংবাদ পাচ্ছি যেখানে কাশি, কোশল ও বিদেহরা বাস করত। অথর্ববেদে আমরা অঙ্গ ও মগধদের উল্লেখ পাচ্ছি (৫।২২)। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) আমরা বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চেরদের উল্লেখ পাচ্ছি, যাদের ভাষা পাখির বুলির মত অবোধ্য। দক্ষিণের ট্রাইবদের মধ্যে আমরা সত্বন্ত, বিদর্ভ, নিষধ ও কুন্তিদের উল্লেখ পাচ্ছি। এ ছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১৮) থেকে আমরা শিকারজীবী আরণ্যক কিছু ট্রাইবের উল্লেখ পাই, যেমন অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মূতিব প্রভৃতি।

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে সেযুগেও মূলত ট্রাইবাল ব্যবস্থাই ভারতের বৈশিষ্ট্য ছিল, যদিও এই সময় থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে বলা যেতে পারে। কিভাবে ট্রাইবাল ব্যবস্থা ভেঙে রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে শুরু করেছিল সেটা বৈদিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায়। ঋগ্বেদের বিভিন্ন অংশে আদিম সাম্য সমাজের স্মারক পাওয়া যায় যেখানে সুপ্রাচীন সমবণ্টনের নিয়মের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই সমবণ্টনের নিয়মটির সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় শিকারজীবী পর্যায়ের মানুষদের মধ্যে। এই পর্যায়ে মানুষের ধনসম্পদ বলতে যেহেতু প্রধানত খাদ্যদ্রব্য বোঝায় সেহেতু সমবণ্টনও মূলত ওই খাদ্য দ্রব্যের বণ্টন, অন্নবিভাগ। ঋগ্বেদের মানুষেরা অবশ্যই শিকারজীবী পর্যায়ে ছিল না। ধনসম্পদ বলতে তাদের কাছে প্রধানতই পশু এবং পরে যুদ্ধে জিত ধন। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, এই পর্যায়েও বৈদিক কবিদের স্মৃতি থেকে ওই সুপ্রাচীন নিয়মের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নি। ঋগ্বেদে ধনবাচক একটি শব্দ হল বার্য। সারণ দেখাচ্ছেন বৃঙ ধাতু থেকে এই শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ ভাগ করা। ধনবাচক এই শব্দটির পিছনেই সুপ্রাচীন সমবণ্টনের নিয়মটির ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু শব্দতত্ত্বগত ইঙ্গিতই নয়। ঋগ্বেদে বহুস্থলে খোলাখুলিভাবেই সম্পদের সমবণ্টনের কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের শেষ তিনটি সূক্তে, যেখানে প্রাচীন সাম্যজীবনের গভীর আকূতি প্রকাশ করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'দেবা ভাগঃ যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে', অর্থাৎ 'যেমন অতীতের দেবগণ সচেতনভাবে একত্র বসে তাঁদের ভাগ গ্রহণ করতেন,' যা থেকে সহজেই বোঝা যায় অতীতের এই ব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছে, ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে জিত ধনে ইন্দ্রের ভাগ অপরের চেয়ে বেশি।

ঋগ্বেদে সভা, বিদথ ও সমিতির বহু উল্লেখ দেখা যায়, যেগুলির তর্জমায় পণ্ডিতেরা *assembly*, *council* ইত্যাদি প্রতিশব্দই ব্যবহার করে থাকেন। অসংখ্য ঋকে সভায় বা বিদথে ধনবণ্টনের উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল সভায় সকলেই উপস্থিত হত, এমন কি নারীরাও। ঋগ্বেদের এক জায়গায় (১।১৬৭।৩) আছে 'ন যোষা সভাবতী বিদথ্যেব সং বাক্'—অর্থাৎ 'সভাস্থিতা নারী সভার উপযোগী বাক্য প্রয়োগ করে'। অপর জায়গায় (৩।৫৬।৫) বলা হয়েছে 'ঋতযুক্ত তিনটি নারী দিবসে তিনবার সভায় আগমন করে।' ঋগ্বেদে 'রাজা' বলতে আধুনিক অর্থে 'রাজা' যে বোঝাত না সে কথা আমরা আগেই বলেছি। রাজাকে সভা ও সমিতিতে অবশ্যই যে হাজির থাকতে হত সেকথা বারবার ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছে। সমিতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে : রাজানঃ সমিতৌ ইব —রাজাগণ যেমন সমিতিতে একত্রিত হন। রাজাদের এই বহুত্বই, আমরা আগে দেখেছি, প্রমাণ করে যে বৈদিক রাজা আসলে দলনেতা, রাজতন্ত্রের রাজা নয়। ট্রাইবাল সংগঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ট্রাইবের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্লান থেকে নির্বাচিত যুদ্ধ-সর্দারদের একটি উচ্চতর পরিষদ থাকে যার প্রধানতম কাজ যুদ্ধবিষয়ক। বৈদিক সমিতিও ওই জাতীয় কিছু ছিল। নিঘণ্টু-মতে (২।১৭) সমিতি একটি যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। সায়ণও সেই অর্থ করেছেন। কাজেই রাজাদের, অর্থাৎ যুদ্ধ নেতাদের, সমিতিতে একত্র হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।

পশুপালন মূলক অর্থনীতির বিকাশের ফলে ট্রাইবগুলি যতই যুদ্ধপরায়ণ হয়ে ওঠে, ততই ধ্বংস পায় প্রাচীন ট্রাইবাল গণতন্ত্র, এবং তারই ধ্বংসস্তূপের উপর আবির্ভাব হয় রাজশক্তির, তথা রাষ্ট্রশক্তির। বৈদিক ট্রাইবগুলি যে ক্রমশই একান্ত যুদ্ধ পরায়ণ হয়ে উঠেছিল একথা সুবিদিত। তারই ফলে ঋগ্বেদে অন্য সব দেবতার গৌরব ম্লান করে যুদ্ধদেবতা ইন্দ্রের ঐকান্তিক গৌরব কীর্তিত হয়েছে। এই দিক থেকে ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়ে প্রাচীন গণতন্ত্রের অবসানের লক্ষণসমূহ দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সভা, সমিতি, বিদথ প্রমুখ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবলুপ্তি সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।১।১৪) বলা হয়েছে যে সামরিক প্রয়োজনেই রাষ্ট্র তথা রাজার প্রয়োজন। ওই গ্রন্থে (৮।৪।১২) রাজার নির্বাচনের কথাও বলা হয়েছে। অপরদিকে শতপথ ব্রাহ্মণে (৫।৩।৩।১২) খোলাখুলি বলা হয়েছে, রাজাই হচ্ছেন প্রজাপতির দৃশ্যমান প্রতিনিধি। ধর্মসূত্র সমূহে রাজাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা

হয়েছে। সার্বভৌম রাজার ধারণা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ওই খ্যাতি লাভ করা যেত।

সুদীর্ঘ বৈদিক যুগে ঠিক কবে, কোথায়, কখন প্রথম রাষ্ট্রশক্তি গড়ে উঠেছিল তা জানার কোন উপায় নেই। উপনিষদ ও সূত্রগ্রন্থগুলির যুগে, অর্থাৎ ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে রাষ্ট্রশক্তির প্রচলন হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। তার আগের যুগে অর্থাৎ পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ-গুলির যুগে যদিও আমরা পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, বীতহব্য, প্রভৃতি রাজার উল্লেখ পাই, রাজতন্ত্র কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দর্শন ও অশ্বমেধাদি ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ যদিও রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজতন্ত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তা সত্ত্বেও ওই যুগের রাজনৈতিক পটভূমিকায় রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে ট্রাইবাল-ব্যবস্থাই বেশি কার্যকর ছিল, এমন অনুমান করা অবাস্তব নয়। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্রাইবাল ব্যবস্থার কথা ব্যক্ত করে, যা আগে আমরা দেখেছি। আমরা পরে দেখব উত্তর ভারতে রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ ঘটেছে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে। তখন থেকেই প্রকৃত অর্থে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সূচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মগধ সাম্রাজ্য

১॥ উত্তর পশ্চিম ভারত : খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতক

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক) লিখেছিলেন যে ভারত ছিল পারস্য সম্রাট দরায়ুসের বিংশতিতম প্রদেশ, অবশ্য ভারত বলতে তিনি বুঝেছিলেন সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীর। পারস্য সম্রাট কাইরাসের (৫৫৮-৫৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) সাম্রাজ্য পূর্বদিকে, হেরোডোটাসের মতে (১।১৫৩, ১৭৭), ড্রাঙ্গিয়ানা সাত্তাগিডিয়া এবং গান্দারিটিজ (গন্ধার) অঞ্চলগুলি নিয়ে বর্তমান ছিল। জেনোফোন লিখেছেন যে কাইরাস ব্যাকট্রিয়া ও ভারত জয় করেছিলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান নিয়ে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেই সব গ্রীক লেখকেরা অবশ্য কাইরাসের ভারত অভিযান সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। তবে প্লিনি একজায়গায় লিখেছেন যে কাইরাস ঘোরবন্দ উপত্যকায় কপিশ অঞ্চলটি জয় করেছিলেন। সব মিলিয়ে মনে হয় যে কাইরাস কাবুল উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং তার পরে দরায়ুস সিন্ধু পর্যন্ত। কাইরাসের উত্তরাধিকারী কামবাইসেস (৫৩০-৫২২ খৃঃ পূঃ) নিজ রাজ্যের বিশৃংখলা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, ভারতের দিকে তাকাবার অবকাশ পাননি।

সম্রাট প্রথম দরায়ুসের (৫২২-৭৮৬ খৃঃপূঃ) লেখমালা সমূহ ভারতবর্ষে তাঁর ক্রিয়াকলাপের পরিচয় দেয়। তাঁর বেহিস্তান লিপি থেকে জানা যায় যে গন্ধার তাঁর রাজ্যসীমার মধ্যে ছিল। তাঁর সুসাপ্রাসাদ লিপিতে গন্ধার থেকে আনীত কাঠের উল্লেখ আছে। তাঁর পার্সেপোলিশ এবং নাকশ-ই-রুস্তম লিপিতে সিন্ধু অঞ্চলেও তাঁর অধিকারের কথা ব্যক্ত হয়েছে। হামাদান স্বর্ণ ও রৌপ্য-শাসনে বলা হয়েছে যে সিন্ধু তাঁর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। হেরোডটাস (৩।৯৪) লিখেছেন যে দরায়ুসের ভারতীয় এলাকা তাঁকে প্রতি বছর ৩৩০ তালন্ত সোনা পাঠাত রাজকর হিসাবে। এছাড়া তিনি (৪।৪৪) লিখেছেন যে দরায়ুস সিন্ধু নদীর গতিপথ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে স্কাইলাক্সের অধীনে একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন ৫১৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে।

পরবর্তী পারসিক সম্রাট জেরেকসেস (৪৬৮—৪৬৫ খৃঃ পূঃ) দরায়ুসের ভারতীয় এলাকাগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয়রাও ছিল, এবং তারা থার্মোপাইলির যুদ্ধে পারসিকদের পক্ষে গ্রীকদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ ছাড়া তারা বিয়োসিয়া অভিযানে পারসিক সেনাপতি মার্ডোনিয়াসের অধীনে অংশ নিয়েছিল। ৩৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ আলেকজাণ্ডার কর্তৃক পারস্যরাজ তৃতীয় দরায়ুসের পরাজয় হওয়া পর্যন্ত, গন্ধার ও সিন্ধু অঞ্চলে পারসিক অধিকার বজায় ছিল।

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে গন্ধার ও সিন্ধু ও তাদের চারপাশের এলাকা গুলিতে রাষ্ট্রের পরিবর্তে ট্রাইবাল ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল। অন্তত আলেক-জাণ্ডারের ভারত অভিযান সেই পরিস্থিতিরই সাক্ষ্য দেয়। অভিযানকালে আলেকজাণ্ডার যাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি ছিল রাষ্ট্রশক্তি, বাকি সবগুলিই ট্রাইব। ওই রাজাদের মধ্যে শশীগুপ্ত ও অম্ভি আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য করেছিলেন, পুরু তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যদিও পরে তাঁর সহায়ক হয়েছিলেন। শশীগুপ্তের রাজত্বের সঠিক অবস্থান অজ্ঞাত, অম্ভি ছিলেন তক্ষশিলার রাজপুত্র, পুরু ঝিলম ও চেনাব নদীর মধ্যাঞ্চলে রাজত্ব করতেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন উত্তর পশ্চিমের ট্রাইবগুলির কাছ থেকে, যাদের কথায় আমরা এখনই আসছি।

৩২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দের মে মাস নাগাদ আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দুভাগে বিভক্ত করেন। একটি ভাগ থাকে তাঁর নিজের অধীনে যাকে তিনি পরিচালিত করেন চিত্রল নদীর দিক থেকে পূর্ব বরাবর, অপরটি থাকে হেফায়েষ্টিয়ন ও পারদিকাসের অধীনে যারা যাত্রা করে কাবুল নদীর দক্ষিণ তীর ধরে খাইবার পাশের মধ্য দিয়ে সিন্ধু অভিমুখে। এই দ্বিতীয় বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন তক্ষশিলারাজ অম্ভি। আলেকজাণ্ডারের বাহিনী প্রথমেই বাধা পায় অষ্টক (*Astakenoi*) নামক ট্রাইবের কাছ থেকে, কিন্তু গ্রীক বাহিনী তাদের পরাজিত করে। অপর বাহিনীটি, যার নেতা ছিলেন আলেক-জাণ্ডার নিজেই, প্রথম বাধা পায় অশ্বক ট্রাইবের (*Aspasioi*) কাছ থেকে, যারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তারা পরাজিত হয়, তাদের ৪৫,০০০ লোককে বন্দী করা হয়, এবং ২৩০,০০০ গবাদি পশু লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু এদের চেয়েও বড় বাধা আলেকজাণ্ডার পেয়েছিলেন ওই অশ্বক ট্রাইবেরই (*Assakenoi*) আর একটি শাখার কাছ থেকে, যারা বিপুল সংখ্যক

বাহিনী নিয়ে তাঁর গতিরোধ করেছিল। ৩২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দের বসন্তকালে আলেকজাণ্ডার সিন্ধু অতিক্রম করেন। অতঃপর তিনি বাধা প্রাপ্ত হন রাজা পুরু কর্তৃক, যিনি ঝিলম ও চেনাবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। পুরু ৩০,০০০ পদাতিক, ৪,০০০ অশ্বারোহী, ৩০০ রথ এবং ২০০ হাতি নিয়ে তাঁর গতিরোধ করেন। আলেকজাণ্ডার কৌশলে তাঁর সেনাবাহিনীকে দুভাগ করে, এক ভাগকে সকলের অগোচরে ঝিলম অতিক্রম করিয়ে, দুদিক থেকে পুরুকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেন। পরে অবশ্য পুরু আলেকজাণ্ডারের মিত্র হন, এবং আলেকজাণ্ডার অধিকৃত ভূখণ্ডের কিছু ভাগও পান। অতঃপর আলেকজাণ্ডারে গ্লচুকায়নক ট্রাইবদের (*Glauganikoi*) পরাজিত করেন। ইরাবতী অঞ্চলে তিনি অধ্বষ্ট (*Adraistoi*), কঠ (*Kathaioi*) প্রভৃতি ট্রাইবের কাছে বাধা প্রাপ্ত হন।

আরও পূর্বদিকে গমন করার অভিপ্রায় আলেকজাণ্ডারের ছিল, কিন্তু তাঁর সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে রাজি হয়নি। মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের শক্তি সামর্থের পরিচয়ও গ্রীকদের অজানা ছিলনা, তাই তারা আর ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তন পথও খুব সুগম ছিল না। ঝিলম ও চেনাবের সংযোগস্থলে তাঁর বাহিনী মালব (*Malloi*) এবং ক্ষুদ্রক (*Oxydrakoi*) ট্রাইবদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যারা বিপুল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং একটি যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। পরবর্তী বাধা এসেছিল অর্জুনায়নদের (*Agalassoi*) কাছ থেকে। এ ছাড়া গ্রীক লেখকেরা শিবি (*Siboi*) অম্বষ্ট (*Abastenoi*), ক্ষত্রি (*Xathroi*), বসাতি (*Ossadii*) প্রভৃতি ট্রাইবদের উল্লেখ করেছেন যাদের প্রতিরোধ খুব দৃঢ় ছিল না।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানকালীন একটি বৈশিষ্ট্যই আমাদের চোখে খুব বড় হয়ে দেখা দেয়। তা হচ্ছে এই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজশক্তিগুলি আলেক্ষজাণ্ডারকে সাহায্যই করেছে, পক্ষান্তরে তাঁকে সবচেয়ে বাধা দিয়েছে ট্রাইবরা যাদের পরাস্ত করতে গ্রীকবাহিনীকে হিমসিম খেতে হয়েছে। এই রাজারা আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য করেছিলেন কেন ? এর উত্তর একটিই। তাঁরা জানতেন যে তাঁদের নিজেদের শক্তিতে তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশী প্রবল ট্রাইবদের পরাস্ত করে তাদের এলাকাগুলি নিজ নিজ রাজ্যের অঙ্গীভূত করতে পারবেন না। কাজেই যদি কোন বৈদেশিক শক্তি সে কাজটা করে দেয়, তার সুফল তাঁদেরই ভোগে লাগবে, যখন তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চিতই ছিলেন যে আলেকজাণ্ডার কোনদিনই এখানে পাকাপাকিভাবে রাজত্ব

করবেন না। তাঁদের হিসাবেও খুব ভুল হয়নি। শশীগুপ্ত, অম্ভি ও পুরুই শুধু লাভবান হননি আরো অনেক ছোটখাট রাজাও আলেকজাণ্ডারের জয়লাভের ভাগ পেয়েছিলেন। যেমন অভিসার-রাজ যিনি গোড়ায় আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেও পরবর্তীকালে ঘুরে গিয়েছিলেন, রাজা সৌভূতি (Sophytes), ভগলা (Phegelas) প্রভৃতি, যাঁরা আলেকজাণ্ডারের পক্ষেই ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সবচেয়ে বড় পরিণাম এই ট্রাইবদের ধ্বংসসাধন, যদিও এই ট্রাইবাল এলাকাগুলির যাঁরা পরে মালিক হয়েছিলেন তাঁরা বেশিদিন সেই মালিকানা বজায় রাখতে পারেন নি। ক্ষুদ্র শক্তির পক্ষে বৃহৎ শক্তিকে এড়িয়ে টিঁকে থাকা খুবই কঠিন, কাজেই পরবর্তীকালে এঁদের স্বেচ্ছায় হোক বা পরাজিত হয়েই হোক মৌর্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে যেতেই হয়েছিল।

২॥ ষোড়শ মহাজনপদ

বৌদ্ধ গ্রন্থ অঙ্গুত্তরনিকায় এবং জৈন গ্রন্থ ভগবতীসূত্র থেকে জানা যায় যে বুদ্ধ ও মহাবীরের সময়ে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, উত্তর ভারতে ষোলটি মহাজনপদ ছিল। জনপদ শব্দটি বলতে রাষ্ট্র বোঝায় না, বোঝায় Tribal Settlement। তাই মহাজনপদগুলিকে আমরা ঠিক রাষ্ট্র আখ্যা দিতে পারি না, যদিও আমরা দেখি এদের মধ্যে অনেকগুলিই, খুবই অল্পকালের মধ্যেই, অর্থাৎ বুদ্ধ ও মহাবীরের জীবদ্দশাতেই, পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। এগুলিকে আসলে আমরা বলতে পারি *Potential State*, যেগুলিতে রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল, যদিও পূর্ণাঙ্গ বিকাশ বুদ্ধের আগের যুগে সর্বত্র ঘটেনি।

মহাজনপদগুলির নাম নিয়ে বৌদ্ধ ও জৈন তালিকার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধ তালিকার মধ্যেও নামের প্রভেদ আছে। আমরা এখানে অঙ্গুত্তরনিকায়ে বর্ণিত নামগুলিরই উল্লেখ করছি। (১) অঙ্গ, বর্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা, রাজধানী চম্পা; (২) কাশি, রাজধানী বারাণসী; (৩) কোসল বর্তমান অযোধ্যা অঞ্চল, রাজধানী শ্রাবস্তী; (৪) বৃজি; (৫) মল্ল (৩॥ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); (৬) চেদি, যমুনা অঞ্চল, কুরু ও বৎস রাজ্যের মাঝখানে, রাজধানী শুক্তিমতী নগর; (৭) বৎস, যমুনা অঞ্চলে, রাজধানী কোশাম্বী; (৮) কুরু, বর্তমান দিল্লী অঞ্চল, রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ; (৯) পাঞ্চাল, বর্তমান বদায়ুন, ফারুখাবাদ ও সন্নিহিত জেলাসমূহ, রাজধানী অহিচ্ছত্র এবং কাম্পিল্য; (১০) মৎস্য, বর্তমান আলোয়ার ও ভরতপুর, রাজধানী বিরাটনগর; (১১) শূরসেন, বর্তমান মথুরা

অঞ্চল, রাজধানী মথুরা; (১২) অশ্মক, গোদাবরী নদী অঞ্চল, রাজধানী প্রতিষ্ঠান; (১৩) অবন্তী, বর্তমান মধ্যপ্রদেশের মালব, নিমার প্রভৃতি অঞ্চল, রাজধানী মাহিষ্মতী ; (১৪) গান্ধার, বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ার অঞ্চল, রাজধানী তক্ষশিলা ; (১৫) কাম্বোজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলা থেকে কাফিরিস্তান পর্যন্ত, রাজধানীর নাম নিয়ে সংশয় আছে ; এবং (১৬) মগধ।

জৈন গ্রন্থ ভগবতীসূত্রেও ষোলটি দেশের নাম পাওয়া যায়; অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মলয়, মালব, অচ্ছ, বচ্ছ, কোচ্ছ, পাঢ়, লাঢ় (রাঢ়), বজ্জি, মোলি, কাশি, কোশল, অবাহ এবং সম্ভুত্তর। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি নামই বৌদ্ধ তালিকার সঙ্গে মেলে। যেগুলি মেলে না সেগুলির মধ্যে মলয় দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বতাঞ্চল, বঙ্গ ও লাঢ় যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ, পাঢ় সম্ভবত পাণ্ড্যদেশ, সম্ভুত্তর এবং কোচ্ছ যথাক্রমে সুহ্ম ও কচ্ছ। জৈন তালিকাটি অধিকতর ব্যাপক এবং পরবর্তী কালে রচিত। বৌদ্ধ মহাগোবিন্দ-সুত্তান্তে সাতটি অঞ্চল ও তাদের রাজধানীর নাম দেওয়া আছে, যথা কলিঙ্গ (রাজধানী দন্তপুর), অস্সক (রাজধানী পোতন), অবন্তী (রাজধানী মাহিষ্মতী), সোবীর (রাজধানী রোরুক), বিদেহ (রাজধানী মিথিলা), অঙ্গ (রাজধানী চম্পা) ও কাশি (রাজধানী বারাণসী)।

৩॥ ট্রাইব ও সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র

আমরা আগে দেখেছি যে ট্রাইবাল ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপরেই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইবাল সমাজ ধ্বংস হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি কার্যকরী হবার সুযোগ পায় না। বাইরের রাষ্ট্রশক্তির আঘাতেও ট্রাইবাল সমাজের ধ্বংস হতে পারে এবং ভারতের ইতিহাসে এটাই ঘটেছে বারবার। এই গ্রন্থের সূচনাতেই আমরা উল্লেখ করেছি কৌটিল্যের সুপারিশ, যেখানে তিনি বলেছেন যে রাজার প্রথম কর্তব্যই হচ্ছে ছলে-বলে-কৌশলে যে কোন উপায়ে ট্রাইবগুলির মধ্যে ভেদ ঘটানো, তারপর সেগুলিকে ধ্বংস করা এবং ট্রাইবাল মানুষদের গণবন্ধন থেকে বিযুক্ত করে রাষ্ট্রের আওতায় তাদের বৃত্তিমূলক কর্মে নিযুক্ত করা। ভারত ইতিহাসে এই পদ্ধতিই চলছে আজও পর্যন্ত। খুব কম ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবে ট্রাইবগুলি নিজের থেকে ভেঙে যাবার সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু যেখানে যেখানে সে অবস্থা এসেছে সে সকল জায়গায় ট্রাইব ভেঙে রাষ্ট্রের উদ্ভব হলেও তা সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধের সমকালীন

এই রকম কয়েকটি সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের উল্লেখ আমরা অতঃপর করব। প্রথমেই বুদ্ধের নিজের ট্রাইব শাক্যদের উল্লেখ করা যাক। শাক্য-অধ্যুষিত এলাকার উত্তরে ছিল হিমালয়, পূর্বে রোহিণী নদী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে রাপ্তী নদী। শাক্যরা বিশুদ্ধ ট্রাইবাল দশা থেকে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পেরেছিল। তাদের রাজধানীর নাম ছিল কপিলবাস্তু। শাক্যদের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালিত করত একটি নির্বাচিত সংসদ, যার নাম ছিল সন্থাগার। রাষ্ট্রপ্রধানের পদও ছিল নির্বাচনসাপেক্ষ, অনুরূপ সংবিধান সকল সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই বর্তমান ছিল। শাক্যদের জ্ঞাতি ও প্রতিবেশী ছিল রামগ্রামের কোলিয়রা যারা বাস করত রোহিণী নদীর পূর্বে। বগ্‌গ ছিল আর একটি ট্রাইব যারা বৎস রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পিপ্পলিবনের মোরিয়রা বাস করত কুশনগরের পশ্চিমে, পরবর্তী ভারতের ইতিহাসে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

বৃজি বা বজ্জি ছিল একটি সাধারণতন্ত্রী সংযুক্তরাষ্ট্র, যা বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক ও বজ্জি এই চারটি ট্রাইব সমবায়ে গঠিত ছিল, রাজধানী ছিল বৈশালী, মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান বসার। বুদ্ধ ও মহাবীরের সময় এই যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন চেটক বা চেদগ, যিনি সম্পর্কে ছিলেন মহাবীরের মাতুল। মল্লদেরও ছিল অনুরূপ সাধারণতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র, এবং তা ছিল নয়টি ট্রাইবের সমবায়। কুশিনারা এবং পাবা ছিল তাদের প্রধান শহর।

৪ ॥ অবন্তী-বৎস-কোসল

উপরে উল্লিখিত ষোলটি মহজনপদের মধ্যে যে কয়টি খুব দ্রুত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে অবন্তী, বৎস ও কোসলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবন্তী ছিল ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত, বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মালব, নিমার প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে। রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী ও পরে উজ্জয়িনী। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন অবন্তীর রাজা চণ্ড প্রদ্যোত মহাসেন যাঁর অধীনে অবন্তী খুবই শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। মগধরাজ অজাতশত্রু প্রদ্যোতের কাছ থেকে একটি আক্রমণ আশা করে নিজ রাজধানী রাজগৃহকে সুরক্ষিত করেছিলেন যদিও সে আক্রমণ হয়নি। প্রদ্যোতের পর পালক, বিশাখযুপ, অজক এবং নন্দিবর্ধন অবন্তী রাজ্যে রাজত্ব করেন। নন্দি-বর্ধনকে পরাজিত করে মগধরাজ শিশুনাগ অবন্তীকে মগধের অঙ্গীভূত করেন।

বৎস দেশটি ছিল যমুনা অঞ্চলে যার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী, বর্তমান

কোশাম। বুদ্ধের সমকালীন ছিলেন বৎস-রাজ উদয়ন, যাঁকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে। উদয়ন গোড়ার দিকে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হলেও পরে পিণ্ডোল নামক এক ভিক্ষুর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না, যদিও তিনি প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তাকে বিবাহ করেছিলেন। উদয়নের পর বৎসরাজ্যের ইতিহাস অজ্ঞাত, তবে ওই রাজ্যটি নিঃসন্দেহে মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তবে তা কাদের আমলে সেকথা বলা যায় না।

বুদ্ধের আবির্ভাবের কিছু আগে থেকেই কোশল (কোসল) মহাকোশলের নেতৃত্বে একটি শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। মহাকোশল নামটিই ট্রাইব বাচক। তাঁর আমলেই কোসল ট্রাইবাল দশা থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল সন্দেহ নেই। তিনি কেশপুত্ত অঞ্চলের কালাম ট্রাইবকে নিজের অধীনে আনেন, এবং এ ছাড়া কাশি-রাজ্য জয় করেন। তাঁর পুত্র প্রসেনজিৎ বুদ্ধের সমসাময়িক ও একজন অনুরাগী ছিলেন। প্রসেনজিৎ নিজপুত্র বিড়ুড়ভের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন, এবং নিজ ভাগ্নে মগধরাজ অজাতশত্রুর কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায় এসে রাজগৃহ নগরে প্রবেশের পথে অবসাদ ও ক্লান্তিতে মারা যান। বিড়ুড়ভ রাজা হয়ে শাক্যদের নির্মূল করেন, এবং এই ঘটনা ঘটেছিল বুদ্ধের জীবনকালেই। বিড়ুড়ভের পর কোসলের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, তবে কোসলও নিঃসন্দেহে মগধের অঙ্গীভূত হয়েছিল।

৫ ॥ বুদ্ধ, মহাবীর ও সমসাময়িক রাজনীতি

গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর এমন সময়ে জন্মেছিলেন যখন উত্তর-পূর্ব ভারতে ট্রাইবাল ব্যবস্থা ভেঙে যাচ্ছে, এবং তার জায়গায় গড়ে উঠছে রাষ্ট্রশক্তি অনেক রক্ত ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে। অধিকাংশকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয়ের চূড়ান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই অহিংস উপায়ে হয়নি। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে কোসলের রাষ্ট্রশক্তি বুদ্ধের চোখের সামনেই তাঁর জ্ঞাতি পরিজনদের হত্যা করেছিল, শাক্যদের নির্মূল করেছিল। তাঁদের চোখের সামনেই মগধরাজ অজাতশত্রু বৃজি সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন, এবং আমরা দেখব যে এই ব্যাপারে বুদ্ধও নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারেননি। সেই ভয়াবহ হত্যা ও রক্তপাতের দুর্যোগময় দিনগুলিতে বুদ্ধ এবং মহাবীরের সমসাময়িক আরও অনেক দার্শনিক—যেমন পুরণ কশ্যপ, পকুধ কচ্চায়ন, অজিত

কেশকম্বলী প্রমুখ অনেকেই—হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, যা দেখে পূরণ কশ্যপ বলেছিলেন, পাপপুণ্য ন্যায় অন্যায়ের সনাতন ধারণা মিথ্যা, পকুধ কচ্চায়ন বলেছিলেন, হত্যা যেন এক উপাদানকে আর এক উপাদানে পরিণত করা ছাড়া আর কিছুই নয়, অজিত কেশকম্বলী বলেছিলেন, যা দেখা যাচ্ছে শ্মশান ভিন্ন মানুষের আর কোন গতি নেই, সঞ্জয় বেলুঠ্‌ঠিপুত্ত বলেছিলেন, ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করা মানুষের সাধ্যাতীত, আর গোশাল মংখলিপুত্ত উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল অজাতশত্রুর বৃজি দেশ আক্রমণের দুঃস্বপ্নের মধ্যে, তাঁর অন্তিম প্রলাপেও অজাতশত্রু ব্যবহৃত অস্ত্রের নাম শোনা গিয়েছিল। বুদ্ধ ও মহাবীর অবশ্য একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যাননি, তাঁরা জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সংঘে যোগদানের জন্য, যেখানে তাঁরা তাদের দিতে চেয়েছিলেন একটি হারিয়ে যাওয়া বাস্তবের কাল্পনিক বিকল্প, হারিয়ে যাওয়া ট্রাইবাল সাম্যের আস্বাদ, যদিও তাঁরা জানতেন ইতিহাসের অনিবার্য গতিকে রোধ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

বুদ্ধ দুঃখ বলতে জাগতিক দুঃখকেই বুঝেছিলেন, এবং তার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্যই সংঘসমূহের সৃষ্টি করেছিলেন। রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ তিনি অনুসন্ধান করেছেন সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে। ধনবৈষম্যের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যাসমূহ, দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ধনিক শ্রেণীর সীমাহীন লোভ, সমস্ত বিষয়ের উপরেই বুদ্ধের সুচিন্তিত বক্তব্য আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা অধিকাংশই এ বিষয়ে নীরব থেকেছেন। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই ট্রাইবাল-গণতান্ত্রিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ সংঘগুলির ভিতরকার নিয়মাবলী ছিল পুরোদস্তুর গণতান্ত্রিক, একেবারে ট্রাইবাল নিয়ম সমূহ বসানো, এবং সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন স্থান ছিল না। হারিয়ে যাওয়া সাম্যাশ্রয়ী জীবনের আদর্শ সংঘের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেই বুদ্ধ ক্ষান্ত হন নি, তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন যাতে সংঘবাসী ভিক্ষুরা বাইরের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলী থেকে নিজেদের নির্লিপ্ত করে রাখে। মহাবীরও অনুরূপ পথ নিয়েছিলেন। জৈন সংঘের নেতাদের উপাধি ছিল গণধর, যার একমাত্র ইংরাজী অনুবাদ হয় *Tribel Chief*।

কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে বুদ্ধের ভক্তদের মধ্যে তৎকালীন বহু অভিজাত ব্যক্তিরাও ছিলেন। বহু শ্রেষ্ঠীও তাঁর ভক্ত ছিল। আমরা এও দেখি যে বৌদ্ধ ধর্ম বণিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশেষ সদয়। ঋণদান

সুদ গ্রহণ, দাস রাখা বৌদ্ধ শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে। বুদ্ধ বারবার বলেছেন ঋণগ্রহীতা ও দাসদের প্রভুর কাছে বাধ্যবাধকতা ত্যাগ করা অন্যায়। কর প্রদানের যোগ্যতাকে গুণ বলে গণ্য করা হয়েছে। নগরজীবন, সাধারণ ভোজন স্থানে ভোজন, গৃহছাড়া ও ভ্রাম্যমান বণিক শ্রেণীর চিত্তবিনোদনের জন্য সাধারণী মহিলাদের প্রয়োজনীয়তা, কোন কিছুকেই বৌদ্ধধর্ম অস্বীকার করেনি। পশুবধ-বিরোধী প্রচার বণিকশ্রেণীর ধনার্জনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, কেননা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেও পশুই ছিল প্রধান ধন, যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের নামে সেগুলির কাণ্ডজ্ঞানহীন ধ্বংসকে বুদ্ধ ও মহাবীর কেউই সমর্থন করেননি। এই নতুন সামাজিক শ্রেণীর, পূর্ববর্তী যুগে যারা ছিল অপাঙতেয়, বুদ্ধ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হবার কারণ একটিই ছিল। আসলে বুদ্ধকে কাজ করতে হয়েছিল ইতিহাসের একটি অচেতন যন্ত্র হিসাবে। হারানো দিনের সাম্যাবস্থাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনা ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। রাষ্ট্র ও শ্রেণীসমাজের অনিবার্যতা রোধ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, এবং এই অবস্থায় তিনি যা করতে পারতেন, এবং প্রশংসনীয় ভাবে যা করছিলেন, তা হচ্ছে নূতন গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কল্যাণকর দিকগুলিকে জনজীবনে প্রতিষ্ঠা করা, এবং হারিয়ে যাওয়া ট্রাইবাল জীবনের কিছু নৈতিক মূল্যবোধের পুর্ণজাগরণ ঘটানো।

৬ ॥ মগধের অভ্যুত্থান : হর্যংক বংশ

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বলা হয়েছে যে মগধরাজ বিম্বিসার হর্যংক-কুলের মানুষ ছিলেন (১১।২)। সিংহলী গ্রন্থ মহাবংসে বলা হয়েছে যে তিনি মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর পিতা কর্তৃক মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁর পিতার নাম ছিল ভট্টিয় বা মহাপদ্ম। বিম্বিসার কোসলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নীকে বিবাহ করে কাশি অঞ্চলটি যৌতুক স্বরূপ পান। এঁরই গর্ভে সম্ভবত অজাতশত্রু জন্মগ্রহণ করেন, যদিও কোন কোন গ্রন্থে অজাতশত্রুকে বিম্বিসারের অপর পত্নী বৈদেহী বাসবীর গর্ভজাত বলা হয়েছে। বিম্বিসারের তৃতীয়া পত্নী ছিলেন লিচ্ছবি-প্রধান চেটকের কন্যা চেল্লনা যাঁর গর্ভে তাঁর অপর দুই পুত্র হল্ল ও বেহল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চতুর্থা পত্নী ছিলেন মদ্র রাজকন্যা ক্ষেমা। লিচ্ছবি নর্তকী আম্রপালীর গর্ভেও বিম্বিসারের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল, যাঁর নাম অভয়। এই বিবাহগুলি বিম্বিসারের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে,

যদিও বিভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত তাঁর সন্তানসমূহ উত্তরকালে তাঁর জীবনে বিশেষ বিড়ম্বনার কারণ হয়েছিল।

বিম্বিসার একটি মাত্রই যুদ্ধ করেছিলেন এবং তা অঙ্গদেশের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধের ফলে অঙ্গ মগধ রাজ্যের অধীনে আসে। কাশি ইতিমধ্যেই এসেছিল। কাজেই পূর্ব ভারতে মগধ একটি গণনীয় শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া বিম্বিসার নিজের শক্তিকে সংহত করার জন্য নিকট ও দূরবর্তী রাজ্যসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। গন্ধাররাজ পুক্কুসাতির নিকট তিনি দূত পাঠান, এবং অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের সঙ্গেও তিনি রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহে বলা হয়েছে যে ৮০,০০০ গ্রাম নিয়ে ছিল তাঁর রাজত্ব। এটি নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জন। বিম্বিসারের রাজ্যকাল খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪ থেকে ৪৯৩ পর্যন্ত। বিম্বিসারের রাজধানী ছিল গিরিব্রজ বা রাজগৃহ।

বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় ধর্মই বিম্বিসারকে তাদের অনুগামী বলে দাবি করেছে। অবশ্য সে আমলে রাজারা অল্পবিস্তর চলতি সব ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক হতেন, ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন। জৈন ধর্মের প্রতি বিম্বিসারের আকর্ষণ সম্ভবত তাঁর স্ত্রী চেল্লনার জন্যই গড়ে উঠেছিল। বুদ্ধের সঙ্গে বিম্বিসারের বার বার দেখা হয়েছে, এমন কি তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের আগেও। তিনি বৌদ্ধ সংঘকে বেলুবন নামক একটি উদ্যান উপহার দিয়েছিলেন, নিজ চিকিৎসক জীবককে বৌদ্ধ সংঘে চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, এবং ভিক্ষুদের ভ্রমণ ব্যয় মুকুব করে দিয়েছিলেন।

বিম্বিসার তাঁর পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হন। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে যে অজাতশত্রু বুদ্ধের জ্ঞাতি ভাই দেবদত্তের প্ররোচনায় এই কাজ করেছিলেন! জৈন গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে যে বিম্বিসার অজাতশত্রু কর্তৃক বন্দী হন, এবং নিহত হবার আশংকায় তিনি বন্দী অবস্থাতেই বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।

অজাতশত্রু (রাজত্বকাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪৮৪ থেকে ৪৬২) রাজা হয়েই প্রথমে কোসলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বিম্বিসারের হত্যাকাণ্ডে কোসলরাজ প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রদত্ত কাশিরাজ্যের অধিকার ফিরিয়ে নেন এবং এই থেকেই উভয়ের সংঘর্ষের সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য উভয় তরফের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয়, প্রসেনজিৎ নিজকন্যা বজ্রার সঙ্গে অজাতশত্রুর বিবাহ দেন এবং কাশির অধিকার প্রত্যর্পণ করেন।

কিন্তু অজাতশত্রুর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা সাধারণতন্ত্রী বৃজি যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন। জৈন গ্রন্থসমূহের মতে নয়টি মল্ল ট্রাইব, নয়টি লিচ্ছবি ট্রাইব এবং কাশি ও কোসলের আঠারটি গণরাজ্য নিয়ে গঠিত বৃজি সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন চেটক। যুদ্ধের কারণ হিসাবে সেখানে বলা হয়েছে যে রাজা বিম্বিসার তাঁর দুই পুত্র হল্ল ও বেহল্লকে মগধের রাজহস্তী সেয়নাগ এবং আঠারো ছড়ার একটি বিরাট মুক্তার হার উপহার দিয়েছিলেন এবং সেগুলি নিয়ে তাঁরা বৈশালীতে তাঁদের মাতামহ চেটকের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অজাতশত্রু সেগুলি দাবি করে বসেন এবং তা রক্ষিত না হওয়ায় চেটকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ সাহিত্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী মগধ ও বৃজি সাধারণতন্ত্রের সীমানায় একটি মানিকের খনি আবিষ্কৃত হয়, যার মালিকানার দ্বন্দ্ব থেকেই এই সংঘর্ষের উদ্ভব। উভয় মতের কোনটাই বোধ হয় ঠিক নয়। উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার পার্শ্ববর্তী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কখনই সহ্য করে না, কেননা তার আদর্শগত প্রভাব সাম্রাজ্যের নিজস্ব অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। এটাই ছিল অজাতশত্রুর যুদ্ধাভিযানের মূল কারণ। যে প্রেরণায় উত্তর পশ্চিমের রাজতন্ত্রগুলি পার্শ্ববর্তী ট্রাইবাল গণতন্ত্রগুলির ধ্বংস করার জন্য আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য করেছিল, যে প্রেরণায় পরবর্তীকালে অশোক কলিঙ্গদের ধ্বংস করেছিলেন, যে প্রেরণায় কৌটিল্য সংঘ ভাঙার অজস্র কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন, অজাতশত্রুর প্রেরণা তার থেকে ভিন্ন ছিল না।

এটা হঠাৎ আক্রমণ নয়। দীর্ঘকাল ধরে অজাতশত্রু এর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি প্রথমে বৃজিদের বিচ্ছিন্ন করেন। মন্ত্রী বর্ষকারকে দিয়ে তিনি বৃজিদের মধ্যে বিভেদ আনার চেষ্টা করেন। উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রেরও তিনি প্রবর্তন করেন! এই রকম দুটি অস্ত্রের নাম পাওয়া গেছে রথমুসল ও মহাশিলাকন্টক। বৃজিদের ধ্বংস করার এই ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখে খোদ বুদ্ধপর্যন্ত নির্লিপ্ত থাকতে পারেন নি। তাঁর আকর্ষণ ছিল ওই সাধারণতন্ত্রী বৃজিদের দিকেই। তিনি বলেছিলেন যতদিন পর্যন্ত বৃজিরা তাদের পুরাতন ট্রাইবাল নিয়মগুলি মেনে চলবে ততদিন কোন বাইরের শক্তি তাদের ধ্বংস করতে পারবে না।

এই যুদ্ধ চলেছিল একনাগাড়ে ষোল বছরেরও বেশি। যদি ৪৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দকে বুদ্ধের মৃত্যুর বছর বলে মনে করা যায়, তাহলে বুদ্ধ যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখেছিলেন কিন্তু যুদ্ধ দেখেননি। গোশাল মংখলিপুত্র ৪৮৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এই যুদ্ধের সূচনাতেই

মারা যান ভগ্নহৃদয়ে। তাঁর অন্তিম প্রলাপে অজাতশত্রুর যুদ্ধ উদ্যোগের সর্বনাশা ফলাফলের আশংকা ফুটে উঠেছিল। এ ছিল তাঁর কাছে শেষ ঝটিকাবাহী মহামেঘ যা মানবতার সকল আশাকেই ধূলিসাৎ করবে। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ৪৬৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে মহাবীর মারা গিয়েছিলেন, এবং তখনও বৃজিরা পরাজিত হয়নি। অবশ্য তারা শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

বৃজিদের সঙ্গে যুদ্ধের পর অজাতশত্রু অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের একটি আক্রমণ আশংকা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজগৃহ ছাড়াও পাটলিপুত্র নগরটিও তিনি সুরক্ষিত করেন। সে আক্রমণ অবশ্য হয়নি। সম্ভবত অজাতশত্রুর রাজত্বের শেষ দিকে কোসলরাজ বিড়ুড়ভ মারা গিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে অজাতশত্রু কোসলের কিয়দংশ মগধের অঙ্গীভূত করেন।

৪৬২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর ৪৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত তাঁর বংশধরেরা মগধে রাজত্ব করেন। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে উদয়ভদ্র, অনুরুদ্ধ, মুণ্ড এবং নাগ দাসক। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের বক্তব্য অনুযায়ী এঁরা সকলেই ছিলেন পিতৃঘাতী, যার ফলে নাগদাসকের রাজত্বকালে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে মন্ত্রী শিশুনাগকে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে।

৭॥ শৈশুনাগ বংশ

শিশুনাগ ও তাঁর বংশধররা মগধে রাজত্ব করেন আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪৩০ থেকে ৩৬৪ পর্যন্ত। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুযায়ী শিশুনাগ অবন্তীরাজ্য জয় করেন, এবং তাঁর সময়েই কোসলের অবশিষ্টাংশ এবং বৎসদেশ মগধের অধিকারে আসে। শিশুনাগের পুত্র কালাশোক, যিনি পুরাণ সমূহে কাকবর্ণ নামে খ্যাত, বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। রাজ-অন্তঃপুরের একটি চক্রান্তে কালাশোক নিহত হন। তাঁকে গলায় ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, একথা বাণভট্টের হর্ষচরিতে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রীক লেখক কুরসিয়াসও এই কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে হত্যাকারী ছিল তাঁরই নাপিত। কুরসিয়াসের মতে এই হত্যাকারীই পরবর্তী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিল।

৮॥ নন্দবংশ

নন্দবংশীয় রাজারা মগধে রাজত্ব করেছিলেন আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩৬৪ থেকে

৩২৪ পর্যন্ত। জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ঐতিহ্য অনুযায়ী নন্দরাজারা হীনবংশীয় ছিলেন এবং একথা পুরাণসমূহ ও গ্রীক লেখকদের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। জৈন আবশ্যক-সূত্রে নন্দদের বলা হয়েছে নাপিতদাস, কুরসিয়াসও কালাশোকের হত্যাকারীকে নাপিত বলেছেন।

নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রকম। পুরাণ সমূহে তাঁকে বলা হয়েছে মহাপদ্ম, মহাবোধিবংশ গ্রন্থে তাঁকে বলা হয়েছে উগ্রসেন। সম্ভবত এই উগ্রসেন বা উগ্রসৈন্য থেকেই গ্রীক লেখকেরা আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক নন্দকে Agrammes আখ্যা দিয়েছিলেন। নন্দরা সংখ্যায় ছিলেন নয় জন। পুরাণ সমূহে শেষ আটজনকে প্রথম জনের সন্তান বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে এঁদের নয় ভাই বলা হয়েছে। মহাবংশটীকা গ্রন্থে প্রথম ও শেষ নন্দর বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে উগ্রসেন সীমান্ত অঞ্চলের (প্রত্যন্তবাসিক) একজন দস্যুসর্দার ছিলেন এবং পরে বাহুবলেই মগধের সম্রাট হয়েছিলেন। পুরাণসমূহ তাঁকে মহাপদ্ম এবং দ্বিতীয় পরশুরাম বলে উল্লেখ করেছে। তিনি ঐক্ষাকু, পঞ্চাল, কাশি, হৈহয়, কলিঙ্গ, অশ্মক, কুরু, মৈথিল, শূরসেন ও বীতিহোত্রদের জয় করেছিলেন। এগুলি বাড়াবাড়ি কিনা জানিনা, তবে তিনি যে কলিঙ্গদের জয় করেছিলেন তার উল্লেখ খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখমালায় পাওয়া যায়। মহীশূর থেকে প্রাপ্ত কিছু লেখমালায় বলা হয়েছে যে কুন্তল অঞ্চলে (দক্ষিণ মহারাষ্ট্র এবং উত্তর-পশ্চিম মহীশূর) নন্দদের আধিপত্য ছিল। গোদাবরীর উপর নান্দের নামক স্থানটিকে (নবনন্দেরা) অনেকে নন্দদের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন।

পরবর্তী নন্দরাজাদের বিষয়ে কিছু জানা যায় না, তবে শেষ নন্দরাজা, যিনি আলেকজাণ্ডারের সমকালীন ছিলেন, গ্রীক লেখকদের গ্রন্থে Agrammes বা Xandrammes নামে উল্লিখিত হয়েছেন। তাঁকে বলা হয়েছে Gangaridae এবং Prasii-দের শক্তিমান সম্রাট যাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। Gangaridae বলতে গঙ্গাবিধৌত অঞ্চল বোঝায়, Prasii বলতে প্রাচ্য। কুরসিয়াস বলেছেন যে Agrammes-এর সৈন্যবাহিনী ছিল ২০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ রথ এবং ৩,০০০ হাতি। অপরাপর গ্রীক লেখকেরা এই সংখ্যাকে আরও বাড়িয়েছেন, এবং অন্তত একজনও বলেছেন নন্দদের এই শক্তির আতঙ্ক গ্রীকদের ফিরে যাবার একটি কারণ ছিল।

কিন্তু এত শক্তি সত্ত্বেও নন্দরা চন্দ্রগুপ্তের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত

হয়েছিলেন তার কারণ তাঁদের পিছনে কোন গণসমর্থন ছিল না। গ্রীক লেখকেরাই বলেছেন যে তাঁরা ছিলেন নীচ প্রকৃতির, ধনলিপ্সু ও উৎপীড়ক। নন্দদের প্রভূত ধনসঞ্চয়ের কথা, উৎপীড়নমূলক কর আদায় পদ্ধতির কথা ভারতীয় সাহিত্যেও উল্লিখিত। এমন কি হিউয়েন সাঙ-ও খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে নন্দদের ধন-সম্পদের গল্প শুনেছিলেন।

৯॥ মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা : চন্দ্রগুপ্ত

নন্দদের যিনি উৎখাত করেছিলেন সেই চন্দ্রগুপ্তের জীবনের গোড়ার দিকের কথা খুব কমই জানা যায়। জাষ্টিন বলেছেন তিনি ছিলেন হীনবংশীয়। তাঁর মৌর্য উপাধিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তিনি ময়ূর পোষকদের (যারা ময়ূর পোষে) মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার বলেছেন যে চন্দ্রগুপ্তের মায়ের নাম মুরা যার থেকে তাঁর বংশ মৌর্য নামে খ্যাত হয়েছে। কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে মৌর্য শব্দটি মুরা থেকে নিষ্পন্ন হতে পারে না। অনেক পরবর্তীকালে রচিত বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে বৃষল এবং কুলহীন বলা হয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহে বলা হয়েছে যে চন্দ্রগুপ্ত পিপ্‌ফলিবনের মোরিয় ট্রাইবের লোক ছিলেন, এবং সম্ভবত এটাই সঠিক কেননা মোরিয় নামক একটি ট্রাইবের সত্যই অস্তিত্ব ছিল, যাদের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্তের পিতা মোরিয়-কুলের প্রধান ছিলেন, এবং তিনি আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ায় তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রে পালিয়ে আসেন এবং সেখানে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। বালক চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য নামক জনৈক ব্যক্তিত্ববান ও প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণের নজরে পড়েন, যিনি তাঁকে তক্ষশিলায় নিয়ে যান এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেন।

এই চাণক্যই অর্থশাস্ত্রপ্রণেতা কৌটিল্য কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। চন্দ্রগুপ্তের জীবনে আদৌ চাণক্য নামক কোন ব্যক্তির সংস্পর্শ ঘটেছিল কিনা সেটাও সন্দেহজনক। তবে একটা চাণক্য বা কৌটিল্য ট্রাডিশন চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুক্ত আছে। পুরাণসমূহে বলা হয়েছে যে কৌটিল্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ নন্দদের উৎখাত করেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। পালি গ্রন্থ মহাবংশটীকায় বলা হয়েছে যে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য বিভিন্ন ট্রাইব থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, এবং এই মতের একটা প্রতিধ্বনি গ্রীক লেখক জাষ্টিনের

রচনায় পাওয়া যায়। মুদ্রারাক্ষস এবং জৈন গ্রন্থ পরিশিষ্টপর্ব থেকে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হিমালয় অঞ্চলের জনৈক পর্বতক নামক রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল যিনি তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। মুদ্রারাক্ষসের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়েছিল শক, যবন, কিরাত, কম্বোজ, পারসিক ও বাহ্লীকদের নিয়ে। কতদূর সত্য তা বলা যায় না।

চন্দ্রগুপ্ত নন্দদের ধ্বংস করেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হয়েছিল এ বিষয়ে সংবাদ খুব অল্পই আমাদের হাতে আছে। মিলিন্দ-পঞ্হো গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মগধবাহিনী ধ্বংসের একটি অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে। জৈন গ্রন্থ সমূহে বলা হয়েছে যে, যেভাবে একটি বালক একটি গরম পিঠার ঠিক মাঝখানে হাত দেয় চারপাশকে উপেক্ষা করে, চন্দ্রগুপ্ত তেমনি নন্দদের রাজ্যের সীমান্ত থেকে আক্রমণ না করে, খোদ রাজধানীতে আকস্মিক আক্রমণ চালান। বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশটীকাতেও বলা হয়েছে চন্দ্রগুপ্তের আক্রমণ যেন একটি রুটির চারপাশ ফেলে দিয়ে শুধু মধ্যাংশটুকুই ভক্ষণের মত ঘটেছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত ক্ষমতা লাভ করেছিলেন অতর্কিতে। রাজধানী পাটলিপুত্রে তিনি আকস্মিক আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং প্রতিহত হবার আগেই নন্দ-রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নিয়েছিলেন।

১০ ॥ চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রীকশক্তি

গ্রীক লেখকদের মতে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কিন্তু কোন কারণে আলেকজাণ্ডার ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কোন রকমে আত্মরক্ষা করেন। এর পর চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক রাজনীতির গতিবিধি মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গ্রীক অধিকৃত এলাকাগুলিতে প্রায়ই বিদ্রোহ ঘটছিল। প্রথমে বিদ্রোহ ঘটে কান্দাহারে, এবং তারপর Assakenoi-রা তাদের গ্রীক শাসক নিকানোরকে হত্যা করে। ৩২৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে উত্তর সিন্ধু উপত্যকার গ্রীক শাসক ফিলিপাস নিহত হন। আলেক-জাণ্ডার নিজে মারা যান ব্যাবিলনে ৩২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে, এবং তারপরই তাঁর পূর্ব-দিকের সাম্রাজ্যে ভাঙনের লক্ষণ দেখা যায়।

এই অবস্থার সুযোগ চন্দ্রগুপ্ত নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে জাষ্টিন যা লিখেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত একটি সুগঠিত বাহিনীর সাহায্যে একের পর এক গ্রীক গভর্নরদের খতম করেন। ৩১৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দের আগে একাজ শেষ হয়

নি। ৩২১ খৃষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য ভাগ হবার পর পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে কোন গ্রীক গভর্নরকে বসানো হয় নি, যা থেকে বোঝা যায় যে ওই অঞ্চলগুলি ইতিমধ্যেই তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ৩১৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্জলের গ্রীকবাহিনীর অধ্যক্ষ ইউডেমাস পাকাপাকিভাবেই এদেশ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন আর ফিরে আসেন নি। এই সকল পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রমাণ করে যে ওই সময়ের মধ্যে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে এসেছিল।

পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্তকে একটি গ্রীক আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ৩০৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে সেলুকস, যিনি আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের পূর্ব অঞ্চলের অধিপতি হয়েছিলেন, ভারতের অন্তর্গত প্রাক্তন গ্রীক এলাকাগুলি পুনরধিকারের জন্য চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধের পরে সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে আরিয়া (হীরাট), আরাকোসিয়া (কান্দাহার), পারোপানিসদেই (কাবুল) ও গেড্‌রোসিয়ার (বালুচিস্তানের) একাংশ প্রদান করেন, এবং বিনিময়ে চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে ৫০০ যুদ্ধ হস্তী অর্পণ করেন। এ ছাড়াও চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং অতঃপর তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন, এবং পাটলিপুত্রে তাঁর রাজসভায় মেগাস্থেনেস নামে একজন দূত রাখেন, যিনি তৎকালীন ভারত সম্পর্কে একটি তথ্যমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

১১ ॥ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

যে সাম্রাজ্য পরবর্তীকালে অশোক শাসন করেছিলেন তা মূলত চন্দ্রগুপ্তেরই সৃষ্টি, কেন না অশোক কলিঙ্গদের এলাকা ভিন্ন আর কিছুই জয় করেন নি, এবং তাঁর পিতা বিন্দুসারও রাজ্যবিজেতা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কাজেই অশোকের লেখমালা সমূহের ভৌগোলিক অবস্থানই প্রমাণ করে যে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পারস্যের সীমানা স্পর্শ করেছিল এবং দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তা বিস্তৃত হয়েছিল। কিছু তামিল গ্রন্থে বম্ব-মোরিয়ার বা উন্নাসিক-মৌর্যদের উল্লেখ আছে, যা সম্ভবত সুদূর দক্ষিণে মৌর্য অধিকারের সাক্ষ্য দেয়। এছাড়া শক ক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামার জুনাগড়-লিপি থেকে জানা যায় যে বর্তমান সৌরাষ্ট্র অঞ্চলও চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যসীমার মধ্যে ছিল, এবং সেখানে তাঁর পুষ্যগুপ্ত

নামক একজন নিজস্ব শাসনকর্তাও ছিলেন, এবং অশোকের সময় ওই পদে ছিলেন রাজা তুষাস্ফ নামক একজন গ্রীক।

১২ ॥ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু ও বিন্দুসার

আনুমানিক ৩২৪ থেকে ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেছিলেন। বিভিন্ন জৈন গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে ভদ্রবাহু নামক জৈন আচার্যের সংস্পর্শে আসেন, এবং জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহীশূরের শ্রবণ বেলগোলা নামক স্থানে জৈন আদর্শ অনুযায়ী তিনি অনশনে দেহত্যাগ করেন। শ্রবণ বেলগোলায় প্রাপ্ত পরবর্তীকালের কিছু লেখমালা থেকেও অনুরূপ ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। গ্রীক লেখকেরা তাঁকে তাঁর উপাধি Allitrochades বা Amitrochates (সংস্কৃত অমিত্রঘাত বা শত্রুহন্তা) বলে উল্লেখ করেছেন। জৈন গ্রন্থ রাজবলীকথা তাঁকে সিংহসেন বলে উল্লেখ করেছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ দিব্যাবদানে বলা হয়েছে যে তাঁর সময় তক্ষশিলায় একটি বিদ্রোহ ঘটে, এবং পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য বিন্দুসার তাঁর পুত্র অশোককে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। বিন্দুসার পশ্চিমের গ্রীকরাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব মূলক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। মেগাস্থেনেসের পর ডায়েমাকাস মৌর্য রাজসভায় দূত হয়ে আসেন। তিনি লিখেছেন, মিশররাজ দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেলফস তাঁর রাজ সভায় ডায়োনিসাস নামক একজন দূত পাঠিয়েছিলেন, অবশ্য তিনি বিন্দুসারের নাম উল্লেখ করেন নি। হেগেসান্দের লিখেছেন যে অমিত্রঘাত সিরিয়ার রাজা অ্যান্টিওকসের কাছে মিষ্ট মদ্য, শুষ্ক ডুমুর এবং একজন দার্শনিককে কিনতে চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। অ্যান্টিওকস জানিয়েছিলেন যে তাঁরা প্রথম দুটি জিনিস পাঠাতে পারেন, কিন্তু দার্শনিক বিক্রয় গ্রীক আইনে নিষিদ্ধ।

১৩ ॥ অশোক (২৭৩-২৩৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী, অশোক মাত্র আঠারো বছর বয়সে অবন্তী প্রদেশের শাসক নিযুক্ত হন এবং তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয় বিদিশা নগরীতে। পরে তাঁকে তক্ষশিলার শাসক করে পাঠানো হয়। দিব্যাবদান গ্রন্থে অশোকের আরও দুই ভাই-এর নাম পাওয়া যায়, সুসিম এবং বিগতশোক, যাঁদের

সিংহলী গ্রন্থসমূহে স্থমন এবং তিষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অশোকের পঞ্চম পর্বত লিপিতে তাঁর আরও কয়েকজন ভাইবোনের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে অশোক সম্পর্কিত দু'রকম কাহিনী পাওয়া যায়। সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে অশোক জন্ম-অপরাধী ছিলেন, হত্যা ও রক্তপাত ভিন্ন তিনি সুস্থির থাকতে পারতেন না, এবং এই কারণেই তিনি চণ্ডাশোক নাম পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপগুপ্ত নামক একজন ভিক্ষুর সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়ে যান, চণ্ডাশোক থেকে তাঁর ধর্মাশোকে রূপান্তর ঘটে। পক্ষান্তরে পালি গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে যে অশোক তাঁর নিরানব্বই জন ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন, এবং পরে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে পাপমুক্ত হন।

সৌভাগ্যক্রমে অশোক অনেক লেখমালা রেখে গেছেন, যা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে যা বলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। যেহেতু ওই গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন, সেই হেতু অশোককে কেন্দ্র করে কাল্পনিক কাহিনী খাড়া করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে। অশোকের চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বতলিপিতে অশোক নিজের ভ্রাতাভগ্নীদের কথা, এবং তাঁদের জন্য তাঁর স্নেহ ও উদ্বেগের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা স্পষ্টত বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ বর্ণিত বিবরণের পরিপন্থী। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে অশোকের সিংহাসন লাভ ও অভিষেকের ঘটনার মধ্যে চার বছর সময়ের ব্যবধান ছিল, এবং সিংহাসনের জন্য কোন দ্বন্দ্ব ঘটা অসম্ভব নয়। হর্যংক ও শিশুনাগ বংশের ইতিহাস আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে সিংহাসনের জন্য রক্তপাত একটা যেন অনিবার্য প্রথা, এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাজশক্তিকে হস্তগত করার একটি সুপ্রচলিত পথই হচ্ছে ভ্রাতৃবিরোধ ও রক্তপাত, পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বযুগেই যা কমবেশি বর্তমান।

১৪ ॥ কলিঙ্গ যুদ্ধ ও অশোকের পরিবর্তন

অভিষেকের আট বছর পরে অশোক পিতৃপুরুষের পদাংক অনুসরণ করে কলিঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যেহেতু অশোকের কোন লিপিতে কলিঙ্গের কোন রাজার উল্লেখ নেই—অথচ দূরবর্তী দেশের বিভিন্ন রাজা তাঁর বিভিন্ন লিপিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত—আমরা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে

পারি যে কলিঙ্গরা ট্রাইব ছিল, এবং তারা সর্বশক্তি দিয়ে অশোকের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। ত্রয়োদশ পর্বতলিপিতে অশোক উল্লেখ করছেন যে, এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়েছিল, একলক্ষের উপর লোক মারা গিয়েছিল, এতেই বোঝা যাচ্ছে কলিঙ্গরা কিভাবে অশোকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যদিও তারা শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

এই যুদ্ধ অশোকের মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর ত্রয়োদশ পর্বতলিপিতে এই বেদনাদায়ক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। ওই লিপির ভাষা এতই মর্মস্পর্শী এবং আন্তরিক, যা থেকে মনে হয় লিপিটি তিনি নিজহস্তে রচনা করেছিলেন। অতঃপর তিনি স্থির করেছিলেন যে তিনি যুদ্ধকে পাকাপাকিভাবে বর্জন করবেন, এবং পরিবর্তে ধর্মবিজয়কেই তাঁর জীবনের মূল ব্রত বলে গ্রহণ করবেন। ধর্মবিজয় বলতে তিনি বুঝেছিলেন অহিংসা, সংযম, সদ্ব্যবহার এবং ভদ্রতার আদর্শের দ্বারা উদ্দীপ্ত একটি সামাজিক মূল্যবোধ জনজীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

ইতিহাসে দেখা যায় যে শ্রেণী সমাজ প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকেই যুগে যুগে সর্বত্রই সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবি উঠেছে। শাসক বা রাজাদের মধ্যেও কেউ কেউ এই দাবির পক্ষে থেকেছেন, একটি নূতন আদর্শ ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে। অবশ্য এ প্রচেষ্টায় সাফল্য বড় একটা আসে না, এবং কিছু সাফল্য এলেও তা ক্ষণিকই হয়, কেননা প্রচুর সদিচ্ছা সত্ত্বেও যাঁরা এসবের চেষ্টা করেন, তাঁরাও কার্যত এক হৃদয়হীন প্রশাসন ব্যবস্থায় বন্দী থাকেন, যাদের দিয়ে ওই আদর্শগুলির বাস্তব রূপায়ন ঘটবে তারা সচরাচর আদর্শে উদ্বুদ্ধ নয়, তারা চাকরিই করে। বলাই বাহুল্য অশোকের আদর্শবাদও বাস্তবায়িত হয়নি, তবে অশোক যতদিন বেঁচে ছিলেন তা করার ত্রুটি করেন নি।

তাঁর দ্বাদশ পর্বতলিপিতে অশোক বলেছেন পারিবারিক জীবনই হবে তাঁর পরিকল্পিত নৈতিক সমাজের কেন্দ্রস্থল, এবং তারপর এই আদর্শের ব্যাপ্তি ঘটবে অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক সমূহের ক্ষেত্রে। কার্যকরী পন্থা হিসাবে প্রথমে প্রচলিত সকল ধর্মব্যবস্থার নৈতিক আদর্শগুলিকে অভিন্ন মনে করতে হবে, দ্বিতীয়ত ওই অভিন্নতা মেনে নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সমালোচনা বন্ধ করতে হবে, তৃতীয়ত বিভিন্ন মত ও পথের লোকদের আলোচনাচক্রে মঝে মাঝে বসতে হবে, এবং চতুর্থত তাহলেই সমাজ জীবন থেকে যাবতীয় গোঁড়ামি

ও অসহিষ্ণুতার অবসান ঘটবার সত্যকারের পথ পাওয়া যাবে। আর যে বিশেষ নৈতিক আদর্শটি সর্বস্তরে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবে তা হচ্ছে অহিংসা।

ত্রয়োদশ পর্বতলিপি থেকে জানা যায়, উপরি উক্ত আদর্শগুলিকে কার্যকর করার জন্য অশোক স্বদেশে ও বিদেশে বহু দূত পাঠিয়েছিলেন, সামরিক অভিযানের পরিবর্তে। তাঁর চতুর্থ পর্বতলিপিতে বলা হয়েছে যে ভেরী-ঘোষ, অর্থাৎ যুদ্ধবাদ্য, ধর্ম-ঘোষে, অর্থাৎ ধর্ম প্রচারে, প্রযুক্ত হয়েছিল। তাঁর আদর্শ যাতে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তবাসী ট্রাইবাল মানুষদের কাছে গিয়েও পৌঁছায় সে বিষয়েও অশোক নির্দেশ দিয়েছিলেন। ট্রাইব নির্মূল করার আদিম পদ্ধতি ত্যাগ করে, যাতে তারা স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্যের মধ্যে আসে, এ ব্যবস্থা তারও একটা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট ছিল সন্দেহ নেই। তাঁর সপ্তম পর্বত অনুশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি মাঝে মাঝে রাজকীয় বিহার যাত্রা বা আনন্দ-যাত্রার পরিবর্তে ধর্ম-যাত্রায় বার হতেন, এবং সেই সুযোগে দেশের অবস্থাও ব্যক্তিগত-ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ধর্ম মহামাত্র নামে একটি পদেরও সৃষ্টি করেছিলেন। সর্বোপরি জনকল্যাণমূলক কাজকে তিনি রাজকার্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 'সকল প্রজাই আমার সন্তান', অশোকের এই মূল্যবান ঘোষণাটি প্রমাণ করে যে তাঁর আদর্শের পিছনে আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

১৫ ॥ অশোকের শাসন ব্যবস্থা : চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে পার্থক্য

অশোক তাঁর আদর্শগুলি রূপায়ণের জন্য বহু নূতন পদের সৃষ্টি করেছিলেন। অশোকের লিপিসমূহ থেকে যা পাওয়া যায়, রাজাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার কেন্দ্র। তাঁকে সাহায্য করতেন একজন উপরাজা, যিনি সচরাচর রাজার ভাই হতেন, একজন যুবরাজ, রাজার পুত্র এবং একজন প্রধানমন্ত্রী (অগ্রামাত্য) রাজকুমারেরা বিভিন্ন অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত হতেন। অশোকের লিপিতে এই রকম চারটি অঞ্চলের নাম পাওয়া গেছে—তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোসলি ও সুবর্ণগিরি। প্রদেশের শাসনকর্তাদের বলা হত প্রাদেশিক।

এরপর অশোকের লিপিসমূহ তিনি রকম পদাধিকারীর নাম উল্লেখ করছে, (১) রাজুক, যারা সম্ভবত জেলাসমূহের শাসনকর্তা ছিল, (২) যুত, যারা সম্ভবত রাজস্ব আধিকারিক ছিল, এবং (৩) মহামাত্র, যারা বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিল। তাঁর সিংহাসনারোহণের চতুর্দশতম বছরে অশোক ধর্মমহামাত্র নামক একটি বিশেষ পদের সৃষ্টি করেন, যাদের কাজ ছিল অশোকের আদর্শ প্রচার ও

তার রূপদান। স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্র নামক একটি পদের সৃষ্টি অশোক করেছিলেন যাদের কাজ ছিল নারী সমাজের স্বার্থ দেখা। অন্ত-মহামাত্ররা সীমান্ত অঞ্চল-গুলির ভারপ্রাপ্ত ছিল। নগর পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নগর ব্যবহারিকের উপর। অপরাপর পদাধিকারীদের মধ্যে ছিল প্রতিবেদক (গুপ্তচর বা দূত) এবং বজ্রভূমিক (জনস্বার্থ মূলক কাজকর্ম যাদের উপর ন্যস্ত ছিল)।

অশোকের শাসন ব্যবস্থা পুরোদস্তুর আমলাতান্ত্রিক ছিল, এবং অনুমান করা যায় যে এই আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আদর্শ ই পরবর্তীকালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময় আমলাতান্ত্রিকতার লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হলেও, কাগজে কলমে তার উপর একটা গণতন্ত্রের আবরণ ছিল। চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে খবরের উৎস একমাত্র মেগাস্থেনেস, যিনি লিখেছেন যে কার্যত রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর হলেও, বিভিন্ন পদাধিকারী নিয়োগের ব্যাপারে তিনি দুটি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বোর্ডের সুপারিশগুলি মেনে চলতেন। এই বোর্ডদ্বয়ের অনুমোদনে নিযুক্ত অফিসারদের উপাধি ছিল *Agronomoi*, যারা সরকারী বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিল। পৌর প্রশাসনের ক্ষেত্রে সমষ্টিগতশাসনের উল্লেখ মেগাস্থেনেস করেছেন। এদের বলা হত *Astynomoi*। এরা ছয়টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজ করত, প্রতি গ্রুপে পাঁচজন করে লোক থাকত। প্রথম গ্রুপটি শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে দেখাশোনা করত; দ্বিতীয়টি বিদেশীয়দের বিষয়ে; তৃতীয়টি জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখত; চতুর্থ টি ব্যবসা বাণিজ্য; পঞ্চমটি উৎপাদিত পণ্য; এবং ষষ্ঠ গ্রুপটির দায়িত্ব ছিল মূল্য নির্ধারণ, কর ইত্যাদি বিষয়। জনকল্যাণমূলক কাজ সমূহও অনুরূপভাবে গঠিত একটি বোর্ডের নির্দেশে চলত। সামরিক ক্ষেত্রেও ওই প্রথা বজায় ছিল। এখানেও ছিল ছয়টি বোর্ড, প্রতিটিতে পাঁচজন করে সদস্য যারা যথাক্রমে পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ, হস্তী, যোগাযোগ, ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল।

যেহেতু চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে একটি কৌটিল্য-কাহিনী পাওয়া যায়, অর্থশাস্ত্র রচয়িতা কৌটিল্যকে তাঁর যুগে ফেলার জন্য, অনেকেই মেগাস্থেনেসের বিবরণের সঙ্গে কৌটিল্য বর্ণিত ব্যবস্থার সাদৃশ্য খোঁজার বৃথা চেষ্টা করেছেন। উভয়ের কোন মিলই নেই। চন্দ্রগুপ্ত স্বৈরাচারী রাজা ছিলেন, এবং তাঁর অধীনে বিভিন্ন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত বহু পদাধিকারী থাকা সত্বেও, তাদের পরিচালনার জন্য বিভিন্ন যৌথ সংস্থা বর্তমান ছিল, মেগাস্থেনেসের এই বক্তব্যই কৌটিল্যের আদর্শের একেবারে পরিপন্থী। ওই যৌথ সংস্থাগুলি বা বোর্ডগুলি অশোকের সময় উঠে

যায়, এবং আমলাতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবেই রাজার নিয়ন্ত্রণে আসে, আর দ্বিতীয় ব্যবস্থাটাকেই কৌটিল্য আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৬॥ অশোক ও বৌদ্ধধর্ম

অশোকের পর্বত ও স্তম্ভ অনুশাসনগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অশোক বৌদ্ধ ধর্মের উপর কতকগুলি নিজস্ব ধারণা আরোপ করে তাকে সার্বজনীন করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজেকে 'দেবগণের প্রিয়' বলে ঘোষণা করেছেন, এবং সৎজীবন যাপনের পুরস্কার স্বরূপ জনসাধারণের স্বর্গে যাবার কথাই তুলে ধরেছেন, যা নির্বাণ, মোক্ষ ইত্যাদি বাছাই করা বৌদ্ধ শব্দের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। এখানে একটা কথা সুস্পষ্টভাবে বলা দরকার। বৌদ্ধধর্ম কোনদিনই জনগণের ধর্ম ছিলনা, এবং বুদ্ধ নিজেও তাঁর ধর্মকে একান্ত জনমুখীন করার চেষ্টা করেননি। এ-ধর্ম গৃহীদের জন্য নয়, গৃহত্যাগীদের জন্য। বুদ্ধ সুস্পষ্ট-ভাবেই বলেছিলেন যে, যদি কেউ নির্বাণ লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে সাংসারিক বন্ধন ত্যাগ করে পুরোদস্তুর সংঘের শরণ নিতে হবে।

কিন্তু অশোক বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শগুলিকে, বিশেষ করে নৈতিক আদর্শ-গুলিকে, যেগুলি অপরাপর ধর্মের নৈতিক আদর্শগুলির চেয়ে বিশেষ পৃথক নয়, জনজীবনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, কার্যত বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেই একটি বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন এবং একটু সতর্কতার সঙ্গে একথা বললে অত্যুক্তি হয়না যে পরবর্তীকালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের, যা সর্বজীবের মুক্তি অভিলাষী, মূল প্রেরণা ছিলেন অশোক।

বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি, কলিঙ্গ যুদ্ধের কথা না তুলেই, অশোককে নিজেদের বলে দাবি করেছে। কলিঙ্গ যুদ্ধের সঙ্গে অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেকথা বলা শক্ত। অশোক সত্যই বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। একদল পণ্ডিতের মতে তিনি সত্যই ভিক্ষু হয়েছিলেন। ই-সিং বলেছেন যে তিনি ভিক্ষুর পোষাক পরা অশোকের মূর্তি দেখেছেন। অপর একদল পণ্ডিত বলেন যে অশোক আনুষ্ঠানিকভাবে ভিক্ষু হননি, যদিও বৌদ্ধসংঘে তাঁর রীতিমত যাতায়াত ছিল। দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর বাস্তব, কেননা সংঘে যোগদানকারী ভিক্ষুর পক্ষে রাজকার্যের মত জাগতিক বিষয়ে লিপ্ত হওয়া বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ বিরোধী। দ্বিতীয়ত, অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং কোন একটি গোষ্ঠীর

পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর মত সম্রাটের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজা হিসাবে বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জৈন, আজীবিক প্রভৃতি অপরাপর ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা অশোককে করতে হয়েছিল এবং একথাও তিনি তাঁর সপ্তম পর্বতলিপিতে উল্লেখ করেছেন।

সিংহলী গ্রন্থ মহাবংস অনুযায়ী অশোকের সময় পাটলিপুত্রে মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যের সভাপতিত্বে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল প্রধানত থেরবাদী বা স্থবিরবাদী বৌদ্ধদের সম্মেলন, যেখানে বিভিন্ন দেশে প্রচারক পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এবং তা অনুযায়ী মধ্যান্তিক প্রেরিত হয়েছিলেন কাশ্মীর ও গন্ধারে, মহারক্ষিত প্রেরিত হয়েছিলেন যবনদেশে, মধ্যম প্রেরিত হয়েছিলেন হিমালয় অঞ্চলে, ধর্মরক্ষিত অপরান্ত দেশে, মহাদেব মহিষমণ্ডলে (মহীশূর অঞ্চলে) রক্ষিত বনবাসীতে (উত্তর কানাড়া অঞ্চল), শোন ও উত্তর সুবর্ণভূমিতে (ব্রহ্মদেশ) এবং মহেন্দ্র (অশোকের পুত্র, মতান্তরে ভ্রাতা) ইত্যাদি সিংহলে।

উক্ত সম্মেলনের সঙ্গে অশোকের কি সম্পর্ক ছিল তা জানা যায় না। তবে অশোক নিজেও তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে দূত পাঠিয়েছিলেন— সিরিয়ার রাজা অ্যান্টিওকস (দ্বিতীয়) থিওসের কাছে, ম্যাসিডনের রাজা অ্যান্টিগোনাস গোনাটাসের কাছে, করিন্থের রাজা আলেকজাণ্ডারের কাছে, সাইরেনের রাজা মগসের কাছে, মিশরের রাজা টলেমি ফিলাডেলফসের কাছে। এ ছাড়া তিনি তাঁর এলাকার বাইরের দেশগুলি যেমন চোড়, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র ও সাতিয়পুত্রদের দেশে, তাঁর রাজ্যের প্রত্যন্তবাসী ট্রাইবদের মধ্যে এবং নানা স্থানে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। বিদেশে অশোকের প্রচারাভিযানের ফল কি হয়েছিল বলা শক্ত, তবে আলেকজাণ্ড্রিয়াতে বৌদ্ধধর্ম যে প্রবেশ করেছিল তার প্রমাণ আছে।

১৭॥ অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

আমরা আগে দেখেছি যে উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান আফগানিস্তানের পূর্বাংশ- এবং বালুচিস্তান-পারস্যের সীমানা পর্যন্ত স্থান, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, পূর্বে বঙ্গ-বিহার এবং দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত এলাকা চন্দ্রগুপ্তের দখলে ছিল। পূর্ব-দক্ষিণে কলিঙ্গদের দেশটি অশোক জয় করেছিলেন। এ-থেকে অনুমান করা যায় যে সুদূর দক্ষিণের কিছুটা অঞ্চল বাদ দিয়ে, এবং সম্ভবত পূর্ববঙ্গ ও আসাম বাদ দিয়ে বাকি ভারতের সবটুকুই অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। অশোকের লিপিতেও এর

সমর্থন রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বত অনুশাসনে তিনি জানিয়েছেন যে সুদূর দক্ষিণে চোড় (চোল, যারা আদিতে বাস করত আর্কট থেকে ত্রিচিনোপলি পর্যন্ত এলাকা জুড়ে), পাণ্ড্য (যারা বাস করত বর্তমান রামনাদ, মাদুরা ও টিনেভেলি জেলাগুলিতে), কেরলপুত্র (চের, যারা বাস করত দক্ষিণ কানাড়া, কুর্গ ও মালাবার অঞ্চলে) এবং সাতিয় পুত্র (যাদের আদি নিবাস অজ্ঞাত এবং পরেও কোন খবর পাওয়া যায় না) অধ্যুসিত এলাকাগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। বাকি ভারতের সবটাই যে তাঁর দখলে ছিল তার প্রমাণ তাঁর পর্বত ও স্তম্ভ অনুশাসনগুলি।

দক্ষিণে তাঁর ছোট পার্বত্য অনুশাসনগুলির ভৌগোলিক বিন্যাস নিম্নরূপ : মহীশূরের চিতলদ্রুগ জেলা, রায়চুর জেলায় মাস্কি, মহীশূরের কোপবল তালুকে গবিমঠ এবং পল্কিগুণ্ডু, অন্ধ্র প্রদেশের কুর্ণূলে রজুল-মন্দগিরি এবং ইয়েরাগুদি। আরও উপরে মধ্যপ্রদেশের দতিয়া জেলায় গুজরা, জব্বলপুর জেলার রূপনাথ, উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলার অরাউর, দিল্লীর নিকটে অমরপুনি, রাজস্থানের বৈরাট, বিহারের সাসারাম প্রভৃতি স্থানে। তাঁর স্তম্ভ অনুশাসনগুলির অনেকগুলি বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনীর পথে পড়ে, লৌরিয়া অররাজ, রামপুরওয়া, নন্দনগড় নিগলিভা প্রভৃতি স্থানে। বাকিগুলি আছে মূলত আম্বালা ও মীরাট জেলাদ্বয়ে, এলাহাবাদের নিকটবর্তী কৌশাম্বীতে, সারনাথে ও সাঁচীতে। তাঁর প্রধান পর্বত অনুশাসনগুলি হাজারা জেলার মানসেরায়, যমুনা ও টোনসের মিলনস্থল কালসি নামক স্থানে, কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত গির্ণারে, মহারাষ্ট্রের থানা জেলার সোপারায়, পুরী জেলার ধৌলিতে, উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার জৌগড়ে, এবং অন্ধ্র প্রদেশের কুর্ণুল জেলার ইয়েরাগুদি নামক স্থানে। আরামায়িক হরফে লেখা তাঁর একটি অনুশাসন পাওয়া গেছে তক্ষশিলায় এবং অপর একটি জালালাবাদে। তাঁর একটি দ্বিভাষিক অনুশাসন, গ্রীক ও আরামায়িক হরফে লিখিত, পাওয়া গেছে আফগানিস্তানের কান্দাহার শহরে। এই অনুশাসনগুলির ভৌগোলিক বিন্যাস নিঃসন্দেহে অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সীমারেখা নিরূপণে সাহায্য করে।

১৮॥ অশোকের উত্তরাধিকারিগণ

অশোকের লেখমালা সমূহে তাঁর একজন পুত্র তীবর উল্লিখিত হয়েছেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য ও পুরাণসমূহ থেকে তাঁর আরও তিনজন পুত্রের নাম পাওয়া যায়—মহেন্দ্র, কুণাল এবং জলৌক। অশোক-পরবর্তী রাজা ছিলেন

সম্ভবত কুণাল, যা বলা হয়েছে কোন কোন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে এবং বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণদ্বয়ে। তাঁর পরবর্তী রাজা ছিলেন অশোকের পৌত্র দশরথ, মৎস্য-পুরাণের মতে। এই দশরথের তিনটি লেখমালা পাওয়া গেছে বরাবর বা নাগার্জুনি পাহাড়ের কয়েকটি গুহায়, যেগুলি ঐ সম্রাট আজীবিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জন্য দান করেছিলেন। দশরথ নিজেকে তাঁর লিপিতে অশোকের মতই দেবানাম্ প্রিয় বলে ঘোষণা করেছেন। মৎস্যপুরাণ ও জৈন গ্রন্থ সমূহের মতে দশরথের পুত্র ছিলেন সম্প্রতি, যিনি জৈন ধর্ম প্রচারের জন্য অশোকের মতই প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। পুরাণ সমূহের মতে শেষ মৌর্য সম্রাট ছিলেন বৃহদ্রথ যাঁকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের উত্তরাধিকারীরা মোট রাজত্ব করেছিলেন ৫০ বছর, ২৩৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ১৮৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত।

১৯ ॥ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ও অশোকের দায়িত্ব

প্রাচীন যুগের সাম্রাজ্যের ধারণার সঙ্গে আধুনিক যুগের ধারণার পার্থক্য আছে। অতি আধুনিক যুগের সাম্রাজ্য বলতে ভৌগোলিক অর্থে কোন ভূখণ্ড না বোঝাতেও পারে, তা মূলত কোন একটি রাষ্ট্রশক্তির অর্থনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রও হতে পারে। কিছুকাল আগে সাম্রাজ্য বলতে বোঝাত ঔপনিবেশিক শাসন (যা এখনো পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বিলুপ্ত হয়নি), ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে শিল্পের জন্য দরকারী কাঁচামাল ও বাজারের প্রয়োজনে যার সৃষ্টি, আর এই সাম্রাজ্য গঠনের মূলে জাতীয়তাবাদের ধারণা একটা বড় উপাদান স্বরূপ কাজ করেছে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। গত দুশো বছর ধরে আমরা এই সাম্রাজ্যবাদকে প্রত্যক্ষ করছি।

কিন্তু তার আগের যুগটা, যা আমাদের জানা ইতিহাসে বৃহত্তম, মূলত কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই অর্থনীতিরও মূল কথা, আধুনিক যুগের মতই, সামাজিক উৎপাদনের উদ্বৃত্ত কিছু ব্যক্তির হাতে থাকা। যেহেতু কৃষিই ছিল উৎপাদনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি, উৎপাদনের উদ্বৃত্তের ফলভোগী হত জমিদার, যাদের হাতে ওই সামাজিক উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হত। নানা মাপের এলাকা নিয়ে ছিল এদের শাসন, যাদের কিছু বড় এলাকা তারা নিজেদের রাজা বলেও চিহ্নিত করত। এরা যে উদ্বৃত্ত ভোগ করত তার ভাগ পেতেন সার্বভৌম

রাজা বা সম্রাট, এবং ওই পদ লাভ করতে হলে, কোন ব্যক্তির পক্ষে যেভাবেই হোক এমন বিক্রম প্রকাশ করা দরকার ছিল, যাতে স্বেচ্ছায় হোক, ভয়ে হোক, অনুরাগে হোক, আর মার খেয়ে হোক, ওই সকল ছোট রাজা ও জমিদারেরা তাঁকে উপরওয়ালা বলে মানতে বাধ্য হত। এই প্রথাকেই বলে ফিউডাল সিস্টেম বা সামন্ত প্রথা। অবশ্য দেশভেদে বা কালভেদে এর পদ্ধতি সব জায়গায় এক ছিল না।

এভাবে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে প্রাচীন যুগের বৃহৎ সম্রাটরা প্রচুর সামাজিক উদ্বৃত্তের অধিকারী হতেন, এবং সেই বিপুল উদ্বৃত্ত ব্যয় করতেন নানা ভাবে। কেউ কেউ তা দিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে নিজ প্রভাবের এলাকা বাড়িয়েছেন, এবং সেই সব এলাকার সামাজিক উদ্বৃত্ত নিজ ভাণ্ডারে মজুদ করেছেন, এবং এই ভাবেই তাঁদের সাম্রাজ্য বেড়ে উঠেছে। বোধ করি এঁরাই জাগতিক অর্থে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন। কেউ কেউ তা ব্যয় করেছেন স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে, নামী ও দামী সৌধ নির্মাণ করেছেন অজস্র অর্থব্যয়ে। কেউ কেউ পারলৌকিক প্রেরণায় দান ধ্যান করেছেন। অশোকের মত কেউ কেউ কোন ব্যক্তিগত আদর্শ প্রচারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। কেউ কেউ আবার বিলাস ও লাম্পট্যের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সম্রাট যে উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারী হতেন তা দিয়ে তিনি ওই উদ্বৃত্ত আহরণের ক্ষেত্র আরও বাড়াবেন কিনা, অর্থাৎ তাঁর রাজ্যের সীমা আরও বাড়বে কিনা, সেটা নির্ভর করত সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিবেচনার উপর। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটাই ছিল একেবারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কোন শক্তিমান রাজা রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে যে সম্পদের অধিকারী হতেন, তাঁর বংশধরদের সে সম্পদ নানাভাবে উড়িয়ে দেবার পথে কোন বাধা ছিলনা। রাজা দুর্বল এবং তাঁর নিজের স্বার্থের ব্যাপারে অমনোযোগী হলেই, তাঁর যারা সম্পদের উৎস, সেই সামন্তরা বা জমিদাররা হয় স্বাধীনতা ঘোষণা করত, নাহয় অন্য কোন উচ্চাকাংখী রাজার কাছে আনুগত্য বদল করত। এই ভাবেই এক রাজবংশের বদলে আর এক রাজবংশ আসত,রাজত্বের এলাকারও হ্রাসবৃদ্ধি-পরিবর্তন ঘটত।

ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনাই ঘটেছে বারবার, এমনকি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনেরও মূল কারণ এই, কেননা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্বৃত্ত আহরণের সনাতন পদ্ধতির অতিসামান্য পরিবর্তনই সুদীর্ঘকালের ভারত-ইতিহাসে ঘটেছে। অবশ্য আরও কিছু পারিপার্শ্বিক কারণ থাকে, যেমন বাইরের থেকে

আক্রমণ। শক্তিমান রাজা তাঁর চেয়ে প্রবলতর শক্তির কাছে পরাজিত হতে পারেন, এবং বিভিন্ন শক্তিমান রাজবংশের অবক্ষয়ের যুগে বারবার ভারত-ইতিহাসে এই রকম বাইরে থেকে আক্রমণও ঘটেছে। একটি অপরটি নিরপেক্ষ নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই শত্রুর দুর্বল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে।

উপরি-উক্ত দুটি কারণই মৌর্য বংশের পতনের জন্য দায়ী। কার্যত অশোকের পরে আর কোন শক্তিমান সম্রাট ওই বংশে আবির্ভূত হননি। এবং সেই কারণেই অশোক-পরবর্তী মৌর্য রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে অধীনস্থ প্রদেশগুলি বিদ্রোহ করেছিল, এবং অনেকেই স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। এই দুর্বলতার সুযোগেই ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীকরা ভারতের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালিয়েছিল, মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের যা একটা প্রত্যক্ষ কারণ। একদা একটি মতবাদ জনপ্রিয় ছিল যে মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মূলে ছিল একটি ব্রাহ্মণ বিদ্রোহ, অশোকের বৌদ্ধ ঘেঁষা রাষ্ট্রনীতি ও ব্রাহ্মণ্যবিরোধিতার যা ছিল প্রতিক্রিয়া। এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। যেহেতু পুষ্যমিত্র শুঙ্গ, যিনি শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে শুঙ্গ বংশ স্থাপন করেছিলেন, একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, ওই তথ্যের ভিত্তিতেই এই রকম একটা মতবাদ গঠন করা হয়েছিল। অশোক যে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের উপর উৎপীড়ন চালিয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই, বরং তাঁর অনুশাসনাবলী প্রমাণ করে যে তিনি সকল ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দ্বিতীয়ত মৌর্যরা যদি ব্রাহ্মণ বিদ্বেষীই হতেন তাহলে ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রকে তাঁরা নিশ্চয়ই প্রধান সেনাপতি করতেন না। তৃতীয়ত, আমরা যতদূর জানি বিভিন্ন মৌর্য সম্রাটের বিভিন্ন ধর্মের প্রতি ঝোঁক ছিল, যেমন চন্দ্রগুপ্ত জৈন ছিলেন, অশোক বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁর নাতি দশরথ আজীবিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁর ছেলে সম্প্রতি জৈন ছিলেন। কাজেই এ মতবাদের কোন ভিত্তি নেই।

আরও একটি মতবাদ মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা করতে উল্লিখিত হয়। এই মতবাদে বলা হয়েছে যে অশোকের অহিংসানীতিই নাকি মৌর্যদের সামরিক ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল। এ মতবাদটিও ভ্রান্ত। অশোক সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেননি, এমনকি শাসনকার্যের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ প্রত্যাহার করেননি। তাঁর চতুর্থ স্তম্ভ-অনুশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের তিন দিন অধিকতর বাঁচবার সুযোগ দিতেন, প্রাণদণ্ড-প্রথাকেও

তিনি রহিত করেন নি। কাজেই অহিংসার নামে তিনি যে বলপ্রয়োগ ও হত্যার ব্যবস্থাকে লোপ করেছিলেন একথা সত্য নয়। এটা অশোকের অহিংসা-নীতিকে ভুল বোঝার ফল। অশোক একটা সদাচার ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তিনি কল্পনার স্বর্গে বাস করতেন। তাঁর অজস্র অনুশাসনের মধ্যে কোনটিই এমন সাক্ষ্য দেয় না তিনি একজন impractical ruler ছিলেন, তাহলে তিনি একজন মোহম্মদ তুঘলক বা দ্বিতীয় জোসেফে পরিণত হতেন, সফল সম্রাটরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। তিনি খুব সফল সম্রাট ছিলেন বলেই বৌদ্ধ লেখকেরা তাঁর চরিত্রকেই বেছে নিয়েছিলেন প্রচার মূলক সাহিত্যের জন্য। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক, যেমন কল্‌হণ, হিউয়েন সাঙ প্রভৃতি, অনেক কীর্তির সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করেছিলেন। সফল সম্রাট ছিলেন বলেই ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে, যেখানে একস্থান থেকে অপর স্থানে যাওয়া অতীব কষ্টসাধ্য, তাঁর পছন্দসই প্রতিটি জায়গায় পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশূর অন্ধ্র প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার সর্বত্র তাঁর অনুশাসনগুলি খোদিত করা সম্ভব হয়েছিল, অত্যন্ত কর্মঠ প্রশাসন ব্যবস্থা ভিন্ন সে যুগে যা সম্ভব ছিল না। কাজেই অশোকের অহিংসানীতি মৌর্যরাজ-বংশের পতন এনেছে একথা কোনক্রমেই বলা চলে না।

তৃতীয় অধ্যায়

মৌর্যোত্তর যুগ

১॥ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রচ্ছদ

মৌর্য আমল থেকেই এদেশের জনজীবনে একটা গুণগত পরিবর্তনের ধারা চোখে পড়ে। নগর ও গ্রামের শ্রেণী বিভক্ত সমাজের পাশাপাশি ট্রাইবাল সমাজ যদিও ছিল—এই রকম প্রায় শতাধিক ট্রাইবাল সমাজের সংবাদ মৌর্য রাজসভার গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনেস রাখতেন—সেই সমাজগুলি তাদের স্বকীয়তা আর বজায় রাখতে পারছিল না, তারা বৃহত্তর রাষ্ট্র ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছিল, এবং বিশেষ বিশেষ পেশার ভিত্তিতে নানান মর্যাদার অর্থনৈতিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। মৌর্য আমল থেকে আরম্ভ করে গুপ্ত যুগের সূচনা পর্যন্ত এই দীর্ঘ পাঁচশো বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে অনেকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, যাতে চতুর্বর্ণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল, যদিও বাস্তবে ওই যুগে সে আদর্শের কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। মেগাস্থেনেস এখানে সাত রকম জাত দেখেছিলেন, চার রকম নয়, আর এই সাতটি জাত বলতে তাঁর চোখে যা পড়েছে তা হচ্ছে নিছক সাতটি পেশা—দার্শনিক, সরকারী কর্মচারী, গুপ্তচর ও সংবাদ বাহক, সৈনিক, কারিগর ও শ্রমিকশ্রেণী, শিকারী ও পশুপালক এবং কৃষিজীবী। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহও কোন চতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজের পরিচয় দেয় না সেখানেও আমরা দেখি বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে বিভক্ত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী। পালি গ্রন্থসমূহে 'হীনজাতির' কথা আছে যাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'হীন-শিল্পের' উপর নির্ভরশীল হিসাবে। বলাই বাহুল্য সমাজ কাঠামোর তলার দিকে পড়ে থাকা মানুষরাই ছিল উচ্চতর শ্রেণীগুলির উৎপীড়নের শিকার, তারাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে শূদ্র বলে ঘোষিত, বৌদ্ধ গ্রন্থে চণ্ডাল, বেন, নেসাদ, রথকার, পুক্কুস প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার নামে পরিচিত। মনু এদের জীবনযাত্রার মানও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জীর্ণ বসন। চণ্ডালকে দেখে শ্রেষ্ঠীকন্যার গোলাপজল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলার কাহিনী বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্তমান।

তবে লক্ষ্যণীয় যে গ্রীস দেশের মত ভারতে সমাজ দুটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়নি। আশ্বলায়ন সূত্রে বলা হয়েছে যে যবনদের দেশে (অর্থাৎ গ্রীক এলাকায়) দু শ্রেণীর লোক নিয়ে সমাজ গঠিত, আর্য এবং দাস। এখানে বরাবরই সুবিধা-ভোগী শ্রেণীরও নানান গ্রেড, সুবিধাহীন শ্রেণীরও নানান গ্রেড, আজও পর্যন্ত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শ্রেণী ছিল নিশ্চয়ই কৃষকেরা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে যুগে গড়ে উঠলেও, কৃষি জমির ক্ষেত্রে সেই অধিকার কিভাবে প্রযুক্ত হত সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা যায় না। সে যাই হোক, অর্থনীতি যেহেতু মূলত ছিল কৃষি নির্ভর, গ্রামগুলিই ছিল সেই অর্থনীতিকে কার্যকর করার একমাত্র ক্ষেত্র, যে কারণে কৌটিল্য অত্যন্ত জোরের সঙ্গে গ্রামনিবেশের কথা বলেছেন, এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে রাজাকে ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে ট্রাইবাল সমাজ ভেঙে, সেখান থেকে লোক আমদানী করে তাদের গ্রামে বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন। গ্রামেতে কৃষকেরা ছাড়া অপর যে সকল বৃত্তিজীবীর কথা কৌটিল্য বলেছেন তারা হচ্ছে কুট্টক বা ছুতোর মিস্ত্রী, কর্মার-অয়স্কার বা কামার, কুম্ভকার, নাপিত, রজক, মোদক বা মাটি খননকারী, রজ্জুবর্তক বা দড়ি-প্রস্তুতকারী, অনীকস্থ (হস্তিপালক), অশ্বদমক (অশ্বপালক) প্রভৃতি। রাষ্ট্র গ্রাম থেকে সম্পদ সংগ্রহ করত চার ভাবে (১) উৎপন্ন ফসলের উপর কর (২) বাধ্যতামূলক শ্রম (৩) রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ ফসল সংগ্রহ এবং (৪) মাঝে মাঝে রাষ্ট্রকে অবশ্য-দেয় কিছু কর। কৌটিল্য ছয় রকম করের কথা বলেছেন : (১) ভাগ অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের উপর রাষ্ট্রের ভাগ, (২) বলি, ওই ভাগের উপর বিশেষ ভাবে প্রদত্ত কর, (৩) কর, যা ওইগুলি ছাড়া নির্দিষ্ট সময় অন্তে রাজাকে প্রদেয় ছিল, (৪) বিবীত, চারণ ক্ষেতের উপর কর, (৫) রজ্জু, জরিপ ও বসতির জন্য দেয় খাজনা এবং (৬) চোররজ্জু বা চৌকিদারী কর।

মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ যুগে অর্থের প্রচলন হয়েছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে মুদ্রাকে কহাপন (কার্যাপন, কাহন) বলা হয়েছে, সুবর্ণমুদ্রাকে বলা হয়েছে নিকৃথ এবং সুবন্ন। ব্রোঞ্জ ও তাম্রমুদ্রাকে বলা হয়েছে কাংস, পাদ, মাসক এবং কাকণিকা। অবশ্য এগুলির আপেক্ষিক মূল্য সব সময় এক ছিল না। মনু বলেছেন যে সুবর্ণ বা আদর্শ স্বর্ণমুদ্রায় ওজন হবে ৮০ রতি, অবশ্য এই ওজনের কোন মুদ্রা এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আমরা ৩২ রতির রৌপ্যমুদ্রা, যা পুরাণ বা ধরণ নামে পরিচিত, এবং ৮০ রতি ওজনের তামার কার্যাপন পেয়েছি। বাইরের মুদ্রাও ভারতের মুদ্রাব্যবস্থাকে

প্রভাবিত করেছিল যা থেকে এখানেও মুদ্রার নাম দীনার (দেনারিয়াস) ও দ্রম্ম (দ্রাখ্‌মা) হয়েছে। ব্যবসার প্রয়োজনে অর্থ ঋণ হিসাবে দেবারও প্রতিষ্ঠান মৌর্য ও মৌর্যোত্তর ভারতে গড়ে উঠেছিল। ঋণের নাম ছিল বৃদ্ধি। বণিক ও কারিগর শ্রেণী অনেক ক্ষেত্রেই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করত। এই সংঘের নাম ছিল 'শ্রেণী'। বড় বড় ব্যবসায়ীরা শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত হতেন। যাকে আধুনিক কালে বলা হয় Chamber of Commerce তারই একটি আদিম রূপ এ যুগেও দেখা যায়। যেমন অনাথপিণ্ডিক ছিলেন একজন মহাশ্রেষ্ঠী, এবং তার অধীনে বহু অনুশ্রেষ্ঠী ছিলেন।

বণিকরা তাদের মালপত্র নিয়ে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যাত্রা করত, তাদের নেতাকে বলা হত সার্থবহ। কয়েকটি বড় বড় বাণিজ্য পথেরও উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকে পাওয়া গেছে। একটি এই রকম পথ গিয়েছিল শ্রাবস্তী থেকে রাজগৃহ পর্যন্ত, আর একটি গিয়েছিল শ্রাবস্তী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে পৈঠান বা প্রতিষ্ঠাননগর পর্যন্ত। তৃতীয় একটি পথ গিয়েছিল শ্রাবস্তী থেকে সিন্ধু পর্যন্ত। আরও একটি বড় রাস্তা, যার উপরে পরে বর্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড হয়েছিল, গিয়েছিল রাজগৃহ থেকে বারাণসী, সাকেত, শ্রাবস্তী হয়ে তক্ষশিলা পর্যন্ত। মেগাস্থেনেস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত ১,১৫৬ মাইল দীর্ঘ রাজপথের উল্লেখ করেছেন। এই পথগুলির মারফত অন্তর্বাণিজ্য ছাড়াও বাইরের দেশগুলির সঙ্গেও জলপথে বাণিজ্য চলত। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জনৈক গ্রীক নাবিক রচিত *Periplus of the Erythraean Sea* নামক একটি ডায়েরিগ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন বন্দর, সেগুলিতে আমদানীকৃত এবং সেগুলি থেকে রপ্তানীকৃত পণ্যসমূহের তালিকা পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পর থেকে রোমের সঙ্গে ভারতের বেশ ফলাও বাণিজ্য চলেছিল, যার উল্লেখ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করব।

মৌর্য যুগ ও মৌর্যোত্তর যুগ গুণগত ভাবে পৃথক ছিলনা, এক রাজবংশের বদলে আর এক রাজবংশের আমদানী হয়েছিল, মৌর্যদের বিরাট এলাকা ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দুই আমলের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি যা সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ। দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলি মোটামুটি ছিল রাজা ও সামন্তদের মধ্যে, রাজা ও সামন্তরাজাদের সঙ্গে বণিকশ্রেণীর মধ্যে, এবং সার্বিকভাবে সমাজের উপরতলা ও নীচের তলার মধ্যে, যদিও শেষোক্ত ক্ষেত্রে ওই দ্বন্দ্ব বিশেষ তীব্রতা অর্জন করতে

পারেনি, যার কারণ এখানে, আজও পর্যন্ত, সমাজের নীচের তলা বহুধা-বিভক্ত, যারা ছোট জাত বলে পরিচিত তাদের মধ্যেও মর্যাদার ভেদ আছে এবং এই ভেদবোধ অনেক ক্ষেত্রে এমন তীব্র যে এক ছোট-জাত তার চেয়ে ছোট-জাতের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলে। এদেশে রাজা ও সামন্তদের দ্বন্দ্ব কোন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগোয়নি, কখনও তা রাজার পক্ষে গেছে, কখনও তা সামন্তদের পক্ষে এসেছে, ইংলণ্ডের মত ম্যাগনা কার্টা বা সাইমন ডি মন্টফোর্টের নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্ট সামন্তদের তরফ থেকে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার সুযোগ পায়নি। পক্ষান্তরে রাজা ও সামন্তদের সঙ্গে বণিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বে, শেষোক্তরা কোনদিনই বিজয়লাভ করতে পারেনি, বণিক শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা এই সেদিন পর্যন্ত ছিল নগণ্য, এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তারা কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব, সেই মৌর্য যুগ থেকে নবাবী যুগ পর্যন্ত কোন দিনই, বিস্তার করতে পারে নি। এর একটা কারণ বাইরে থেকে বারবার বৈদেশিক আক্রমণ, যা কোনদিনই ভিতরের দ্বন্দ্বকে খুব তীব্র ও ফলদায়ক হতে দেয়নি, ফলে এখানকার সমাজব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তনের চিহ্ন খুব কমই দেখা গেছে।

২ ॥ রাজতন্ত্র

মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে ভারতের ইতিহাসে প্রায় বরাবরই রাজতন্ত্রই বজায় থেকেছে, কখনও বৃহৎ এলাকা জুড়ে এক রাজার শাসন, কখনও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় বিভিন্ন রাজার শাসন। রাজতন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ সমূহ খোলাখুলি ভাবেই Theory of Divine Origin-এর অবতারণা করেছে, যার মূল কথা রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। গীতায় ঈশ্বরের মুখ দিয়েই বলানো হয়েছে যে মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই রাজা, এবং রাজাকে অস্বীকার করার অর্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ।

রাজার কর্তব্য বলা হয়েছে ধর্মসংরক্ষণ অর্থাৎ বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে রাজার চূড়ান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, এবং রাজা এই অধিকার প্রয়োগ করবেন তাঁর নিজের নিযুক্ত এবং পরীক্ষিত একটি আমলা-তন্ত্রের দ্বারা। তিনি শাসন করবেন সাম, দান, দণ্ড ও ভেদনীতির দ্বারা। আন্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ধারিত হবে অবস্থানুযায়ী ছয়টি নীতির ভিত্তিতে : (১) সন্ধি, (২) বিগ্রহ (যুদ্ধ) (৩) আসন (নিরপেক্ষতা), (৪) যান (যুদ্ধ না করে যুদ্ধের

প্রস্তুতি চালানো), (৫) সংশ্রয় (অপরের আশ্রয় গ্রহণ) এবং (৬) দ্বৈধীভাব (একের সঙ্গে সন্ধি, অপরের সঙ্গে যুদ্ধ)।

রাজা শাসন করবেন মন্ত্রীদের সহায়তায়, যাদের তিনি নিজে নিযুক্ত করবেন। বিভিন্ন বিভাগের জন্য তিনি অধ্যক্ষ নিয়োগ করবেন। কৌটিল্য সন্নিধাতা ও সমাহর্তা নামক দুটি পদের উল্লেখ করেছেন, প্রথম পদধিকারীর কাজ রাজার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং দ্বিতীয়ের কাজ রাজার জন্য তা আহরণ করা। এছাড়া আরও কিছু পদের উল্লেখ কৌটিল্য করেছেন যেমন পুরোহিত, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তরবংশিক (অন্তঃপুররক্ষক), দুর্গপাল, অন্তপাল (প্রত্যন্ত প্রদেশ সমূহের শাসক) প্রভৃতি। যে রাজতন্ত্রের আদর্শ কৌটিল্য ও স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করেছেন তাকে এক কথায় absolute and unlimited monarchy বলা যায়। মৌর্য আমল থেকে বৃটিশ আমলের সূচনা পর্যন্ত এই একই ব্যবস্থা বারবার কার্যকর হবার প্রয়াস পেয়েছে।

৩ ॥ মগধের শুঙ্গ বংশ (১৮৭-৭৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

আমরা দেখেছি যে শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র, যিনি ছিলেন মৌর্যদের প্রধান সেনাপতি, শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুঙ্গ রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। পুষ্যমিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যাপ্ত নয়। বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদানে বলা হয়েছে যে পাটলিপুত্র, অযোধ্যা ও বিদিশা নগরত্রয় ছাড়াও তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবের জালন্ধর ও শাকল অঞ্চলদ্বয় বর্তমান ছিল।

পুষ্যমিত্রকে দুবার গ্রীক আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে জানা যায় যে সাকেত (অযোধ্যা) এবং মাধ্যমিক (চিতোরের নিকটবর্তী) নগরদ্বয় জনৈক যবন বা গ্রীক রাজার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল যা পুষ্যমিত্র প্রতিহত করেছিলেন। সম্ভবত এই আক্রমণ ঘটেছিল মৌর্য আমলের শেষের দিকে যখন পুষ্যমিত্র মৌর্যদের সেনাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় আক্রমণ ঘটেছিল তাঁর রাজত্বকালে। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র থেকে জানা যায় যে এই আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন পুষ্যমিত্রের নাতি বসুমিত্র সিন্ধু নদীর দক্ষিণ তীরে।

পুষ্যমিত্র দুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। স্পষ্টতই তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে তাঁকে বৌদ্ধদের বিনাশ কারী রূপে চিত্রিত

করা হয়েছিল। এটা বোধ হয় ঠিক নয়, কেননা ভারহুতের বৌদ্ধ স্তূপ শুঙ্গদের আমলেই নির্মিত হয়েছিল। অশোক নির্মিত সাঁচী স্তূপের চারিদিকের সুন্দর রেলিংগুলিও শুঙ্গ আমলে নির্মিত।

পুষ্যমিত্র ৩৬ বছর রাজত্ব করেন (আনুমানিক ১৮৭-১৫১ খৃষ্ট পূর্বাব্দ), এবং তারপর রাজা হন তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র যাঁকে কেন্দ্র করে কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র রচনা করেছিলেন। কালিদাসের রচনা থেকে জানা যায় যে অগ্নিমিত্র বিদিশায় তাঁর পিতার প্রতিনিধি হিসাবে শাসন করতেন। ওখান থেকেই জানা যায় যে বিদর্ভ বা বেরার অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল যার রাজা যজ্ঞসেন ছিলেন এক মৌর্য মন্ত্রীর নিকট আত্মীয়। অগ্নিমিত্রের বন্ধু জনৈক মাধবসেন ওই যজ্ঞসেনের সম্পর্কিত ভাই ছিলেন। মাধবসেন কোন ব্যাপারে বিদিশায় আসার পথে যজ্ঞসেন কর্তৃক বন্দী হন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিমিত্র বিদর্ভ আক্রমণ করে যজ্ঞসেনকে পরাস্ত করেন এবং উক্ত মাধবসেনকে মুক্ত করেন। এরপর বিদর্ভ রাজ্যটিকে দুই ভাগ করে তা যথাক্রমে যজ্ঞসেন ও মাধবসেনকে দেওয়া হয় এবং উভয়ই পুষ্যমিত্রের আনুগত্য স্বীকার করেন। এ ঘটনা পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালের। অগ্নিমিত্রের রাজত্বকালের কোন ঘটনা জানা যায় না।

অগ্নিমিত্রের পর সুজ্যেষ্ঠ রাজা হন, পুরাণসমূহে যাকে বলা হয়েছে বসুজ্যেষ্ঠ। চতুর্থ রাজা ছিলেন বসুমিত্র, যিনি অগ্নিমিত্রের পুত্র, এবং প্রথম যৌবনে যিনি তাঁর পিতামহ পুষ্যমিত্রের সেনাপতি হিসাবে গ্রীকদের পরাস্ত করেছিলেন। ইনিই সম্ভবত বাণভট্ট উল্লিখিত সুমিত্র যিনি একটি নাট্যশালায় মিত্রদেব নামক এক আততায়ীর হাতে নিহত হন।

একটি লেখামালা থেকে জানা যায় যে এলাহাবাদের নিকট পভোসা নামক স্থানে একটি গুহা খনন করেছিলেন জনৈক আষাঢ়সেন, যিনি বৃহস্বাতী মিত্র নামক কোন রাজার মাতুল, এবং ওই গুহা খনিত হয়েছিল উদাক নামক এক রাজার দশম বর্ষে। এই উদাককে কেউ কেউ পুরাণ সমূহ বর্ণিত পঞ্চম শুঙ্গ রাজা আর্দ্রকের বা ভদ্রকের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। আর একটি লিপি পাওয়া গেছে বেসনগর (ভীলসা) অঞ্চলে। এটি একটি স্তম্ভের উপর রচিত যা গরুড়ধ্বজ নামে পরিচিত এবং এটিকে স্থাপন করেছিলেন তক্ষশীলাবাসী হেলিওডোরস নামক জনৈক গ্রীক যিনি নিজে 'ভাগবত' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই হেলিওডোরস নিজেকে রাজা ভাগভদ্র কাশিপুত্রের নিকট গ্রীকরাজা অ্যান্টালকিডাস প্রেরিত দূত বলে বর্ণনা করেছেন ; এই ভাগভদ্র সম্ভবত পঞ্চম শুঙ্গ রাজা ভদ্রক। কেউ

কেউ অবশ্য ভাগভদ্রকে নবম শুঙ্গ রাজা পুরাণসমূহ বর্ণিত ভাগবত বলে মনে করেন। এটা ঠিক নয়, কেননা আর একটি গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ ওই একই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে যা ওই নবম রাজা ভাগবতের দ্বাদশ বর্ষে রচিত, সুতরাং ভাগভদ্র ও ভাগবত পৃথক ব্যক্তি।

দশম এবং শেষ শুঙ্গ রাজার নাম পুরাণ সমূহ অনুযায়ী দেবভূতি বা দেবভূমি, যাকে হত্যা করিয়েছিলেন তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব। এই বাসুদেবই পরবর্তী কাণ্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দেবভূতির হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়েছিল আনুমানিক ৭৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে।

৪ ॥ মগধের কাণ্ব বংশ (৭৫-৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ)

শুঙ্গদের পর কাণ্ব বংশের চার জন রাজা—বাসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ এবং সুশর্মা—মোট ৪৫ বছর মগধে রাজত্ব করেছিলেন। পুরাণ সমূহ এঁদের নাম উল্লেখ করলেও, এঁদের বিষয়ে আর কোন সংবাদ দেয়না। শুধু এটুকু জানা যায় যে কাণ্বরা অন্ধ্র ভৃত্য বা অন্ধ্রদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিলেন।

কাণ্বদের পর গুপ্তদের আবির্ভাব পর্যন্ত মগধের ইতিহাসের তিনশো বছরের খবর বিশেষ কিছু জানা যায় না। কয়েকটি জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে শুঙ্গ বংশের পুষ্যমিত্রের পর বলমিত্র এবং ভানুমিত্র মগধে রাজত্ব করেছিলেন। কয়েকটি লেখমালা থেকে ইন্দ্রাগ্নিমিত্র ও বৃহস্বাতীমিত্রের নাম পাওয়া গেছে। শেষোক্ত-জনের কথা আমারা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

কিছু তাম্র মুদ্রা পাওয়া গেছে রোহিল খণ্ড থেকে যেখানে অগ্নিমিত্র, ভদ্রঘোষ জেঠমিত্র এবং ভূমিমিত্রের নাম পাওয়া গেছে। এই অগ্নিমিত্র সম্ভবত শুঙ্গ বংশের দ্বিতীয় রাজার সঙ্গে অভিন্ন, ভদ্রঘোষ সম্ভবত পুরাণ বর্ণিত শুঙ্গ রাজা ভদ্রক, জেঠমিত্র সম্ভবত শুঙ্গ রাজা সুজ্যেষ্ঠ, এবং ভূমিমিত্র সম্ভবত দ্বিতীয় কাণ্ব বংশীয় রাজার সঙ্গে অভিন্ন। মিত্র উপাধি যুক্ত আরও কয়েকজন রাজার মুদ্রা পঞ্চাল অঞ্চলে এবং অন্যত্রও পাওয়া গেছে। ব্রহ্মমিত্র ও ইন্দ্রমিত্র নামক দুজন রাজার নাম পাওয়া গেছে বোধ গয়ায় দুটি স্তম্ভের উপর, তাঁদের মুদ্রাও পাওয়া গেছে মথুরা, পঞ্চাল ও বিহারের কোন কোন স্থানে। এই সব রাজাদের সঙ্গে শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের রাজাদের কোন সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। অনুমান করা যেতে পারে যে মূল শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের বিলুপ্তি ঘটলেও ওই দুই বংশের শাখা-প্রশাখাগুলি উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করেছিল আরও কিছুকাল।

৫ ॥ উত্তর-পশ্চিম ভারত : গ্রীক অধিকার (খৃষ্টপূর্ব ২০০—৩০ খৃষ্টাব্দ)

আলেকজাণ্ডার অধিকৃত পূর্বাঞ্চলের অধিপতি হন সেলুকস, যাঁর সঙ্গে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্কের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। তাঁর বংশের দ্বিতীয় অ্যান্টিয়োকস (২৬১-২৪৬ খৃঃ পূঃ) অশোকের সমকালীন ছিলেন, যাঁর রাজত্ব ছিল পার্থিয়া ও ব্যাক্‌ট্রিয়া প্রদেশদ্বয় নিয়ে। তখনকার পার্থিয়া ছিল কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল, খোরাসান পর্যন্ত, আর ব্যাক্‌ট্রিয়া বলতে বোঝাত প্রাচীন বাহ্‌লীক দেশ, হিন্দুকুশের ওপারের উত্তর আফগানিস্তান। এই দুটি প্রদেশের গ্রীক শাসনকর্তারা কার্যত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁরা নামে মাত্র সেলুকস-বংশীয়দের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করতেন। সেলুকস-বংশীয় তৃতীয় অ্যান্টিয়োকস (২২৩-১৮৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ) এই দুটি প্রদেশে তাঁদের হারানো প্রতিপত্তি কিছুটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ব্যাক্‌ট্রিয়ায় হাজির হন ২০৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে, এবং ব্যাক্‌ট্রিয়ার তৎকালীন কার্যত-স্বাধীন গ্রীক শাসনকর্তা ইউথাইডেমাসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শেষ পর্যন্ত গ্রীক ঐক্যের নাম করে উভয় তরফের একটি সন্ধি হয় (২০৬ খৃঃ পূঃ)। অ্যান্টিয়োকস ইউথাইডেমাসকে রাজকীয় উপাধিসমূহ গ্রহণ করতে অনুমতি দেন, এবং নিজের মেয়ের সঙ্গে ইউথাইডেমাসের পুত্র ডিমিট্রিয়াসের বিবাহ দেন। অতঃপর অ্যান্টিয়োকস হিন্দুকুশ অতিক্রম করে কাবুল নদী পার হয়ে সোফগসেনাস (সুভগসেন) নামক জনৈক ভারতীয় রাজার বশ্যতা আদায় করেন। কিন্তু মেসোপোটামিয়ায় গোলযোগের আভাস পেয়ে তিনি পত্রপাঠ ফিরে যান।

ইউথাইডেমাস অতঃপর ব্যাক্‌ট্রিয়ায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন এবং বহু ধরনের মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর পুত্র ডিমিট্রিয়াসই, এই দ্বিতীয় পর্যায়ে, সর্বপ্রথম ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর ভারত অভিযানের কিছু অস্পষ্ট বিবরণ স্ট্রাবো দিয়েছেন। ভারতীয় সাহিত্যেও ডিমিট্রিয়াসের অভিযানের কিছু অস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা গার্গীসংহিতার যুগপুরাণ অংশে বলা হয়েছে যে মৌর্যরাজ শালিশূকের সময়ে যবনেরা সাকেত, পঞ্চাল, মথুরা ও কুসুমধ্বজে (পাটলিপুত্র) আক্রমণ চালিয়েছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সাকেত এবং মাধ্যমিক অঞ্চলে যবন আক্রমণ হয়েছিল একথা বলা হয়েছে, যে আক্রমণ সম্ভবত পুষ্যমিত্র প্রতিহত করেছিলেন। এই সকল গ্রীক আক্রমণের সঙ্গে ডিমিট্রিয়াসের যোগাযোগ অবশ্যই অনুমানমূলক। কোন কোন

পণ্ডিত মহাভারতে উল্লিখিত দত্তমিত্রের সঙ্গে ডিমিট্রিয়াসকে অভিন্ন মনে করেন। বেসনগর থেকে প্রাপ্ত একটি সীলে 'তিমিত্র' নামটি পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন যে এই তিমিত্রই ডিমিট্রিয়াস। নিম্ন সিন্ধু উপত্যকায় দত্তামিত্রি নামক একটি দেশের কথা কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে অবশ্য ডিমিট্রিয়াসের উল্লেখ কোথাও নেই। তবে তিনি যে ভারতবর্ষের কিছু ভূখণ্ড দখল করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর চতুষ্কোণ মুদ্রাগুলি যার এক পিঠে গ্রীক ও অপর পিঠে খরোষ্ঠী লিপি বর্তমান।

ডিমিট্রিয়াস মারা যান ১৬৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ, কিন্তু তার আগে তাঁকে এক নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ইউক্রাটিডেস নামক এক ভাগ্যান্বেষী গ্রীক বিদ্রোহের দ্বারা ব্যাকট্রিয়ায় ক্ষমতা দখল করেন, এবং ডিমিট্রিয়াস তাঁকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হন। ইউক্রাটিডেস ক্রমশ ডিমিট্রিয়াসের ভারতীয় এলাকাগুলিও দখল করে নেন। তবে এ কাজ তাঁর পক্ষে খুব সহজ হয়নি। ডিমিট্রিয়াসের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাঁকে তা করতে হয়েছিল। ওই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকেরই মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলির উপর ইউক্রাটিডেসের ছাপ নূতন করে বসানো। কিন্তু ইউক্রাটিডেস শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। নিজপুত্র, সম্ভবত হেলিয়োক্লেসের, হাতেই তাঁর মৃত্যু হয় আনুমানিক ১৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। হেলিয়োক্লেসের আমলেই ব্যাকট্রিয়ায় গ্রীক শাসনের অবসান ঘটে মূলত পার্থীয়, শক ও ইউচি আক্রমণে।

ব্যাকট্রিয়ায় গ্রীক শাসনের অবসান হলেও দক্ষিণ আফগানিস্তানে ও উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসনের অবসান হয়নি। এখানে গ্রীক শাসনের ইতিহাস কার্যত ইউক্রাটিডেস ও ডিমিট্রিয়াসের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের ক্রমাগত সংঘাতের ইতিহাস। তিরিশ জনেরও বেশী গ্রীক রাজার নাম পাওয়া গেছে বিভিন্ন মুদ্রা থেকে, কিন্তু কে যে কার কে, কে কোথায় কবে কখন রাজত্ব করেছেন তার খবর অন্য কোন সূত্র থেকে জানা যায়না, দু'একজন ছাড়া। তাঁদের কথা আমরা উল্লেখ করছি।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মেনাণ্ডার, যাঁর মুদ্রা ভৃগুকচ্ছ অঞ্চলে পাওয়া যেত বলে *Periplus*-এর লেখক উল্লেখ করেছেন, প্লুটার্ক যাঁকে উত্তম সম্রাট বলে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বৌদ্ধ গ্রন্থ মিলিন্দ-পঞ্হোর তিনি নায়ক যেখানে বলা হয়েছে যে এই যবনরাজা, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অলসন্দ নামক স্থানে (কাবুলের নিকটবর্তী একটি আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর), এবং যাঁর

রাজধানী ছিল শাকলে (শিয়ালকোট), বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের নিকট দীক্ষা নিয়ে, নিজ পুত্রের হাতে সিংহাসন ন্যস্ত করে, সংসার ত্যাগ করে অর্হৎ হন। মেনাণ্ডার রাজত্ব করেছিলেন আনুমানিক ১১৫ থেকে ৯০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। একথা সত্য যে মেনাণ্ডার ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন, কেননা তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে কাবুলে, সিন্ধুপ্রদেশে, গুজরাটে ও উত্তরপ্রদেশে। পাঞ্জকোরা ও সোয়াট নদীর সংযোগস্থলের পশ্চিমদিকে বাজায়ুর নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি খরোষ্ঠী লেখমালায় মেনাণ্ডারের নাম পাওয়া গেছে।

মেনাণ্ডার ছাড়া অ্যান্টালকিডাস নামক আরও একজন রাজার নাম বিখ্যাত বেসনগর-গরুড়ধ্বজ লিপিতে পাওয়া গেছে যা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন তাঁর প্রেরিত দূত তক্ষশিলার হেলিওডোরস দেবতা বাসুদেবের সম্মানে। এই অ্যান্টালকিডাসের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ইনি ইউক্রাটিডেস বংশীয়, এবং কাপিশ অঞ্চলে তাঁদেরই উত্তরাধিকারী। ইউক্রাটিডেসের পুত্র হেলিয়োক্লেস এবং এই অ্যান্টালকিডাসের মুদ্রার ধরন একই রকম। তক্ষশিলা অঞ্চলের কিছু মুদ্রায় অ্যান্টালকিডাসকে লাইসিয়াস নামক আর একজনের কনিষ্ঠ শাসক হিসাবে দেখানো হয়েছে, যা থেকে অনুমিত হয় যে শেষোক্ত ব্যক্তি সম্ভবত তাঁর পিতা ছিলেন। হোলিওডোরস মারফত প্রেরিত অ্যান্টাল-কিডাসের দৌত্য, বিদিশায় রাজা ভাগভদ্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। এটা আনুমানিক ১১৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দের ঘটনা। অ্যান্টালকিডাস মেনাণ্ডারের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, বিদিশায় তাঁর প্রেরিত দৌত্য সম্ভবত মেনাণ্ডারের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যের জন্য। কিন্তু এ সবই অনুমানমূলক।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক অধিকারের শেষ পর্যায়টি বোঝা দুঃসাধ্য। কেননা বহু রাজার নামযুক্ত বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা পাওয়া গেছে যাঁদের প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে স্থান দেওয়া যায় না। অনুমান করা যায় যে উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা নিয়ে এই সব ছোট ছোট রাজারা রাজত্ব করেছিলেন যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ইউথাইডেমাস ডিমিট্রিয়াসের জ্ঞাতিগোষ্ঠী আবার কেউ কেউ ছিলেন ইউক্রাটিডেসের জ্ঞাতিগোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাণী আগাথেক্লেইয়া এবং তাঁর পুত্র প্রথম স্ট্রাটো যাঁরা সম্ভবত পাঞ্জাবের পূর্ব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। মূলত শক, পারদ ও কুষাণ আক্রমণেই এখানে গ্রীক অধিকারের অবসান হয়। তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতীর ইউক্রাটিডীয় রাজবংশ শকরাজ মাউয়েসের (খৃঃ পূঃ ২০-২২ খৃষ্টাব্দ) দ্বারা

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাবুল উপত্যকার গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান পারদ-রাজ গণ্ডোফারনেস (২১-৫০ খৃষ্টাব্দ)। শেষ গ্রীক রাজা হার্মেয়ুস, যাঁর সঙ্গে কুষাণ বংশীয় প্রথম কদফিসের কিছু রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়, ওই পারদের দ্বারাই উৎখাত প্রাপ্ত হন, এবং পারদ বা পার্থিয়ানরাও খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি কুষাণদের দ্বারা বিলুপ্ত হয়।

৬ ॥ উত্তর-পশ্চিম ভারত : শক ও পহ্লব অধিকার (খৃষ্টপূর্ব ৫০-৬৫ খৃষ্টাব্দ)

উত্তর-ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ করে নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলে, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকেই শকেরা বসতি বিস্তার করেছিল পূর্ব ইরান থেকে এসে। শকগণ আগে মধ্য এশিয়ার যাযাবর ট্রাইব ছিল, পরে বিভিন্ন স্থানে তারা স্থায়ী হয়, এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে। ইরানে শকরা দীর্ঘকাল পার্থিয়ান বা পারদ বা পহ্লবদের অধীনে থাকে, যার ফলে তাদের রক্ত ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই পার্থীয়দের মিশ্রণ ঘটে। পার্থিয়ান বা পহ্লবগণও আগে ট্রাইবাল পর্যায়ে বাস করত, পরে ইরানে তারা বেশ শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে। ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পহ্লবরাজ প্রথম মিথ্রাডাটেস (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৭১ থেকে ১৩৬) ব্যাকট্রিয়ার দুটি অঞ্চল, হেরাট ও কান্দাহার দখল করেন। কিন্তু প্রথম মিথ্রাডাটেসের পরেই বিশাল পহ্লব রাজত্ব আকস্মিকভাবে ভেঙে যায় এবং তার পূর্বদিকের অঞ্চলগুলিতে স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে, যেগুলির রাজারা ছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে শক, কোন কোন ক্ষেত্রে পহ্লব, কোন কোন ক্ষেত্রে শক-পহ্লবের মিশ্রণ।

পূর্ব ইরান অঞ্চলের প্রথম স্থানীয় পহ্লব রাজা, যাঁর পরিচয় তাঁর মুদ্রা থেকে পাওয়া যায়, ছিলেন ভোনোনেস, দক্ষিণ আফগানিস্তানেও যাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। তাঁর মুদ্রাসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে ভোনোনেস তাঁর ভাই বা বৈমাত্রেয় ভাই স্পালহোর এবং ভাইপো স্পালগদমের সঙ্গে একসঙ্গে শাসন করতেন। স্পালিরাইসেস নামক আরও একজনের মুদ্রা পাওয়া গেছে, এবং সেই মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে তিনিও ভোনোনেসের একজন ভাই ছিলেন। উক্ত স্প্যালিরাইসেসের আরও কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে যাতে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন অয় (আজেস) নামক আর একজন শাসক, এবং তাঁদের উপাধিসমূহ ইঙ্গিত দেয় যে তাঁরা ভোনোনেসের সার্বভৌমত্বের অধীনেই ছিলেন। স্পালি-

রাইসেসের আরও এক ধরনের মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলি ভোনোনেসের মুদ্রার উপর তাঁর নিজস্ব ছাপ দেওয়া, যা থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে ভোনো-নেসের বৃদ্ধবয়সে স্পালিরাইসেস ক্ষমতা জবরদখল করেছিলেন। ভোনোনেস রাজত্ব করেছিলেন ১৮ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত, এবং স্পালিরাইসেস তারপর থেকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের সূত্রপাত পর্যন্ত।

ইরানের একেবারে পূর্বদিকের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে আধা-স্বাধীন শক শাসকেরা রাজত্ব করতেন যাঁরা ভোনোনেসের কর্তৃত্ব স্বীকার করলেও জবর-দখলকারী স্পালিরাইসেসের কর্তৃত্ব মানেননি, এবং এঁদের মধ্যে গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন শক-শাসক মাউয়েস বা মোগ (খৃষ্টপূর্ব ২০-২২ খৃষ্টাব্দ) যিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন এবং রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। মাউয়েস যে গন্ধার জয় করেছিলেন এবং ইন্দো-গ্রীকদের হটিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ তক্ষশিলায় প্রাপ্ত একটি উৎকীর্ণ লিপি যা ৭৮ শক পহ্লব অব্দে (২১ খৃষ্টাব্দে) রচিত। যদিও পাঞ্জাবের গ্রীক শক্তিকে পুরোপুরি নির্মূল করেছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী, তাহলেও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে মাউয়েসের অধিকার মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে মাউয়েসের উত্তরাধিকারী ছিলেন আজেস (৫-৩০ খৃষ্টাব্দ), যাঁর নাম আমরা আগেই পেয়েছি স্পালিরাইসেসের মুদ্রায়। কেউকেউ বলেন, আজেস ছিলেন স্পালিরাইসেসের পুত্র ও মাউয়েসের জামাতা। আজেস ইন্দো-গ্রীক রাজা দ্বিতীয় অ্যাপোলোডোটাস এবং হিপোস্ট্রাটাসের মুদ্রাসমূহের উপর নিজ ছাপ পুনর্মুদ্রিত করিয়েছিলেন। পাঞ্জাব থেকে গ্রীক শক্তিকে একেবারে উৎখাতের কৃতিত্বও তাঁর। আজেসের কিছু মুদ্রায় আজি-লাইসেস নামক এক যুগ্ম শাসকের নাম পাওয়া যায়। এই আজিলাইসেস (২৮-৪০ খৃষ্টাব্দ) সম্ভবত আজেসের পুত্র ছিলেন, যিনি আজেসের রাজত্বের শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজত্ব করেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন। আবার আজিলাইসেসের কিছু মুদ্রার অপর পিঠে যুগ্ম শাসক হিসাবে জনৈক আজেসের নাম মুদ্রিত আছে। এই আজেস (৩৫-৭৯ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন দ্বিতীয় এক আজেস যিনি খুব সম্ভবত আজিলাইসেসের পুত্র ছিলেন।

এরপর আবার আমরা উত্তর-পশ্চিমে ক্ষমতার হস্তান্তর দেখি, শকদের জায়গায় পহ্লবেরা ক্ষমতায় আসে গণ্ডোফারনেসের নেতৃত্বে। গণ্ডোফারনেস (২১-৫০ খৃষ্টাব্দ) কাবুলের শেষ গ্রীক রাজা হার্মেয়ুসকে পরাস্ত করেছিলেন,

যদিও ওই গ্রীক রাজাকে সাহায্য করেছিলেন কুষাণ নেতা কুজুল কদফিস। কিন্তু কাবুলে তাঁর সাফল্য ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, কেননা প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাবুল ও তার চারদিকের অঞ্চলসমূহ পুরোদস্তুর কুষাণ অধিকারে আসে। কিন্তু ভারতে শকদের বিরুদ্ধে গণ্ডোফারনেস অধিকতর সফল হন। পেশওয়ারে তখৎ-ই-বাহী নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি উৎকীর্ণ লিপি উত্তর-পশ্চিম ভারতে পহ্লব অধিকারের সাক্ষ্য দেয়।

গণ্ডোফারনেসের মুদ্রাসমূহে তাঁর সঙ্গে যাঁরা সম্পর্কিত হয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন তাঁর ভাইপো, সীস্তান ও কান্দাহারের শাসক, আবডাগাসেস; অন্যান্য শাসক যেমন সপেদন এবং সতবস্ত্র; এবং তাঁর সেনাপতি অস্পবর্মন ও শশ। এঁদের মধ্যে সপেদন ও সতবস্ত্রের মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রমাণ করে গণ্ডো-ফারনেসের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল অনেকটা আনুষ্ঠানিক। অস্পবর্মনের (অশ্ববর্মা) নাম দ্বিতীয় আজেসের কয়েকটি মুদ্রায় বর্তমান ছিল যা থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি উত্তর পশ্চিমের কোন এক অঞ্চলের শাসক ছিলেন আজেসের আমলে এবং পরে গণ্ডোফারনেসের নিকট আনুগত্য বদল করেন।

দ্বিতীয় আজেসের ভারতীয় এলাকাসমূহ গণ্ডোফারনেসের অধিকারে আসার পর সম্ভবত দ্বিতীয় আজেস কুষাণদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে কুষাণেরা পহ্লব অধিকার বিলোপ করলেও দ্বিতীয় আজেস আর ফিরে আসেননি। কুষাণেরা যে পহ্লবদের গন্ধার অঞ্চল থেকে ৬৫ খৃষ্টাব্দের আগেই হটিয়ে দিয়েছিল তার প্রমাণ পঞ্জতর ও তক্ষশিলায় প্রাপ্ত দুটি উৎকীর্ণ লিপি যেগুলি যথাক্রমে ৬৫ এবং ৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। এই অধিকার কুষাণেরা লাভ করেছিল গণ্ডোফারনেসের উত্তরাধিকারী পাকোরেসকে পরাস্ত করে পাকাপাকিভাবে।

গণ্ডোফারনেসের তখৎ-ই বাহী লিপির সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি অবশ্য ২১ থেকে ৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কয়েকটি খৃষ্টীয় পুঁথির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে গুদনফর বা গণ্ডোফোরস নামক ভারতীয় সম্রাট সাধু টমাসকে রাজসভায় গ্রহণ করেছিলেন। এই গণ্ডোফোরস নিশ্চয়ই গণ্ডোফারনেস, এবং ওই সকল পুঁথির সাক্ষ্যে যে তারিখের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে বাস্তবিকই গণ্ডোফারনেস সেই সময়ে বর্তমান ছিলেন।

গণ্ডোফারনেসের উত্তরাধিকারীর যুগটি উত্তর পশ্চিম ভারতে মূলত কুষাণ অধিকার প্রতিষ্ঠার যুগ, এবং তা সংঘর্ষের দ্বারা চিহ্নিত। শক ও পহলব আমলে

প্রাদেশিক শাসনকর্তারা, যাঁরা প্রায়শই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন এবং কোন বড় রাজার আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করতেন এবং প্রয়োজনে মাঝে মাঝে সেই আনুগত্যের পরিবর্তন করতেন, মহাক্ষত্রপ ও ক্ষত্রপ নামে পরিচিত ছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বর্তমান ছিলেন এমন কিছু মহাক্ষত্রপ ও ক্ষত্রপের নাম পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় আজেস ও গণ্ডোফারনেসের অধীনস্থ অশ্ববর্মা ও তাঁর ভাইপো শশ, এবং তৎসহ সপেদন ও সতবস্ত্রের নাম আমরা আগেই করেছি। এঁরা তক্ষশিলার আশেপাশে বর্তমান ছিলেন। তক্ষশিলা অঞ্চলের আরও একজন ক্ষত্রপ ছিলেন লিয়ক কুসুলুক। আরও কয়েকজন ক্ষত্রপের নাম পাওয়া যায় বিভিন্ন লেখমালা ও মুদ্রা থেকে, যেমন কুসুল-পদিক, মেবকি-হিয়িক, জিওনাইসেস, শিবসেন, খর-ওষ্ট প্রভৃতি। মথুরা অঞ্চলে বিখ্যাত ছিলেন মহাক্ষত্রপ রঞ্জুবুল এবং তাঁর পুত্র শোণ্ডাস। এঁদের মুদ্রা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে। রঞ্জুবুলের মুদ্রায় খরোষ্ঠী হরফে তাঁর উপাধি লিখিত হয়েছে অপ্রতিহতচক্র, এবং গ্রীক লিপিতে Basilei Basileos Soteros অর্থাৎ রাজাধিরাজ-পরিত্রাতা। শোণ্ডাস তাঁর মুদ্রা শুধু মাত্র ব্রাহ্মী হরফেই প্রচার করেছিলেন।

৭॥ উত্তর-পশ্চিম ভারত : কুষাণ অধিকার (১৫-১৭৬ খৃষ্টাব্দ)

কুষাণরা ছিল আদিতে ইউ-চি ট্রাইবের শাখা। চৈনিক বৃত্তান্তসমূহ অনুযায়ী ইউ-চি ট্রাইব আদিতে বাস করত চৈনিক তুর্কীস্তানের তুন-হুয়াং ও তিয়েন-সানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, এবং ১৬৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ তারা হিয়ুং-নু নামক আর এক ট্রাইবের দ্বারা বিতাড়িত হয়, এবং তাদের নেতার মাথার খুলি হিয়ুং-নু নেতার পানপাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর ইউ-চিরা তাদের পরলোকগত নেতার বিধবার নেতৃত্বে পশ্চিম দিকে এবং উ-সুন ট্রাইবকে পরাস্ত করে ইসিক-কোল হ্রদ অঞ্চলে সাময়িক বসতি স্থাপন করে। সেখান থেকে তাদের একটি শাখা যারা ছোট ইউ-চি নামে পরিচিত, তিব্বতের দিকে যাত্রা করে। বড় শাখাটি, যারা টা-ইউচি নামে পরিচিত, ক্রমশ জাকজারটেস বা সির-দরিয়া নদী অঞ্চলে হাজির হয় এবং সেখানকার শক অধিবাসীদের বিতাড়িত করে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু এখানেও তারা টিকতে পারে না, কেননা শকেরা ইউ-চিদের পূর্বোক্ত দুটি শত্রু ট্রাইবের—উ-সুন এবং হিয়ুং-নু—সহায়তায় তাদের আবার বিতাড়িত করে। এবং অতঃপর ইউ-চিরা চলে আসে অক্সাস বা আমুদরিয়া নদী অঞ্চলে, এবং সেখানকার শকদের পরাস্ত করে ক্রমশ তা-হিয়া বা ব্যাকট্রিয়া

অঞ্চলটি পাকাপাকিভাবে দখল করে। ইউচিদের মোট পাঁচটি গোষ্ঠী ছিল, যারা পৃথক পৃথক বসতি স্থাপন করেছিল। এই পাঁচটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটির নাম কুই-সুয়াং বা কুষাণ।

চৈনিক ঐতিহাসিক ফান-ই লিখেছেন যে, পরবর্তীকালে এই পাঁচটি ইউচি গোষ্ঠীর মধ্যে কুই-সুয়াং বা কুষাণরাই প্রাধান্য লাভ করে এবং তাদের নেতা কিও-সিও-কিও বাকি চারটি গোষ্ঠীকে পদানত করে রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ন্‌গন-সি (পার্থিয়ার একটি এলাকা) আক্রমণ করেন এবং কাও-ফু (কাবুল), পোটা (কাবুলের নিকটস্থ অঞ্চল) এবং কি-পিন (কাফিরিস্তান ও সন্নিহিত অঞ্চল) জয় করেন। কিও-সিও-কিও মারা যান আশী বছর বয়স পেরিয়ে। এবং তারপর রাজা হন তাঁর পুত্র এন-কাও-চেন এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (তিয়েন-চৌ) দখল করেন। এর পর থেকে ইউ-চি নামটির পরিবর্তে কুষাণ নামটিরই প্রচলন বেড়ে যায়।

ফান-ই কথিত কিও-সিও-কিও নিঃসন্দেহে প্রথম কুষাণ রাজা কুজুল কদফিস, যাঁকে প্রথম কদফিসও বলা হয়। তাঁর কিছু মুদ্রার প্রথম পিঠে কাবুলের গ্রীক শাসক হার্মেয়ুসের উল্লেখ রয়েছে, এবং উল্টো দিকে খরোষ্ঠিতে লেখা রয়েছে কুজুল-কসস-কুষাণ-যবুগস-ধ্রম-ঠিদস, যার অর্থ 'ধর্মে স্থিত কুষাণ নেতা কুজুল কস-এর'। লক্ষ্যণীয় যে এখানে তিনি নিজেকে যবুগ বা নেতা বলে উল্লেখ করছেন, রাজা বলে নয়, অর্থাৎ ওই মুদ্রার অপর পিঠে উল্লিখিত হার্মেয়ুসের অধীনতা তিনি যেন মেনে নিয়েছেন। অনুমান করা অসম্ভব নয় যে অপর চারটি ইউ-চি গোষ্ঠীকে তাঁবে আনতে এবং বিভিন্ন এলাকা জয় করার সময় তিনি হার্মেয়ুসের সাহায্য পেয়েছিলেন এবং বিনিময়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি হার্মেয়ুস পহ্‌লবরাজ গণ্ডোফারনেসের হাতে পরাজিত ও নিহত হন, কুজুল কদফিসের সহায়তা সত্ত্বেও। আনুমানিক ৪৬ খৃষ্টাব্দে গণ্ডোফারনেস মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পহ্‌লবদের পরাজিত করেন ও তাদের এলাকাগুলি দখল করে নেন। ৬৫ খৃষ্টাব্দের পঞ্জতর-লিপিতেও এই রকম ঘটনার ইঙ্গিত আছে। এর পর কুজুল কদফিসের সার্বভৌম রাজা হবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না, এবং তাঁর পরবর্তী মুদ্রায় বাস্তবিকই আমরা দেখি, তিনি নিজেকে 'মহরজস-রজতিরজস-কুয়ুল-কফস' অর্থাৎ মহারাজ ও রাজাধিরাজ উপাধির দ্বারা চিহ্নিত করছেন। কুজুল কদফিসের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫ থেকে ৬৫ খৃষ্টাব্দ।

তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন যার প্রমাণ তাঁর সচ-ধ্রম-ঠিত (সত্য-ধর্ম-স্থিত) উপাধি।

কুজুল কদফিসের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র এন-কাও-চেন বা বীম কদফিস, চৈনিক লেখকদের মতে যিনি ভারতবর্ষ, অর্থাৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ (তিয়েন-চো) অধিকার করেছিলেন। তাঁর কোন লেখমালা পাওয়া না গেলেও কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাঁর মুদ্রার অপর পিঠে শিবের মূর্তি অঙ্কিত আছে এবং খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ আছে 'মহরজস-রজধিরজস-সর্বলোগ-ইশ্বরস-মহিশ্বরস-বীম-কদফিসস-ত্রতরস'। এ থেকে মনে হয় তিনি তাঁর পিতার মত বৌদ্ধ ছিলেন না, শৈব ছিলেন। পাঞ্জাব, কান্দাহার ও কাবুল উপত্যকা থেকে এক নামহীন রাজার বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে, যেগুলিতে লেখা আছে *Besileus Basileuon Soter Megas* (রাজাধিরাজ মহৎ ত্রাতা)। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার খরোষ্ঠীতেও লেখা আছে 'মহরজস রজধিরজস মহতস ত্রতরস' (ওই একই অর্থ)। 'মহৎ ত্রাতা' উপাধিধারী এই অজ্ঞাত রাজাকে কেউ কেউ বীম কদফিসের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে ৬৫ এবং ৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত পঞ্জতর এবং তক্ষশিলা লিপিতে যে নামহীন কুষাণ রাজা উল্লিখিত হয়েছেন তিনি বা তাঁদের সঙ্গে এই 'মহৎ ত্রাতা' বা Soter Megas উপাধিধারী রাজার যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে।

বীম কদফিস নিঃসন্দেহে ৭৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দের আগে মারা গিয়েছিলেন এবং তারপর কুষাণ এলাকাগুলি কণিষ্কের হাতে আসে। এই কণিষ্কের বংশের সঙ্গে পূর্ববর্তী কদফিসদের বংশের কি সম্পর্ক ছিল তা বলা যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি ছিলেন কুষাণদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। বিভিন্ন লেখমালা থেকে প্রমাণিত হয় যে কণিষ্ক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুর উত্তরের ভাওয়ালপুর অঞ্চল, পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে রাজত্ব করেছেন। কণিষ্কের বহু উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে মথুরা অঞ্চলে, এ ছাড়া ভাওয়ালপুরের নিকটবর্তী সুই-বিহার এবং আরও নানাস্থানে ছড়ানো তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের লিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁর প্রভাবের পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আলবিরুণী লিখেছেন যে আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ায় তাঁর সাম্রাজ্যসীমা প্রসারিত হয়েছিল, এবং একথা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের দ্বারা বহুলাংশে সমর্থিত হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে কণিষ্ক পার্থিয়ান বা পহ্লবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালিয়েছিলেন। চৈনিক এবং

তিব্বতী সূত্র থেকে জানা যায় যে কণিষ্ক সাকেত এবং পাটলিপুত্র অধিকার করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে বাংলা ও উড়িষ্যায় কিছু কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গেছে, যা অবশ্য এই সব এলাকায় কণিষ্কের অধিকারের দ্যোতক নয়। কল্হন তাঁর রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে বলেছেন যে কণিষ্ক কাশ্মীরেরও অধিপতি ছিলেন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন গন্ধার ও পুরুষপুরে (পেশোয়ার) কণিষ্কের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল এবং তিনি সুং-লিং পর্বতমালা পর্যন্ত অঞ্চল জয় করেছিলেন, এবং একজন চৈনিক রাজপুত্র প্রতিভূ হিসাবে নিজ দরবারে রেখেছিলেন।

শেষজীবনে কণিষ্ক মধ্য এশিয়ায় চীনাদের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ যুদ্ধ করেন। চৈনিক গ্রন্থসমূহের বিবরণ অনুযায়ী তিনি সেনাপতি পান-চাও-এর নিকট পরাজিত হন, এবং চীন সম্রাট হো-তিকে (৮৯-১০৫ খৃষ্টাব্দ) কর দিতে বাধ্য হন।

কণিষ্কের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সংশয় আছে। কণিষ্ক একটি অব্দের প্রচলন করেছিলেন এবং তা তাঁর উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। কণিষ্ক রাজত্ব করেছিলেন সেই অব্দের ২ থেকে ২৩ বছর, বাসিষ্ক ২৪ থেকে ২৮, হুবিষ্ক ২৮-৬০, বজিষ্কের পুত্র কণিষ্ক ৪১, এবং বাসুদেব ৬৭-৯৮। এখন প্রশ্ন, সেই অব্দ কোন্‌টি? এই বিষয়ে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত মত হচ্ছে এই যে, কণিষ্ক যে অব্দের সৃষ্টি করেছিলেন, ইতিহাসে তা শকাব্দ নামে পরিচিত হয়েছে। ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে এই শকাব্দের সূত্রপাত।

অবশ্য কেউ কেউ এতে আপত্তি করেছেন। যেমন ফ্লীট বলেন যে কণিষ্ক কদফিসদের পূর্ববর্তী, এবং তিনি বিক্রমাব্দের প্রবর্তক যার সূত্রপাত ৫৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে। কিন্তু চৈনিক গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ইউচিদের প্রথম কুষাণ রাজা হচ্ছেন কুজুল কদফিস, এবং দ্বিতীয়ত কণিষ্ক প্রবর্তিত অব্দ তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে ধারাবাহিকতা পেয়েছে যার পরে কদফিসদের স্থান দেবার উপায় নেই। দ্বিতীয় একটি মত হচ্ছে কণিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ২৪৮ বা ২৭৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এত পরবর্তীকালে কণিষ্ককে স্থান দিলে পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক কালানুক্রমকে বজায় রাখা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কুষাণরাজ বাসুদেব ৯৮ কণিষ্কাব্দে মথুরা অঞ্চলে প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিলেন। ২৭৮ খৃষ্টাব্দে কণিষ্কের সিংহাসনারোহণ হলে আমাদের মানতে হবে যে মথুরায় বাসুদেবের কর্তৃত্ব ছিল ৩৭৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ পুরোদস্তুর গুপ্ত আমলে, আর ২৪৮-এ হলে ৩৪৬ খৃষ্টাব্দে, সেটাও গুপ্তযুগ। কুষাণ এবং গুপ্তদের

মাঝামাঝি সময়ে একটি নাগ বংশ মথুরায় রাজত্ব করেছিল যাদের কাছ থেকে সমুদ্রগুপ্ত মথুরা জয় করেন। এই নাগ রাজাদেরই বা তাহলে কোন যুগে প্রতিষ্ঠা করা যাবে? কণিষ্কের তারিখ সম্পর্কে অবশ্য একটি জোরাল মত আছে যা ৭৮ খৃষ্টাব্দের বিপক্ষে ব্যবহৃত হয়। সেটি হচ্ছে চৈনিক সূত্র। কতিপয় চৈনিক ও তিব্বতী রচনা থেকে জানা যায় যে ২৩০ খৃষ্টাব্দে কুষাণরাজ বাসুদেব (পো-সিয়াও) চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। তাহলে কণিষ্ককে ১৩০ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে সিংহাসনে বসাতে হয়। আর একটি জোরাল খবর পাওয়া যায় চৈনিক ঐতিহাসিক উ-হুয়ানের রচনায় যিনি ইঙ্গিত করেছেন যে কুষাণ রাজত্ব ২২১-৭৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বর্তমান ছিল।

সৌভাগ্যক্রমে কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যা চৈনিক সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং ৭৮ খৃষ্টাব্দকেই কণিষ্ক প্রবর্তিত শকাব্দ বলে নির্দিষ্ট করতে পারে। ১৩০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে কণিষ্কের সিংহাসনারোহণের যে খবর চৈনিক সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গে বলা যায় যে দ্বিতীয় একজন কণিষ্ক বর্তমান ছিলেন। ইনি বজিষ্কের পুত্র এবং এঁর ৪১ বছরে উৎকীর্ণ আরা-লিপি কণিষ্ক প্রবর্তিত ৭৮ খৃষ্টাব্দের শকাব্দের হিসাবে ১১৯ খৃষ্টাব্দের সাক্ষ্য দেয়। এই দ্বিতীয় কণিষ্ক ছাড়া আরও একজন তৃতীয় কণিষ্ক ছিলেন তৃতীয় শতকে, যাঁর ১৪ বছরে রচিত একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে। এই লিপির হরফ গুপ্ত হরফেরই অনুরূপ, এবং অনুমান করা যায় যে প্রথম কণিষ্কের মত ইনিও একটি অব্দ প্রতিষ্ঠা করে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন। এরপর পো-সিয়াও বা বাসুদেবের কথা। ৭৮ খৃষ্টাব্দ কণিষ্কের সিংহাসনারোহণের কাল হলে বাসুদেবের রাজত্বকাল হয় ১৪৫ থেকে ১৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাহলে ২৩০ খৃষ্টাব্দে যে পো-সিয়াও বা বাসুদেব চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন, তিনি কি এক দ্বিতীয় বাসুদেব? সত্যই এক দ্বিতীয় বাসুদেবের সন্ধান মুদ্রা থেকে পাওয়া গেছে যিনি তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। কাজেই চৈনিক সূত্রসমূহ ৭৮ খৃষ্টাব্দে কণিষ্ক যে সিংহাসনে আরোহণ করে শকাব্দের প্রচলন করেছিলেন এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে তো যায়ই না, বরং আরো খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোকপাত করে ওই বক্তব্যকেই দৃঢ় করে।

কনিষ্ক বৌদ্ধ ছিলেন। হিউয়েন সাঙ ও আলবিরুণী তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও পেশোয়ারে একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের কথা বলেছেন। নবম শতকের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে আমরা দেখি যে কণিষ্ক কাশ্মীরে একটি বৌদ্ধ সম্মেলন ঘটিয়েছিলেন। কোন কোন সূত্রে বলা হয়েছে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল জালন্ধর

অথবা গন্ধারে। এটিই বিখ্যাত চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন যাতে সর্বাস্তিবাদীরা প্রাধান্য অর্জন করেছিল। মধ্য এশিয়ায় সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মূলে কণিষ্কের অবশ্যই অবদান আছে। একটি ভ্রান্ত তথ্যের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় যা হচ্ছে এই যে চতুর্থ সম্মেলনেই বৌদ্ধদের মধ্যে হীনযান মহাযান ভেদ হয়ে যায়। একথা ঠিক নয়। কণিষ্ক বৌদ্ধ হলেও তাঁর মুদ্রাসমূহে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায়—শিব, বুদ্ধ, পারসিক দেবতা ওয়াদো, আথশো, মাও, মিহির, সুমেরীয় মাতৃদেবী ননা, গ্রীক দেবতা হেলিওস প্রভৃতি। তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের এলাকায় বহু ধর্মাবলম্বী লোক বাস করত, কাজেই তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রতিপাদনের জন্য সম্রাটের পক্ষে তাঁর মুদ্রায় বিভিন্ন ধর্মের স্বীকৃতি রাজনীতির দিক থেকে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল।

কণিষ্কের আমলে এমন কিছু মানুষের উদ্ভব হয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা কিছু অবদান রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুমিত্র, সংঘরক্ষ, পার্শ্ব, চিকিৎসাবিদ চরক, রাজনীতিজ্ঞ মাঠর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আনুমানিক ১০০-১০১ খৃষ্টাব্দে কণিষ্কের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হন বাসিষ্ক। মথুরা ও ভূপাল থেকে তাঁর কিছু লেখমালা পাওয়া গেছে যেগুলি ১০২ থেকে ১০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। ইনিই সম্ভবত আরা-লিপিতে বর্ণিত দ্বিতীয় কণিষ্কের পিতা বজিষ্ক। প্রথম কণিষ্কের সঙ্গে বাসিষ্কের সম্পর্ক ঠিক জানা যায় না, পুত্র হতে পারেন, ভাই-ও হতে পারেন, তবে ইনি কিছুকাল প্রথম কণিষ্কের সঙ্গে একত্র রাজত্ব করেছিলেন। বাসিষ্কের উত্তরাধিকারী ছিলেন হুবিষ্ক (রাজ্য-কাল ১০৬-১৩৮ খৃষ্টাব্দ) যিনি কিছুকাল বাসিষ্কের সঙ্গে একত্র রাজত্ব করেছিলেন। কাবুলের নিকট ওয়ার্দকে প্রাপ্ত তাঁর একটি উৎকীর্ণ লিপি আফগানিস্তানে তাঁর আধিপত্যের প্রমাণ দেয়। ইনিই সম্ভবত কল্হনের রাজতরঙ্গিণীতে (১৷১৬৮-৭৩) বর্ণিত হুষ্ক। মথুরায় প্রাপ্ত তাঁর একটি উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁর পিতামহ সম্পর্কে সচ-ধ্রম-ঠিত কথাটি বলা হয়েছে যা, অত্যন্ত কৌতূহলজনক ভাবেই, প্রথম কদফিসের উপাধি ছিল। হুবিষ্কের মুদ্রাসমূহেও বিভিন্ন দেশের দেবদেবীর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে মধ্যে রোমা, হেরাক্লেস, সারাপিস, মাও, আরডোক্‌ষো, আইনো, সাওরেও, বিষ্ণু, মহাসেন ও কার্তিক গোষ্ঠী, গণেশ প্রভৃতি। হুবিষ্ক শেষ বয়সে বজিষ্কের (বাসিষ্ক) পুত্র আরা-লিপিতে উল্লিখিত দ্বিতীয় কণিষ্কের সঙ্গে একত্র রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় কণিষ্ক তাঁর

সমকালীন রোমক সম্রাটদের অনুকরণে কৈসর বা সীজার উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এর আরা লিপিতে আমরা একটি নির্দিষ্ট তারিখ পাই, ১১৯ খৃষ্টাব্দ (৪১ শকাব্দ)। শেষ বিশিষ্ট কুষাণরাজ ছিলেন বাসুদেব যাঁর নামটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। বাসুদেব রাজত্ব করেছিলেন ১৪৫ থেকে ১৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

বাসুদেবের পর কুষাণ বংশের ইতিহাস অন্ধকারময়। একজন তৃতীয় কণিষ্ক ও দ্বিতীয় বাসুদেবের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাঁদের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। বাসুদেবের পরেই কুষাণ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এবং আঞ্চলিক শাসকেরা নামে মাত্র কুষাণদের অধীনতা স্বীকার করলেও, ধীরে ধীরে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তবে একেবারে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ও আফগানিস্তানে তাদের প্রতিপত্তি লোপ পেতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে জনৈক রাজার উল্লেখ আছে দৈবপুত্র শাহী-শাহানুশাহী বলে যা ওই সময়ে সীমান্ত অঞ্চলে কুষাণশক্তির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। 'দেবপুত্র' কুষাণদের একটি শাখার উপাধি যা কণিষ্ক সহ আরও অনেক কুষাণ নরপতি গ্রহণ করেছিলেন।

৮ ॥ সমীক্ষা

মৌর্যোত্তর ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের একটি রাজনৈতিক চিত্র, যদিও বিচ্ছিন্ন আকারে, আমরা পেলাম। এই যুগের ওই অঞ্চলের ইতিহাসের এমন কতকগুলি সমস্যা আছে যেগুলি ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন। প্রথম সমস্যাটি হচ্ছে উত্তর-পশ্চিমের গ্রীক রাজাদের নিয়ে। অসংখ্য গ্রীক রাজার অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলিকে বংশ অনুযায়ী এবং একটি নির্দিষ্ট কালানুক্রমের মধ্যে স্থান দেওয়া দুঃসাধ্য। তাহলে কিভাবে এতগুলি রাজা ও তাঁদের উপস্থিতির ব্যাখ্যা করা সম্ভব? শক-পহ্লবদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একই রাজার সহকারী রাজা অনেক। রাজা এবং একজন যুবরাজ একসঙ্গে শাসন করতে পারে, এবং উভয়ের নামোল্লিখিত মুদ্রাও প্রচলিত হতে পারে। কিন্তু যেখানে সহকারী রাজা অনেক এবং আসল রাজার সঙ্গে যেখানে সহযোগী রাজাদের রক্তের সম্পর্কও নেই, অথচ তারা একসঙ্গে মুদ্রায় উল্লিখিত, যেমন গণ্ডোফারনেসের ক্ষেত্রে ঘটেছে, এ সবেরই বা ব্যাখ্যা কি? মনে হয় একটি সূত্র ধরেই এগুলির অনুসন্ধান করা চলতে পারে, এবং সেই সূত্রটি হচ্ছে ট্রাইবাল দশা থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তরণের পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ।

এক্ষেত্রে তথ্য আমাদের হাতে খুবই কম, তবু কুষাণদের ধরেই কিছুটা অগ্রসর হতে পারি। কুষাণ বা ইউচিরা যে এককালে বিশুদ্ধ ট্রাইব ছিল এটা সংশয়াতীত, এবং তাদের ক্ষেত্রে গঠিত সিদ্ধান্তগুলি শক ও পহ্লবদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে, তার কারণ তারাও ছিল ট্রাইব। ১৬৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ ইউচিরা যাত্রা শুরু করেছিল, এবং প্রথম যখন তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করল, তখনও তাদের মধ্যে কোন রাজতন্ত্রের চিহ্ন নেই, পাঁচটি গোষ্ঠী বা ক্লান পাঁচজন যবুগ বা সর্দারের অধীনে ছিল, এবং কালক্রমে তাদেরই মধ্যে একজন, কুজুল কদফিস, ওই ক্লান-শাসনের অবসান ঘটিয়ে পুরোপুরি রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করলেন, যবুগ হলেন মহারাজ-অতিরাজ। এক্ষেত্রে ট্রাইবাল দশা থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হতে সময় লেগেছিল প্রায় একশো বছর। অনুরূপভাবে নিশ্চয়ই শক ও পহ্লবদের মধ্যেও রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল।

কিন্তু তাহলেও পুরাতন ট্রাইবাল রীতিনীতির লোপ সহজে হয় না, এবং সেটা কতদিনে কিভাবে হবে তা নির্ভর করে গণ-বন্ধন কতখানি দৃঢ় তার উপর। যেখানে ওই গণবন্ধন তাড়াতাড়ি শিথিল হয়েছে সেখানে রাজা, তাঁর ছেলে, তাঁর ছেলের লাইন সহজেই চালু হয়েছে, যেখানে তা তাড়াতাড়ি শিথিল হয়নি সেখানে যে ট্রাইবাল নেতা নবগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজা হয়েছেন, তাঁর ট্রাইবের অন্যান্য ক্লানের সর্দারদেরও উপেক্ষা করতে পারেননি, শাসনব্যবস্থা ও মুদ্রাব্যবস্থায় তাদেরও স্থান দিতে হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে শক-পহ্লবদের মুদ্রায় উৎকীর্ণ একাধিক সহযোগী রাজার বা শাসকের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায়।

গ্রীক মুদ্রাগুলির বেলায় তাহলে কি হবে ? শক-পহ্লবদের ক্ষেত্রে আমরা যা বলেছি, গ্রীকদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের মনে রাখতে হবে সকল গ্রীকই মূল গ্রীক ভূখণ্ডে বাস করত না, এবং কোনদিনই তা করত না, খোদ হোমরই জন্মেছিলেন এশিয়া মাইনরে। মূল গ্রীক ভূখণ্ডের গ্রীকদের রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি যেমন সর্বত্র এক ছিল না—এথেন্সে একরকম, স্পার্টায় একরকম, বিওসিয়ায় একরকম—এশীয় গ্রীকদের রাষ্ট্রব্যবস্থাও সেইরকম সর্বত্রই এক ধরনের ছিল না, এবং অনুমান করা যেতে পারে যে তাদের মধ্যেই অধিকাংশই আলেকজাণ্ডারের সময়ে ট্রাইবাল পর্যায়ে বাস করত, এবং তাঁর এশিয়া অভিযানের সময় এই রকম অনেক গ্রীক ট্রাইব তাঁর বাহিনীর সামিল হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সহযোগিতার পুরস্কার হিসাবে তারা তাঁর

বিস্তৃত অধিকৃত এলাকার ভাগ পেয়েছিল বটে, কিন্তু যেহেতু সেই সব ট্রাইবাল নেতারা নিজেদের প্রেরণায় কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলেনি, তারা তা পেয়েই গিয়েছিল, সেই হেতু রাজা হয়ে বসার পরেও ট্রাইবাল সমাজের জ্ঞাতিত্ব-বন্ধন তাদের মধ্যে সহজে শিথিল হয়নি। কাজেই কোন রাজার অধীনস্থ কোন জ্ঞাতি শাসক নিজের নামে মুদ্রা অঙ্কিত করলেও, সেটাকে সেই রাজা হয়ত তার কর্তৃত্বের প্রতি কোন চ্যালেঞ্জ বলে মনে করত না, এবং এই কারণেই এত গ্রীক শাসকের এত মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রা ছাড়া যদি অন্য কোন সূত্র আমাদের জানা থাকত তাহলে এ বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করা যেত।

৯॥ পশ্চিম ভারত : শক ক্ষত্রপগণ (১০০-৩০০ খৃষ্টাব্দ)

পশ্চিম ভারত বলতে আমরা নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল, রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চল, বর্তমান গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের একাংশকে বোঝাচ্ছি। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে এই সকল এলাকায় শকদের বসতি গড়ে ওঠে। শক শাসকেরা, আমরা আগেই দেখেছি, নিজেদের ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপ বলে অভিহিত করতেন। গোড়াতে ক্ষত্রপ কথাটির অর্থ 'রাজার নিযুক্ত শাসক' বোঝালেও কালক্রমে তা রাজার দ্যোতক হয়ে ওঠে, পরবর্তীকালে পেশবা শব্দটির ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষের দিকে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে কুষাণরাজ কণিষ্কের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমান করতে অসুবিধা নেই পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপেরা কণিষ্কের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, যদিও কুষাণদের দুর্বলতার সুযোগে তাঁরা পুরোদস্তুর স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন। পশ্চিম ভারতে কণিষ্কের অধীনে যে শক ক্ষত্রপ শাসনকার্য চালাতেন, তিনি ছিলেন ক্ষহরাত গোষ্ঠীর ভূমক। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীতে লেখা তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে গুজরাত ও সৌরাষ্ট্রের উপকূল অঞ্চলে, মালবে এবং রাজস্থানের আজমীরে। তিনি কণিষ্কের জীবদ্দশাতে স্বনামে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে কিছু বলা যায়না। ভূমক সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

ভূমকের উত্তরাধিকারী ছিলেন নহপান, যিনি ওই একই ক্ষহরাত গোষ্ঠীরই লোক ছিলেন, তবে ভূমকের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল তা বলা যায়না। নহপানের উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে, যেগুলিতে তারিখ দেওয়া আছে ৪১ ও ৪৬। যদি ঐ তারিখগুলি শকাব্দ অনুসারী হয়, তাহলে ওই লিপিগুলি ১১৯-২৫ খৃষ্টাব্দকে নির্দেশ করে। গোড়ার দিকের লিপিসমূহে নহপান নিজেকে ক্ষত্রপ

বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু শেষের দিকের লিপিসমূহে তিনি মহাক্ষত্রপ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর লিপিতে রাজা উপাধিও আছে। নহপানের রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে উত্তর দিকে রাজস্থানের আজমীড় অঞ্চলে এবং দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায়। এ থেকে মোটামুটি তাঁর রাজত্বের এলাকা বোঝা যায়। অর্যমা নামক তাঁর এক অমাত্যের একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে পুনা জেলার জুনারে। তাঁর জামাতা ঋষভদত্তের (উষভদাত), যিনি নহপানের দক্ষিণদিকের এলাকাগুলির শাসক ছিলেন, কিছু লিপি পাওয়া গেছে নাসিক ও কার্লেতে, যেখানে অনেকগুলি জায়গার নাম পাওয়া গেছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মালব, সৌরাষ্ট্র, গুজরাত, কোংকনের উত্তরাঞ্চল, নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের বেশ কিছু এলাকা নহপানের প্রভাবাধীন ছিল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে সৌরাষ্ট্র, গুজরাত ও রাজস্থানের বেশ কিছুটা অংশের অধিপতি হিসাবে মম্‌বারাস নামক একজনের নাম আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মম্‌বারাস শব্দটি ভুলক্রমে নম্‌বানাস-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং নম্‌বানাস আসলে নহপান। অবশ্য সকলে একথা বলেন না। পূর্বকথিত ঋষভদত্তের একটি নাসিক লিপিতে বলা হয়েছে যে তিনি ভট্টারকের আদেশে মালয়গণ (মালব) কর্তৃক অবরুদ্ধ উত্তমভদ্র ট্রাইবকে সাহায্য করেছিলেন। এই ভট্টারক নহপান হতে পারেন, অথবা কোন কুষাণ রাজাও হতে পারেন যাঁর একটা আনুষ্ঠানিক আনুগত্য শক-ক্ষত্রপেরা হয়ত স্বীকার করতেন। তাঁর জীবনের শেষ দিকে, ১২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে নহপান সাতবাহন নৃপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির হাতে পরাজিত ও নিহত হন, এবং তাঁর রাজত্বের দক্ষিণদিকের এলাকাগুলি সাতবাহনদের হাতে চলে যায়।

নহপানের মৃত্যুর পর পশ্চিমভারতে ক্ষহরাতদের স্থানে কার্দমক গোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষত্রপ চষ্টনের নেতৃত্বে, যিনি পরে মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। চষ্টনের পুত্র জয়দামার অকালমৃত্যু ঘটলে তিনি তাঁর পৌত্র রুদ্রদামার সঙ্গে একত্রে রাজত্ব করেছিলেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় কচ্ছের অন্ধাউ নামক স্থানে আবিষ্কৃত তাঁর একটি উৎকীর্ণ লিপিতে যা রচিত হয়েছিল ১৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে। চষ্টন এবং রুদ্রদামার নেতৃত্বে শকেরা সাতবাহনদের পরাজিত করেছিল এবং নহপানের হৃত এলাকাগুলি পুনরাধিকার করেছিল। রুদ্রদামার জুনাগড় লিপিতে তাঁকে অকার, অবন্তী, অনূপ, অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র ও আনর্তের অধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রমাণ করে যে সাতবাহনদের হাত থেকে তিনি

পূর্বতন শক এলাকাগুলি উদ্ধার করেছিলেন। এছাড়া রুদ্রদামা দক্ষিণাপথের নৃপতি সাতকর্ণিকে দুবার পরাজিত করার দাবী করেছেন, এবং এই সাতকর্ণি সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র ভিন্ন আর কেউ নন। কান্‌হেরি লিপিতে রুদ্রদামার কন্যার সঙ্গে বাসিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণির (সাতবাহনরাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির পুত্র) বিবাহের ইঙ্গিত আছে। কার্দমক শকদের শাসনকেন্দ্র ছিল উজ্জয়িনী।

১৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে রুদ্রদামা মহাক্ষত্রপ হিসাবে চষ্টনের উত্তরাধিকারী হন। ১৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে রচিত জুনাগড় লিপি রুদ্রদামা কর্তৃক সুদর্শন বাঁধ সংস্কারের কথা উল্লেখ করে, যে বাঁধটি বহুকাল পূর্বে নির্মিত হয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নির্দেশে। রুদ্রদামার রাজ্যের এলাকার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সম্ভবত নাসিক ও পুনা জেলাদ্বয় ছাড়া পূর্বতন ক্ষহরাত এলাকার সবটাই রুদ্রদামা দখল করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি দক্ষিণ পঞ্জাব এলাকার যৌধেয় ট্রাইবকে পরাজিত করেছিলেন।

রুদ্রদামার পর পশ্চিম ভারতের শক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। আমরা এখানে পরবর্তী শক ক্ষত্রপদের একটি তালিকা দিচ্ছি। রুদ্রদামার মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র দামজদশ্রী বা দাম্যসদ যিনি ১৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এর পর পালাক্রমে রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র জীবদামা ও ভাই রুদ্রসিংহ ১৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই উভয়ের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক বজায় ছিল যার সুযোগ নিয়েছিলেন সাতবাহনরাজ যজ্ঞ সাতকর্ণি, যিনি তাদের দক্ষিণদিকের এলাকাগুলি আবার দখল করেছিলেন। এই বিরোধের সুযোগ নিয়ে ঈশ্বরদত্ত নামক আর একজন ভাগ্যান্বেষীও লাভবান হয়েছিলেন, যিনি বেশ কিছুটা এলাকায় নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করে মহাক্ষত্রপ আখ্যা নিয়েছিলেন। পরবর্তী শক ক্ষত্রপগণ ছিলেন যথাক্রমে প্রথম রুদ্রসেন (২০০-২২২ খৃঃ), সংঘদামা (২২৩-২২৪ খৃঃ), দামসেন (২২৪-২৩৬ খৃঃ), যশোদামা (২৩৮ খৃঃ), বিজয়সেন (২৩৯-২৫০ খৃঃ), তৃতীয় দামজদশ্রী (২৫১-২৫৫ খৃঃ), দ্বিতীয় রুদ্রসেন (২৫৫-২৭৬ খৃঃ), ভর্তৃদাম (২৮২-২৯৫ খৃঃ) ইত্যাদি।

১০ ॥ দক্ষিণাপথ : সাতবাহন অধিকার (৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দ—২২৫ খৃষ্টাব্দ)

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য মহীশূর পর্যন্ত যে বিস্তৃত ছিল তা আমরা দেখেছি। কিন্তু দক্ষিণাপথের প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস এখনও পর্যন্ত

অনেকটাই রহস্যাবৃত। কৃষ্ণা জেলার ভট্টিপ্রোলু নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি উৎকীর্ণ লিপিতে, যা ২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রচিত বলে কেউ কেউ অনুমান করেন, কুবেরক নামক এক রাজার নাম পাওয়া গেছে। দক্ষিণাপথের উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ মগধের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদর্ভ বা বেরার অঞ্চলে শুঙ্গরাজাদের যে প্রভাব ছিল তা আমরা আগেই দেখেছি।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের গোড়ার দিকে দক্ষিণাপথে আমরা একটি প্রবল রাষ্ট্র-শক্তির উত্থান দেখি। বিভিন্ন লেখমালায় দেখা যায় যাঁরা এই রাষ্ট্রশক্তির নির্মাতা ছিলেন তাঁরা নিজেদের সাতবাহন বলে পরিচয় দিতেন। এঁদেরই পুরাণসমূহে বলা হয়েছে অন্ধ্র বা অন্ধ্রভৃত্য। এই অন্ধ্রভৃত্য শব্দটির নানা অর্থ পণ্ডিতেরা করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে অন্ধ্রভৃত্য কথাটির দ্বারা এই বোঝাচ্ছে যে সাতবাহনেরা অন্ধ্রজাতীয় ছিল এবং তারা মৌর্যদের অধীন (ভৃত্য) ছিল; কেউ কেউ বলেন যে সাতবাহনেরা কন্নড়-উদ্ভব কোন জাতি ছিল যারা অন্ধ্রদের আনুগত্য স্বীকার করত। অধিকাংশ পুরাণেই কিন্তু সাতবাহন ও অন্ধ্রদের এক করে দেখা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে পুরাণসমূহ সাতবাহনদের একটি কুল বলে উল্লেখ করছে এবং অন্ধ্রদের বলছে জাতি। তারা একথাও বলছে যে সাতবাহন-কুলের নাম সাতবাহন নামক রাজা থেকে হয়েছে, এবং এরা সকলেই ছিল 'অন্ধ্রজাতীয়'। বিষয়টির মধ্যে আমরা কোন জটিলতা দেখি না। সরলভাবে যা প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে এই যে অ'ন্ধ্ররা ছিল একটি ট্রাইব, এবং সাত-বাহনেরা ছিল সেই ট্রাইবের একটি ক্লান, যারা পরে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন করে, এবং অন্ধ্রদের বাকি ক্লানগুলিকেও ওই ব্যবস্থায় নিয়ে আসে, যেমন করেছিলেন কুজুল কদফিস ইউচিদের চারটি গোষ্ঠীকে। বস্তুতই আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বৌধায়ন ধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে বসবাসকারী অন্ধ্র ট্রাইবদের উল্লেখ পাই। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে এই অন্ধ্র বা সাতবাহনেরা পুরোদস্তুর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তোলে, এবং তাদের রাজধানী হয় প্রতিষ্ঠান, বর্তমান ঔরঙ্গাবাদ জেলার পৈঠান।

পুরাণসমূহে বলা হয়েছে যে অন্ধ্রজাতীয় সিমুক মগধের শেষ কাণ্ববংশীয় রাজা সুশর্মাকে বধ করে পৃথিবী শাসন শুরু করেন। অনুমান করা যেতে পারে যে এই সিমুক মগধ অধিকৃত দক্ষিণাপথের কিছু অঞ্চল, এবং বিদিশা ও তার চারপাশের অঞ্চলসমূহ দখল করেছিলেন। মগধের কাণ্ব রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে সিমুকের রাজ্যলাভের তারিখ ধরা হয়েছে ৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। পুরাণসমূহের

বিবরণ অনুযায়ী সিমুকের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর ভাই কৃষ্ণ, যিনি আঠারো বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র সাতকর্ণি, এবং তাঁরও রাজত্বকাল ছিল আঠারো বছর। নাসিক পর্বতে প্রাপ্ত একটি উৎকীর্ণ লিপিতে সাতবাহন-কৃষ্ণের নাম আছে। উল্লিখিত সাতকর্ণি, যাঁকে আমরা অতঃপর প্রথম সাতকর্ণি বলে উল্লেখ করব, তাঁর পত্নী নায়নিকার (নাগ-অন্নিকা) আদেশে উৎকীর্ণ নানাঘাট লেখমালায় উল্লিখিত হয়েছেন। এই লেখমালা সাতবাহন ইতিহাসের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপিতে বলা হয়েছে যে প্রথম সাতকর্ণির রাজ্যের সীমা কলিঙ্গের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে দক্ষিণাপথের উত্তরাঞ্চল এবং মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ প্রথম সাতকর্ণির রাজ্যের এলাকায় ছিল, এছাড়া উত্তর কোংকন ও সৌরাষ্ট্রেও তাঁর প্রভাব ছিল। তবে প্রথম সাতকর্ণির পর শেষোক্ত দুই স্থানে সাতবাহন-শক্তির লোপ ঘটেছিল যার ইঙ্গিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে আছে, যেখানে বলা হয়েছে দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি যখন জ্যেষ্ঠ সারাগানুসের হাতে ছিল তখন গ্রীক জাহাজগুলির কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু ওইগুলি সান্দারেসের হাতে যাবার পর অসুবিধা ঘটছিল। জ্যেষ্ঠ সারাগানুস নিঃসন্দেহে প্রথম সাতকর্ণি। প্রতিদ্বন্দ্বী শকেদের হাতে সম্ভবত তখন সাতবাহনদের পরাজয় ঘটেছিল।

প্রথম সাতকর্ণি এবং তাঁর পরবর্তী শক্তিমান রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মধ্যবর্তী অনেক রাজার নাম পুরাণসমূহে বর্তমান, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম অবশ্য অন্য সূত্র থেকেও পাওয়া গেছে। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে শক-যবন-পহ্লব-নিসূদন এবং সাতবাহন কুল-যশঃ-প্রতিষ্ঠাপন-কর বলে অভিহিত করেছিলেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে শক-যবন-পহ্লবদের পরাস্ত করে তিনি সাতবাহনকুলের যশ ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি যে ক্ষহরাত গোষ্ঠীয় ক্ষত্রপ নহপানকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন ১২৪-২৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ, তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নাসিক এবং পুণায় প্রাপ্ত গৌতমীপুত্রের লেখমালাসমূহ থেকে জানা যায় যে ওই দুই অঞ্চল থেকে তিনি নহপানের জামাতা ঋষভদত্তকে উৎখাত করেছিলেন। তাঁর নাসিক প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে অপরান্ত (উত্তর কোংকন), অনূপ (নর্মদার মহেশ্বর অঞ্চল), সুরাষ্ট্র (সৌরাষ্ট্র), কুকর (গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চল), অকার (পূর্ব মালব) এবং অবন্তী (পশ্চিম

মালব) গৌতমীপুত্রের অধিকারে এসেছিল। এই সকল অঞ্চলে নহপান পূর্বে শাসন করতেন। নাসিক জেলারই জোগলথেম্বি নামক স্থানে নহপানের প্রচুর মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলির উপর গৌতমীপুত্রের ছাপ দেখে অনুমিত হয় যে তিনি ওই মহাক্ষত্রপের কোষাগারও অধিকার করেছিলেন। উপরিউক্ত এলাকাগুলি ছাড়াও গৌতমীপুত্র ঋষিক (উত্তর কৃষ্ণা অঞ্চল), অশ্মক (প্রাক্তন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বোধন অঞ্চল), মূলক (গোদাবরী অঞ্চল) এবং বিদর্ভে (বেরার) গৌতমীপুত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গৌতমীপুত্রের রাজত্বকাল মোটামুটি ১০৬ থেকে ১৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁকে বেশ কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল, কেননা ক্ষহরাত শকদের কাছ থেকে তিনি যে বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেছিলেন তার অধিকাংশ তাঁর হস্তচ্যুত হয়েছিল কার্দমক শকনেতা রুদ্রদামার হাতে। ১৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত রুদ্রদামার জুনাগড় লিপিতে বলা হয়েছে যে গোবর্ধন এবং মামল জেলাদ্বয় ছাড়া নহপানের সমস্ত এলাকাই সাতকর্ণির কাছ থেকে রুদ্রদামা জয় করে নিয়েছিলেন। এই সাতকর্ণি নিঃসন্দেহে গৌতমীপুত্র। কানহেরি লিপির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যেখানে রুদ্রদামার কন্যার সঙ্গে গৌতমীপুত্রের এক পুত্রের বিবাহের কথা আছে। অনুমান করা যেতে পারে যে গৌতমীপুত্র কার্দমক শকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর অধিকৃত কিছু কিছু শক এলাকা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

পুরাণসমূহ অনুযায়ী গৌতমীপুত্রের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর পুত্র পুলোমা, অর্থাৎ বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমাবি, যাঁর রাজত্বকাল মোটামুটি ১৩০ থেকে ১৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়েছে। তাঁর লেখমালাসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে নাসিক, কার্লে, অমরাবতী এবং কৃষ্ণা জেলায়। তিনি সাতবাহন রাজ্যকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। বেলারী জেলাটিও তাঁর সময় সাতবাহন অধিকারে আসে। এই সকল অঞ্চলে তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে।

বাসিষ্ঠীপুত্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন শিবশ্রী সাতকর্ণি (১৫৯-৬৬ খৃষ্টাব্দ) যাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলাদ্বয়ে। পুরাণসমূহ অনুযায়ী পরবর্তী রাজা ছিলেন শিবস্কন্দ সাতকর্ণি (১৬৭-৭৪ খৃষ্টাব্দ) ও যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি (১৭৪-২০৩ খৃষ্টাব্দ)। যজ্ঞশ্রী বা যজ্ঞ সাতকর্ণির লেখমালা পাওয়া গেছে নাসিক, কানহেরি, এবং কৃষ্ণা জেলায়। তাঁর মুদ্রাও পাওয়া গেছে কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলাদ্বয়ে, মধ্য প্রদেশের চান্দ জেলায়, বেরার, উত্তর কোংকন, বরোদা

এবং সৌরাষ্ট্রে। তাঁর রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে বর্তমান মহারাষ্ট্রের সোপারা অঞ্চলে যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে অপরান্ত বা উত্তর কোংকন অঞ্চল থেকে তিনি শকদের পরাস্ত করে নিজ অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন, শক ক্ষত্রপ জীবদামা ও রুদ্রসেনের বিরোধের সুযোগ নিয়ে। কিন্তু যজ্ঞই ছিলেন এই বংশের শেষ শক্তিমান রাজা। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন যথাক্রমে বিজয় (২০৩-০৯ খৃঃ), চন্দ্রশ্রী (২০৯-২১৯ খৃঃ) এবং পুলোমা (২১৯-২২৭ খৃঃ)। সাতবাহনদের একটি শাখা রাজত্ব করত কুন্তল অঞ্চলে, অর্থাৎ বর্তমান উত্তর কানাড়া জেলায় এবং মহীশূর, বেলগাঁও ও ধারওয়ারের কিছু কিছু অংশে। এই শাখার কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ঠিক কবে থেকে এই শাখা রাজত্ব করেছে তা বলা না গেলেও, এদের একজন রাজা অন্যভাবে অর্থাৎ সাহিত্য-কর্মের দ্বারা বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গাথা-সপ্তশতীর লেখক হাল। হালের উল্লেখ বাৎস্যায়নের কামসূত্রে আছে কুন্তল-সাতকর্ণি হিসাবে, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসাতেও তাঁর উল্লেখ আছে। পুরাণসমূহে অবশ্য তাঁকে গৌতমীপুত্রের পূর্ববর্তী বলা হয়েছে।

১১ ॥ পূর্ব-দক্ষিণ ভারত : কলিঙ্গ ও চেদিবংশ

পূর্ব-দক্ষিণ ভারত বলতে আমরা মোটামুটিভাবে বর্তমান উড়িষ্যা এবং তার চারদিকের অঞ্চলকেই বোঝাচ্ছি। মগধের নন্দবংশের রাজারা এবং পরে অশোক এই অঞ্চলের কলিঙ্গ ট্রাইবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং অশোকের সময় থেকেই এই এলাকাটি পাকাপাকিভাবে মগধ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সুযোগ নিয়ে চেদি ক্লানের মহামেঘবাহন বংশোদ্ভূত খারবেল উড়িষ্যা অঞ্চলে একটি শক্তিমান রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়গিরি পাহাড়ে এই খারবেল একটি দীর্ঘ লেখমালা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন, যা হাতিগুম্ফা প্রশস্তি নামে বিখ্যাত। এখান থেকেই খারবেলের ব্যাপক ক্রিয়াকলাপের কথা জানতে পারা যায়।

ষোল বছর বয়সে খারবেল যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হন। মহামেঘবাহন বংশের তিনি ছিলেন তৃতীয় রাজা। তাঁর পিতার নাম ছিল বক্রদেব। চব্বিশ বছর বয়সে খারবেল মহারাজ, কলিঙ্গাধিপতি ও কলিঙ্গ-চক্রবর্তী উপাধি নেন। তিনি ললাক-বংশের হস্তিসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে তিনি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন এবং কৃষ্ণবেনা (কৃষ্ণা) নদীর তীরে উপনীত হন,

যার ফলে কোন একটি ঋষিকনগরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কলিঙ্গের পশ্চিমে সাতবাহনদের রাজত্ব ছিল, এবং খারবেলের লিপিতে সাতবাহনরাজ প্রথম সাতকর্ণির উল্লেখও রয়েছে, কাজেই অনুমান করা যায় যে সাতবাহনদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, এবং সেই কারণেই তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সাতবাহন এলাকার মধ্য দিয়েই কৃষ্ণা অঞ্চলে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরে খারবেল বিদ্যাধর নামক এক রাজাকে, এবং বেরার অঞ্চলের রাষ্ট্রীক ও ভোজক ট্রাইবদের পরাজিত করেন। অষ্টম বছরে তিনি বরাবর পাহাড়ের গোরথগিরি দুর্গ অধিকার করেন এবং রাজগৃহ নগর আক্রমণ করেন। খারবেলের ভয়ে ভীত হয়ে দিমিত নামক একজন গ্রীক শাসক মথুরা অঞ্চলে পালিয়ে যান। এই দিমিত নিঃসন্দেহে ডিমিট্রিয়াস, কিন্তু ইনি কোন্ ডিমিট্রিয়াস তা বলা যায় না। ইনি নিশ্চয়ই ইউথাইডেমাসের পুত্র নন। তাঁর রাজত্বের একাদশ বর্ষে খারবেল পিথুড় নামক একটি শহর ধ্বংস করেন। পরবছর তিনি মগধরাজ বহসতিমিতকে (বৃহস্বাতিমিত্র) পরাজিত করেন। এই বৃহস্বাতিমিত্রের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। পভোসা লেখমালাসমূহে এঁকে আষাঢ়সেনের ভাগ্নে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত মগধের মিত্র-উপাধিধারী রাজাদের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক ছিল। কোন এক নন্দ রাজা কলিঙ্গ থেকে একটি জিনমূর্তি নিয়ে গিয়েছিলেন, খারবেল সেই মূর্তি কলিঙ্গে ফিরিয়ে আনেন। খারবেল সুদূর দক্ষিণের প্যাণ্ড্যদেরও পরাস্ত করেছিলেন।

খারবেল তাঁর লিপিতে নিজেকে প্রজারঞ্জক রাজা বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি জৈন ছিলেন, কুমারী-পর্বতে (খণ্ডগিরি) জৈন সাধুদের জন্য অনেকগুলি গুহা খনন করিয়েছিলেন। পাভার নামক স্থানে তিনি একটি জৈন মঠও প্রতিষ্ঠা করেন। জৈন গ্রন্থসমূহে তাঁকে ভিক্ষু-রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খারবেলের তারিখ নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। কোন কোন পণ্ডিত তাঁকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে স্থান দিতে চান, কিন্তু বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে তিনি আরও পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মহারাজাধিরাজ উপাধিগ্রহণ প্রমাণ করে যে তিনি তা করেছিলেন ইন্দোগ্রীক-দের অনুকরণে, এবং সেই হিসাবে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পরে। তাঁর সমকালীন মগধরাজ বৃহস্বাতীমিত্র শুঙ্গ বা কাণ্ববংশের কেউ নন, এবং তিনি নিশ্চয়ই পুষ্যমিত্র শুঙ্গের (১৮৭-১৫১ খৃঃ পূঃ) পরবর্তী। হাতিগুম্ফা লেখমালার ধরণ

বেসনগর (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) লেখমালার চেয়ে অর্বাচীন। খারবেলের সাতবাহন সমকালীন প্রথম সাতকর্ণি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এছাড়া খোদ হাতিগুম্ফা লিপিতেই খারবেলের সময়ের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে লেখা আছে জনৈক নন্দ রাজা একটি খাল খনন করিয়াছিলেন এবং তার তিনশো বছর পর খারবেল, তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে, তা সংস্কার করেন (নন্দরাজ-ত্রি-বর্ষ-শতোদ্ঘাটিত)। এবং এই হিসাবে আমরা সুনিশ্চিতভাবেই, অপরাপর সাক্ষ্য মিলিয়ে, খারবেলকে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে স্থান দিতে পারি।

খারবেলের পর কলিঙ্গ অঞ্চলের ইতিহাস অন্ধকারময়। অনুমান করা যায় যে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, অর্থাৎ উড়িষ্যা অঞ্চল বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

১২ ॥ সুদূর দক্ষিণ

সুদূর দক্ষিণ বলতে আমরা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণাঞ্চলকে বুঝছি। অশোকের লিপিতে সুদূর দক্ষিণের চারটি ট্রাইব-এলাকার কথা উল্লিখিত হয়েছে যেগুলি মৌর্যসাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। সাতিয়পুত্র ছাড়া বাকি তিনটি ট্রাইব ও তাদের অঞ্চলগুলিকে আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি, চোলেরা বাস করত কাবেরী-বদ্বীপ এবং তার সন্নিহিত এলাকাসমূহে, পাণ্ড্যরা বাস করত তার নীচে ভারতের সর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে, এবং চেরগণ (কেরলপুত্র) বাস করত পশ্চিম উপকূল বরাবর। এই তিনটি শক্তির সংঘাতই সুদূর দক্ষিণের রাজনৈতিক ইতিহাসকে চিহ্নিত করেছে।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খৃষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত এই দুশো বছর ছিল চোলদের অগ্রগতির যুগ। প্রথম উল্লেখযোগ্য যে চোলরাজার নাম আমরা পাই, তিনি হচ্ছেন করিকাল, যিনি তাঞ্জোরের নিকটবর্তী বেন্নি নামক স্থানে পাণ্ড্য ও চেরদের একটি যুগ্মবাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন এবং সিংহল অভিযান করেছিলেন। তামিল সাহিত্যে তাঁর বিষয়ে প্রচুর প্রশংসা আছে, বিশেষ করে খালখননের মত জনহিতকর কাজ এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি বিখ্যাত।

করিকালের বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন কাঞ্চির শাসক হিসাবে তোণ্ডাইমন ইড়ান্দিরইয়নের নাম পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন ইনি করিকালের পৌত্র,

আবার কেউ কেউ বলেন অন্য কোন বংশের এক স্বাধীন শাসক। এঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

পাণ্ড্যরাজদের মধ্যে আমরা মুদুকুড়ুমি পেরুবঢ়ই-এর নাম পাই আদি রাজা হিসাবে, অবশ্য অনেককাল পরে রচিত একটি উৎকীর্ণ লিপিতে। তবে তাঁরই বংশের নেড়ুঞ্জেড়িয়ন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, যিনি চোল এবং চের ও তৎসহ পাঁচটি ট্রাইবের একটি সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন তলইয়ালঙ্গানম নামক স্থানে। এছাড়া তিনি কোঙ্গু ও নীড়ুর ট্রাইবদ্বয়কে পরাস্ত করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তামিল সাহিত্যে সশ্রদ্ধভাবে উল্লিখিত হয়েছেন।

চেরদের কোন রাজাই চোল করিকাল বা পাণ্ড্য নেড়ুঞ্জেড়িয়নের মত বিখ্যাত হননি। পরবর্তীকালে দক্ষিণে তোণ্ডাইমণ্ডলম, অর্থাৎ কাঞ্চীর চার-পাশের অঞ্চলে পল্লব নামক নূতন এক রাষ্ট্রশক্তির উদয় হয়, পরবর্তী ভারত ইতিহাসে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

সুদূর দক্ষিণে কিভাবে ট্রাইবাল ব্যবস্থা ভেঙে রাষ্ট্রশক্তির পত্তন হয়েছিল তার কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। তবে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে তামিল অঞ্চল বহির্বাণিজ্যের ফলে আর্থিক দিক থেকে যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে তামিলভূমিকে ডামিরিকা নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই অঞ্চলের বন্দর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং এইসকল স্থান থেকে প্রচুর দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করার কথাও বলা হয়েছে। পাণ্ড্য দেশের উপকূল অঞ্চল মুক্তার জন্য বিখ্যাত ছিল যার কথা বিদেশী লেখকেরা উল্লেখ করেছেন। সুদূর দক্ষিণে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার মূলে এই বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তও অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তী যুগেও বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত থেকে তামিলভূমি যে বঞ্চিত হয়নি, এবং সেই উদ্বৃত্তের একটা অংশ যে বিরাট বিরাট মন্দির গড়তে ব্যয়িত হয়েছিল তা আমরা পরে দেখব।

চতুর্থ অধ্যায়

গুপ্ত যুগ

১॥ প্রাক্‌-গুপ্ত ভারতের রাজনৈতিক চিত্র

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর, যা আমরা আগে দেখলাম, ভারতে মাঝে মাঝে বিভিন্নপ্রান্তে রাজশক্তির উদয় হয়েছে, কুষাণ ও সাতবাহন ছাড়া যেগুলির অস্তিত্ব ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। এমন কি কুষাণ ও সাতবাহনেরাও বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে দীর্ঘকাল শাসন করতে পারেনি, তাদের কোন শক্তিমান রাজার সময়, যেমন কণিষ্ক বা গৌতমীপুত্রের সময়, রাজত্বের সীমারেখা বেড়েছে, আবার পরে তা ছোট হয়ে গেছে। কুষাণ, শক, চেদি ও সাতবাহন—যাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যগুলি আমরা আগেই দিয়েছি—স্পষ্টতই কয়েক পুরুষের মধ্যে ট্রাইবাল দশা থেকে রাষ্ট্রশক্তিতে উন্নীত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা তারা বজায় রাখতে পারেনি। তাদের রাষ্ট্রশক্তি ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু তার জায়গায় পুরাতন ট্রাইবাল ব্যবস্থা আর ফিরে আসেনি, বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাক্কাল পর্যন্ত সারা ভারত জুড়েই আমরা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তির নিদর্শন পাই যেগুলি খুব সহজেই গুপ্তদের পদানত হয়েছিল। এরা ছাড়া কিছু স্বাধীন ট্রাইব তখনও ভারতবর্ষের এখানে ওখানে বর্তমান ছিল, যাদের মধ্যে 'ভিতর থেকেই' রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল এবং তারই ফলে—এমন ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে বলে আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি—তারা কয়েকটি সাধারণতন্ত্রের পত্তন করেছিল, যেগুলিও কিন্তু গুপ্তদের আগ্রাসনের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। আমরা এলাকা ধরে ধরে বাস্তব অবস্থাটা কি ছিল তা দেখার চেষ্টা করব।

উত্তর-পশ্চিম ভারত : পরবর্তী কুষাণগণ ঃ বাসুদেবের পর কুষাণদের বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙে যায়, এবং তারও পরে হিন্দুকুশের উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলি কুষাণদের কাছ থেকে সাসানীয়দের অধিকারে আসে। প্রথম সাসানীয় সম্রাট

আর্দাসির (২২৪-২৪২ খৃষ্টাব্দ) ওই এলাকাগুলি জয় করেন, এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা নিজেদের কুষাণ-শাহ, অর্থাৎ কুষাণদের রাজা বলে অভিহিত করতেন। দ্বিতীয় শা'পুরের রাজত্বকালে কুষাণদের হাত থেকে আরও বহু এলাকা চলে যায়, এবং কাবুল উপত্যকা এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশে তারা কোনক্রমে টিঁকে থাকে। চৈনিক গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে কি-তো-লো নামক একজন ইউ চি সর্দার কুষাণদের মধ্যে কিছুটা নবজীবনের সঞ্চার করেন এবং ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তিনি স্থাপন করতে সমর্থ হন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে যার উপর ব্রাহ্মী হরফে কিদার-কুষাণ-শাহ উৎকীর্ণ আছে। এই কিদার সম্ভবত চৈনিক লেখকগণ বর্ণিত কি-তো-লো। ইনি সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন ছিলেন, অর্থাৎ চতুর্থ শতকের শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন। সাসানীয়রাজ দ্বিতীয় আর্দাসির (৩৭৯-৩৮৩) এবং তৃতীয় শা'পুরের (৩৮৩-৩৮৮) হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তিনি ভাল সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সম্ভবত তিনিই উল্লিখিত হয়েছিলেন দৈবপুত্র-শাহী শাহানুশাহীরূপে।

পশ্চিম ভারত : শক ক্ষত্রপগণ : আমরা ইতিপূর্বে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমভারতের শক ক্ষত্রপদের একটি তালিকা দিয়েছি। মালব, গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ে চষ্টনের বংশ প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করেছিল। ৩০৪-০৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভিন্নবংশীয় দ্বিতীয় রুদ্রসিংহ চষ্টনের শেষ বংশধরকে হটিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করেন। তবে তিনি এবং তাঁর পুত্র দ্বিতীয় যশোদামা কেউই মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন নি, তাঁরা ক্ষত্রপ উপাধিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এঁরা উভয়ে রাজত্ব করেছিলেন ৩৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৩৩২ থেকে ৩৪৮ এই ষোল বছর সময়ের মধ্যে তাঁদের বংশের কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি যা থেকে অনুমিত হয় যে এই সময়টায় কিছু গোলমাল চলছিল, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহও দেখা দিয়েছিল, যার পরোক্ষ প্রমাণ কয়েকটি লেখমালা থেকে পাওয়া যায়। হয়ত এইগুলিরই ফলে এই বংশের উৎখাত ঘটে, এবং জনৈক মহাক্ষত্রপ স্বামী তৃতীয় রুদ্রসেন ক্ষমতায় আসেন। তৃতীয় রুদ্রসেনকে বাইরের শক্তিগুলির তরফ থেকে—একদিকে সাসানীয়, অপরদিকে বাকাটক, এবং গুপ্তদেরও—আক্রমণ সহ্য করতে হয়, এবং ভিতরের জ্ঞাতিশত্রুরাও তাঁকে দুর্বল করে দেয়। তাঁর ভাগ্নে স্বামী সিংহসেনের কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে যাতে তাঁর উপাধি মহাক্ষত্রপ বলা হয়েছে, এবং এ থেকে অনুমান করা হয় যে তৃতীয় রুদ্রসেন ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছিলেন।

এরপর আমরা আর একজন মহাক্ষত্রপের উল্লেখ পাই যাঁর নাম স্বামী (তৃতীয়) রুদ্রসিংহ, যাঁর মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে তিনি ৩৮৮ থেকে ৩৯৮এর মধ্যে কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন। গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের হাতে এঁর পরাজয়ের পর শক ক্ষত্রপেরা ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে কার্যত অদৃশ্য হয়ে যান।

উত্তর ভারত : ট্রাইবসমূহ ঃ বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে রাজস্থান ও তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে আর্জুনায়ন, উদ্দেহিক, মালব, শিবি, রাজন্য, যৌধেয় প্রভৃতি ট্রাইবসমূহ শক ও কুষাণদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। পরে কুষাণদের অবক্ষয়ের যুগে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে, এই ট্রাইবগুলি, বিশেষ করে আর্জুনায়ন, মালব ও যৌধেয়গণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এরা ছাড়া আরও কয়েকটি ট্রাইব ছিল, যেমন পাঞ্জাব অঞ্চলে মদ্র, কুনিন্দ, কুলূত ও আরও পূর্বদিকে ঔডুম্বর, বেমকি, রাজস্থানে আভীর, উত্তর ও মধ্য প্রদেশে নাগ প্রভৃতি।

এই সকল ট্রাইবের মধ্যে আর্জুনায়নদের মুদ্রা পাওয়া গেছে যা থেকে অনুমিত হয় যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকেই তাদের এলাকা ছিল রাজস্থানের ভরতপুর ও আলোয়ার এবং আগ্রা ও মথুরার পশ্চিমাঞ্চল। এরা গোড়ায় শক ও কুষাণদের বশ্যতা স্বীকার করলেও পরে স্বাধীন হয়ে যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এরা আবার গুপ্তদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

মালবেরা আগে পাঞ্জাব অঞ্চলে বাস করত, পরে তাদের একটা বড় অংশ রাজস্থানে বসতি স্থাপন করে, এবং তাদের কেন্দ্র হয় মালবনগর যা জয়পুরের উনিয়ারে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তারা তাদের প্রতিবেশী ট্রাইব আজমীর অঞ্চলের উত্তমভদ্রদের সঙ্গে এবং পরে তারা পশ্চিমভারতের শকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। মালবদের একটি শাখা ঔলিকররা মান্দোসোর অঞ্চলে পরবর্তী কালে শক্তিশালী হয়েছিল, এবং রাজা যশোধর্মা (৫৩২ খৃঃ) এই শাখারই লোক ছিলেন। সে যাই হোক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে মালবেরা গুপ্তদের অধীনতা স্বীকার করে। এই মালবদেরও বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে।

যৌধেয়রা বাস করত পূর্ব পাঞ্জাবে এবং উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের কোন কোন স্থানে। তাদের বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলির একশ্রেণীর উপর যৌধেয়-গণস্য-জয়ঃ লেখা আছে। তাদের একটি উৎকীর্ণ লিপিও পাওয়া গেছে ভরত-পুরের বিজয়গড়ে যা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত। সম্ভবত যৌধেয়গণ একবার

শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামার নিকট পরাজিত হয়েছিল। তাঁর জুনাগড় লিপিতে রুদ্রদামা যৌধেয়দের যোদ্ধা এবং গর্বিত ট্রাইব বলে উল্লেখ করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে কুষাণশক্তির পতন ঘটানোর পিছনে যৌধেয়দের অবদান ছিল। গুপ্ত যুগে যৌধেয়রা গুপ্তদের কাছে আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।

উত্তর ভারত : রাজতন্ত্রসমূহ ঃ আর্জুনায়ন, মালব ও যৌধেয়গণ ট্রাইবাল পর্যায় থেকে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু নাগদের ক্ষেত্রে ট্রাইবাল দশা থেকে রাজতন্ত্রে 'উত্তরণ' ঘটেছিল। নাগেরা খুব প্রাচীন ট্রাইব, তাদের শাখা প্রশাখা ছিল বহু এবং ভারতের নানা স্থানে। কাজেই তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বত্রই একরকম ছিল না। সব নাগ ট্রাইবই আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা শুধু তাদেরই কথা বলব যারা কুষাণদের পতনের যুগে উত্তর ভারতের কয়েকটি স্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল, এবং যারা গুপ্তদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

কুষাণদের পতনের যুগে চারটি নাগ রাজবংশের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিদিশা, কান্তিপুর, মথুরা ও পদ্মাবতীতে। এদের অস্তিত্বের স্বপক্ষে লেখমালা ও মুদ্রার প্রমাণও বর্তমান। কুষাণদের পতনের যুগে নাগদের ভারশিব শাখার রাজারা প্রতিপত্তি অর্জন করেন। এঁরা বাস করতেন পদ্মাবতীতে অর্থাৎ বর্তমান গোয়ালিয়র অঞ্চলে। পদম-পবয়াতে (প্রাচীন পদ্মাবতী নগরের আধুনিক নাম) ভবনাগ নামক নাগবংশীয় রাজার নাম পাওয়া গেছে। পুরাণসমূহের মতে পদ্মাবতীতে নয়জন নাগরাজা রাজত্ব করেছিলেন। ওই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মুদ্রায় ভীমনাগ, স্কন্দনাগ, বৃহস্পতি নাগ, দেবনাগ প্রভৃতি রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূরাণসমূহের মতে কুষাণদের পর সাতজন নাগ রাজা মথুরায় রাজত্ব করেছেন। কিন্তু মথুরায় প্রাপ্ত বিভিন্ন মুদ্রায় নাগ উপাধিযুক্ত কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। ওখানে প্রাপ্ত আদি মুদ্রাগুলি, যেগুলি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে প্রচলিত হয়েছিল বলে অনুমিত, রাজাদের নামের সঙ্গে মিত্র উপাধি বহন করে, যেমন গোমিত্র, ব্রহ্মমিত্র, দৃধমিত্র, সূর্যমিত্র ও বিষ্ণুমিত্র এবং পরবর্তীকালের মুদ্রাগুলি দত্ত উপাধিযুক্ত, যেমন উত্তমদত্ত, রামদত্ত, কামদত্ত, ভবদত্ত ও বলভূতি। এরা সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গুপ্তরাজা সমুদ্রগুপ্ত যে আর্যাবর্তের রাজাদের উৎখাত করেছিলেন বলে তাঁর লিপিতে দাবি করেছেন তাঁদের মধ্যে দুজন নাগ বর্তমান, গণপতিনাগ এবং নাগসেন।

অহিচ্ছত্র, বর্তমান বেরিলী জেলার (উত্তর প্রদেশ) রামনগর, আদিতে ছিল উত্তর পঞ্চালের রাজধানী। এখান থেকে বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। সেগুলির বিস্তৃত উল্লেখের প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু অহিচ্ছত্র থেকে প্রাপ্ত দু' ধরনের তাম্রমুদ্রার কথা উল্লেখ করব, যেগুলিতে অচ্যুত নামে একজন রাজার নাম উল্লেখ আছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে তিনি আর্যাবর্তের রাজাদের মধ্যে অচ্যুত নামের একজনকে পরাজিত করেছিলেন, এবং তিনি সম্ভবত এই মুদ্রায় উল্লিখিত অচ্যুত।

অযোধ্যাতেও (উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলা) কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলিতে বিভিন্ন রাজার নাম লেখা আছে, এবং যেগুলি খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। যে মুদ্রাগুলিকে কুষাণদের অবক্ষয়ের যুগে ফেলা হয় সেগুলিতে সত্যমিত্র, আয়ুমিত্র, সংঘমিত্র, বিজয়মিত্র, দেবমিত্র, অজবর্মা ও কুমদসেনের নাম আছে। সম্ভবত শেষোক্তের আমলেই অযোধ্যা অঞ্চল গুপ্তদের অধিকারে আসে।

কৌশাম্বীতে (এলাহাবাদের নিকটস্থ কোশাম) মঘ নামক কুষাণদের এক সেনাপতি স্বাধীন একটি রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। এই রাজত্বের বিস্তৃতির সংবাদ এবং কয়েকজন রাজার নাম বিভিন্ন লেখমালায় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত কৌশাম্বী যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য গুপ্তদের আমলে কৌশাম্বীর স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হয়নি।

দক্ষিণ ভারত: সাতবাহনদের পর: সাতবাহনদের পতনের পর দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ দেখা যায়। এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আভীরদের। আভীরগণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই ট্রাইবাল পর্যায় পার হয়ে গিয়েছিল। আদিতে তারা শক ক্ষত্রপদের বশ্যতা স্বীকার করত, এবং শকেরা দুর্বল হয়ে যাবার পর থেকে তারা স্বাধীন হয়ে যায়, এবং সাতবাহন শক্তির অবক্ষয়ের সুযোগে তারা সাতবাহনদের অধিকৃত কিছু কিছু অঞ্চল জয় করে। এই প্রসঙ্গে আভীররাজ মাঠরিপুত্র ঈশ্বরসেনের নাম করা যায়, যার অধিকার নাসিক অঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে তাঁর একটি লেখমালা পাওয়া গেছে। পুরাণসমূহে বলা হয়েছে যে দশজন আভীর রাজা ৬৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরসেনের বংশ-

ধরদের বিষয় কিছু জানা যায় না। চতুর্থ শতকেও যে আভীরেরা বর্তমান ছিল তার প্রমাণ চন্দ্রবল্লী লেখমালা, যাতে বলা হয়েছে যে তারা কদম্বরাজা ময়ুরশর্মার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে বলা হয়েছে যে আভীরেরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

দক্ষিণাপথের উত্তর পশ্চিমে বোধি নামক একটি ট্রাইব বাস করত শকদের অধীনে। শকদের অবক্ষয়ের যুগে এরা স্বাধীন হয়ে যায়, এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক নাগাদ। বোধি রাজাদের কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে যা থেকে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়—শিববোধি, চন্দ্রবোধি ও বীরবোধি। এদের পরবর্তী ইতিহাস কিছু জানা যায় না।

মস্থলিপতম এলাকায় অর্থাৎ কৃষ্ণা জেলার বান্দর তালুকে বৃহৎফলায়নরা একটি রাজবংশ গড়ে তোলে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষের দিকে। এই বংশের একজন রাজার নাম পাওয়া গেছে তাঁর কোণ্ডমুনি লেখমালা থেকে। তিনি হচ্ছেন জয়বর্মা। ইনি সম্ভবত ইক্ষ্বাকুদের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, কিন্তু পরে স্বাধীন হয়ে যান। পরবর্তীকালে ইক্ষ্বাকু ও বৃহৎফলায়ন উভয় শক্তিই কাঞ্চীর পল্লবদের অধীনে আসে।

প্রাক্তন সাতবাহন রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর নিম্নাঞ্চলে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের গোড়ার দিকে ইক্ষ্বাকুরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের প্রথম রাজা প্রথম শান্তমূল তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর কয়েকটি লেখমালা পাওয়া গেছে। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র মাঠরিপুত্র বীরপুরুষদত্ত যিনি তৃতীয় শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর লেখমালা পাওয়া গেছে অমরাবতী, জগ্‌গয়পেত ও নাগার্জুনিকোণ্ড থেকে। তাঁর পুত্র এহুবুল দ্বিতীয় শান্তমূল তাঁর উত্তরাধিকারী হন এবং এগারো বছর রাজত্ব করেন। ইক্ষ্বাকুদের এলাকাসমূহ পরে পল্লবদের হাতে চলে যায়।

দক্ষিণাপথের মধ্যাঞ্চলে সাতবাহনদের পর বাকাটকেরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে বিন্ধ্যশক্তি নামক এক রাজার নেতৃত্বে। পুরাণসমূহে বিন্ধ্যশক্তি ও বাকাটকদের উল্লেখ আছে, তবে তাঁর নিজের কোন লেখমালার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তীকালের অজন্তা-লিপিতে তাঁর নাম আছে। বিন্ধ্যশক্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র হারিতীপুত্র প্রবর সেন, যিনি প্রথম প্রবরসেন নামে অধিকতর পরিচিত। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বাকাটক রাষ্ট্রশক্তিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। পরবর্তী ইতিহাসে

বাকাটকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, এবং সে কথা আমরা অন্যত্র বলব।

গুপ্ত রাজারা দক্ষিণাপথ এবং সুদূর দক্ষিণের উপর কোন প্রত্যক্ষ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেননি, সম্ভবত প্রশাসনিক কারণে। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণভারতে অভিযান চালিয়েছিলেন, এবং পরাজিত রাজাদের একটা আনুষ্ঠানিক আনুগত্য পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই কারণেই গুপ্ত যুগে দক্ষিণাপথে অনেক রাজনৈতিক ভাঙা-গড়ার ঘটনা ঘটেছে, অনেক নূতন রাজবংশ আবির্ভূত হয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে গুপ্ত রাজারা উত্তর থেকে কোন হস্তক্ষেপ করেননি। গুপ্ত যুগে দক্ষিণাপথে যে সকল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল সেগুলি আমরা একটি পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করব।

২॥ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি

তাহলে আমরা দেখলাম যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার আগে ভারতবর্ষ অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যে কারণে বৃহৎ শক্তির কাছে তারা সহজেই পদানত হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠনে ট্রাইবেরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, এবং দু-তিন পুরুষের মধ্যেই এক একটি ট্রাইব শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থাই নয়, পুরোদস্তর রাজতন্ত্র চালু করে দিয়েছে। কিন্তু অচিরেই তারা গুপ্তদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তার কারণ গুপ্তরা তুলনামূলকভাবে শক্তিমান ছিল। গুপ্তদের এই শক্তির অর্থনৈতিক ভিত্তিটাই আমাদের বিবেচ্য। এবং সেই সঙ্গে এও দেখা দরকার যে সেই ভিত্তির কোথায় ছিল দৃঢ়তা আর কোথায় ছিল শৈথিল্য।

গুপ্তরা যে এলাকায় শাসন করত তা ছিল মোটামুটি উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল যা ভারতের উর্বরতম এলাকা। গুপ্ত যুগেরও অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি, এবং গুপ্ত রাজগণ সুদৃঢ় প্রশাসন ব্যবস্থার দ্বারা ভূমিগত উৎপাদনের সর্বোচ্চ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যও গুপ্তদের অর্থনৈতিক শক্তিকে প্রচুর বাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে পঞ্চম শতক ভারতের বাইরে রোম সাম্রাজ্যের যুগ ছিল, এবং রোমের সঙ্গে ভারতের খুব জোরালো বাণিজ্য চলত। এই বাণিজ্য জলপথ ও স্থলপথ উভয় পথেই চলত এবং তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যই এই বাণিজ্যের ফল ভোগ করত। সার্বভৌম রাজা হিসাবে গুপ্তরা অপরাপর রাজাদের

কাছ থেকে কর হিসাবে ওই বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের ভাগ পেতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষিই।

আমাদের জানা আছে, গুপ্ত আমলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছিল, সাহেব পণ্ডিতেরা যে ঘটনাকে Brahmanical revivalism বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর তাৎপর্যটা খুব খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের অর্থ বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা, যার মূল কথা জাতিভেদ। এই আদর্শটি কি? ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন জাতি, যারা অবশ্যই সামগ্রিক জনসাধারণের তুলনায় ভগ্নাংশ, হচ্ছে দ্বিজ, আর বাকি সকলে শূদ্র যাদের কাজ ওই দ্বিজদের জন্য উৎপাদন করা। অর্থাৎ শূদ্ররা শ্রম করবে এবং তার ফলভোগ করবে দ্বিজরা। এই বিধানই মনু দিয়ে গিয়েছিলেন, এবং ক্রমাগত প্রচারের দ্বারা এই বিধানকে বিধির বিধানের চেয়ে অনেক বড় করে তোলা হয়েছিল। শূদ্ররা যে দ্বিজদের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শ্রম করবে, তার প্রতিদানে কি পাবে? এক্ষেত্রেও মনু বিধান দিয়ে গেছেন যে তারা পাবে উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জীর্ণ বসন। কী নিদারুণ বঞ্চনা ও অত্যাচারের মারফত লক্ষ লক্ষ শূদ্রের শ্রমে উচ্চবর্ণদের সম্পদ গড়ে উঠত এ থেকেই তা বোঝা যায়।

এইভাবে উচ্চবর্ণের লোকেরা যে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হত তা তারা কিভাবে ভোগ করত তা বাৎস্যায়নের কামসূত্রের নাগরক-পর্বাধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। গুপ্ত যুগকে ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়, কেননা কিছু কবি ও পণ্ডিত সেযুগে জন্মেছিলেন, শিল্পকলার উন্নতি সেযুগে কিছু হয়েছিল, কিন্তু এই স্বর্ণযুগের ফসল ভোগ করত বাৎস্যায়ন বর্ণিত ওই নাগরকেরাই, যারা নগরে বিলাসবহুল অট্টালিকায় বাস করত, প্রভাত থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যারা নানাবিধ ভোগে নিজেদের ব্যাপৃত রাখত, আর তাদেরই মনঃতুষ্টির জন্য ছিল সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা। স্বর্ণযুগই ছিল, কিন্তু তা ছিল মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর। অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান, মনু যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে :

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥ (১০।১২৫)

আর এইটাই ছিল রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তিগত দুর্বলতা, যা শুধু গুপ্তবংশকেই ভাসিয়ে দেয়নি, বহু রাজবংশকেই এর মূল্য দিতে হয়েছে ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে।

৩॥ গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা

গুপ্তবংশের প্রথম তিনজন রাজা যথাক্রমে মহারাজ শ্রীগুপ্ত, মহারাজ ঘটোৎকচগুপ্ত ও মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত নামে উল্লিখিত হয়েছেন। চন্দ্রগুপ্তের মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রমাণ করে যে তিনি সার্বভৌম রাজা ছিলেন, এবং তাঁর পূর্ববর্তীরা ছিলেন সম্ভবত সামন্তরাজা।

চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং, যিনি ৬৭১ থেকে ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন, লিখেছিলেন যে তাঁর সময়ের পাঁচশো বছর আগে শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজা চৈনিক পরিব্রাজকদের জন্য একটি মন্দির তৈরী করেছিলেন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করেছিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এই মন্দির তৈরী করা হয়েছিল মগধে এবং ই-সিং উল্লিখিত শ্রীগুপ্ত আসলে গুপ্ত বংশেরই প্রথম রাজা। অবশ্য ই-সিং তারিখটায় গোলমাল করে ফেলেছেন, কেননা শ্রীগুপ্ত তাঁর পাঁচশো বছর আগে নন, সাড়ে তিনশো-চারশো বছর আগে বর্তমান ছিলেন।

দ্বিতীয় রাজা ঘটোৎকচগুপ্তের সম্পর্কে আমাদের তথ্য খুবই কম। লক্ষ্যণীয় যে, রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা, বাকাটক রাজমহিষী প্রভাবতী গুপ্তা তাঁর একটি লিপিতে ঘটোৎকচকেই গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। আর একটি লিপি যা রেওয়া থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ওই একই কথাই বলছে।

৪॥ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

তৃতীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলে গুপ্তদের যে বিস্তৃতি ঘটেছিল তার প্রমাণ শুধু যে তাঁর মহারাজাধিরাজ উপাধিতেই পাওয়া যায় তা নয়, তাঁর প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রাগুলিও এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। এই মুদ্রাগুলির একদিকে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী কুমারদেবীর ছবি আঁকা আছে, অপর দিকে সিংহবাহিনী এক দেবীর প্রতিকৃতি আছে আর তার তলায় লেখা আছে লিচ্ছবি।

এই কুমারদেবী ছিলেন লিচ্ছবিদের মেয়ে এবং চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষ্যণীয় যে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে লিচ্ছবিদের দৌহিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। লিচ্ছবিরা যে প্রাচীন ট্রাইব ছিল তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দীর্ঘকাল তারা সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে ছিল। অনুমান করা যায় যে লিচ্ছবি ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে তাদের মধ্যে রাজতন্ত্র প্রচলিত হয়েছিল, এবং সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারিণীকে চন্দ্রগুপ্ত

বিবাহ করেছিলেন। তাতে তাঁর রাজত্বের এলাকাও বেড়েছিল, শক্তিও বেড়েছিল।

কতখানি অঞ্চল জুড়ে চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। বিভিন্ন পুরাণে একটি শ্লোক আছে যাতে বলা হয়েছে সাকেত, প্রয়াগ ও মগধে গুপ্তবংশীয়রা রাজত্ব করছে। এই শ্লোকটিকেই অনেকে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সীমা নির্দেশক হিসাবে মনে করেন। তবে তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তারের যে আভাস পাওয়া যায় তার থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব বিহার, বঙ্গদেশের পশ্চিম অংশ ও উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল।

কৌমুদী-মহোৎসব নামক নাটকের কাহিনীর ভিত্তিতে কেউ কেউ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভের কাহিনীকে খুব রোমাঞ্চকর করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওই নাটকে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের জীবনের কোন অধ্যায়কে সংযুক্ত করা চলতে পারে। কেউ কেউ আবার বলার চেষ্টা করেছেন যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন, এবং এটি প্রমাণ করার জন্য ভবিষ্যোত্তর নামক একটি অর্বাচীন পুরাণের মধ্যে কিছু জাল শ্লোক ঢুকিয়েছেন। এগুলির দ্বারা যে ইতিহাসের কোন্ উপকার করা হয়েছে তা বোঝা দুষ্কর।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, এবং ওই দিনটি থেকেই গুপ্তাব্দের সূচনা হয়েছে মনে করার সঙ্গত যুক্তি আছে।

৫ ॥ সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি নামক স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর জীবনকালেই তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। অনুমান করার কারণ আছে যে সমুদ্রগুপ্তের এই মনোনয়ন অনেকের মনঃপূত হয়নি, এবং সিংহাসনে আরোহণ করার পর সমুদ্রগুপ্তকে একটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কাচ নামক এক ব্যক্তির কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলি সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রার অনুরূপ। তাই কেউ কেউ বলেন যে কাচ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের বড় ভাই, যাঁকে পরাস্ত করে সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসন সুদৃঢ় করেন। আবার কেউ কেউ বলেন কাচ সমুদ্রগুপ্তের অপর এক নাম।

উত্তর ভারত বিজয় ঃ সিংহাসন লাভ করার পর সমুদ্রগুপ্ত রাজ্যবিস্তারে

মন দেন। তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী হরিষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বর্তমান। উত্তর ভারতের নয় জন রাজাকে তিনি পরাস্ত করেন এবং তাঁদের রাজ্য নিজ এলাকাভুক্ত করেন। এই নয় জন রাজাদের মধ্যে দুজন ছিলেন নাগবংশীয়, নাগসেন ও গণপতিনাগ। আমরা আগেই দেখেছি যে নাগবংশীয়রা বিদিশা, কান্তিপুর, মথুরা ও পদ্মাবতীতে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। এই উভয় নাগবংশীয় রাজা ঠিক কোন জায়গায় রাজত্ব করতেন তা বলা শক্ত। অপর দুজন রাজা, অচ্যুত ও চন্দ্রবর্মা, যথাক্রমে অহিচ্ছত্র ও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। বাকি পাঁচজন ছিলেন রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, নন্দী ও বলবর্মা। এঁদের এলাকাগুলি কোথায় ছিল বলা যায় না। কেউ কেউ বলেন যে রুদ্রদেব পশ্চিমী ক্ষত্রপ দ্বিতীয় রুদ্রদামা অথবা তাঁর পুত্র তৃতীয় রুদ্রসেন। নাগদত্তকে কেউ কেউ উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুই স্পষ্ট বলা সম্ভবপর নয়।

উত্তর ভারতের উপরিউক্ত নয়জন রাজার রাজ্যের অবস্থান সঠিক ভাবে জানা না গেলেও, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে যে প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির কথা আছে, যাদের রাজারা সমুদ্রগুপ্তের আনুষ্ঠানিক অধীনতা স্বীকার করতেন, সেগুলি থেকে উত্তর ভারতে তাঁর অধিকৃত এলাকাগুলি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করা সম্ভব। এই পাঁচটি প্রত্যন্ত করদ রাজ্য ছিল সমতট, কামরূপ, নেপাল, ডাবক এবং কর্তৃপুর। সমতট হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশ, কামরূপ উত্তর আসাম ও নেপাল বর্তমান নেপাল। ডাবক ছিল আসামের নওগাঁ অঞ্চল, আর কর্তৃপুর ছিল পাঞ্জাবের জালন্ধর জেলার বর্তমান কর্তারপুর।

আর্যাবর্তের নয়জন রাজা ও পাঁচটি প্রত্যন্ত রাজ্য ছাড়াও বহু ট্রাইব, অগ্রসর ও অনগ্রসর, সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এই রকম ট্রাইবের সংখ্যা নয়টি। (১) মালব, যারা বাস করত পূর্ব রাজস্থানে, বিশেষ করে মেবার, টংক ও কোটা অঞ্চলে ; (২) আর্জুনায়ন, যারা বাস করত বর্তমান জয়পুর ও তার চার-পাশের অঞ্চলে ; (৩) যৌধেয়, যারা বাস করত শতদ্রু নদীর দুই কূলে এবং যাদের এলাকা ভরতপুর সহ যমুনার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; (৪) মদ্রক, যারা বাস করত ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং যাদের রাজধানী ছিল শাকল বা শিয়ালকোট ; (৫) সনকানিক, যারা বাস করত ভীলসার নিকটবর্তী অঞ্চলে ; (৬) আভীর, যারা বাস করত ভীলসা ও ঝাঁসির মধ্যবর্তী এলাকায় ; (৭) প্রার্জুন, (৮) কাক এবং (৯) খরপরিক, যাদের সঠিক

অবস্থান নির্ণয় করা না গেলেও তারা যে বর্তমান মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল এটা সুনিশ্চিত।

দক্ষিণ ভারত অভিযান ঃ সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতেও অভিযান করেছিলেন এবং বারোজন রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন বলে এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে দাবি করা হয়েছে। অবশ্য তিনি দক্ষিণ ভারতের কোন স্থান নিজ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেননি, শুধু রাজাদের বশ্যতা আদায় করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। যে বারোজন রাজা তাঁর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন (১) কোশলের মহেন্দ্র, এই কোশল দ্রুগ, রায়পুর, বিলাসপুর ও সম্বলপুর জেলাগুলি নিয়ে গঠিত ছিল; (২) মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ; মহাকান্তার বলতে বোঝাত উড়িষ্যার জয়পুরের অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চল; (৩) পিষ্টপুরের মহেন্দ্রগিরি, পিষ্টপুর বর্তমান গোদাবরী জেলার পিঠপুরম; (৪) বেঙ্গির হস্তিবর্মা, বেঙ্গি ছিল বর্তমান পেড্‌ড-বেগি, এল্লোরের সাত মাইল উত্তরে কৃষ্ণা ও গোদাবরী মধ্য অঞ্চলে, হস্তিবর্মা ছিলেন শালংকায়ন রাজা; (৫) পালক্কের উগ্রসেন, পালক্ক ছিল বর্তমান নেল্লোর জেলা; (৬) কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, কাঞ্চী চিঙ্গলেপুত জেলার কঞ্জীবরম, বিষ্ণুগোপ ছিলেন পল্লববংশীয় রাজা; (৭) এরণ্ডপল্লের দমন; দেবরাষ্ট্রের কুবের; (৯) কৌরালের মন্তরাজ; (১০) কোট্টুরের স্বামীদত্ত; (১১) অবমুক্তের নীলরাজ এবং (১২) কুস্থলপুরের ধনঞ্জয়। উল্লিখিত তালিকার সপ্তম থেকে দ্বাদশ সংখ্যক স্থানগুলিকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হয়নি। ফ্লীট এরণ্ডপল্ল ও দেবরাষ্ট্রকে যথাক্রমে খান্দেশ অঞ্চলের এরাণ্ডোল এবং মহারাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। তাঁর মতে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথের পূর্ব দিক দিয়ে অভিযান শুরু করেন এবং ফেরার পথে পশ্চিম দিক হয়ে আসেন। পক্ষান্তরে ডুব্রেউইল এরণ্ডপল্লকে গঞ্জাম জেলায় এবং দেবরাষ্ট্রকে ভিজাগাপটম জেলায় নির্দিষ্ট করেছেন। কোট্টুরকে সালেতোরে নির্দিষ্ট করেছেন বেলারী জেলার কুডলিগি তালুকে, পক্ষান্তরে কেউ কেউ মনে করেন কোট্টুর ছিল গঞ্জাম বা ভিজাগাপটম জেলার কোঠুর। কৌরাল, অবমুক্ত ও কুস্থলপুরকে নির্দিষ্ট করা যায়নি।

মোটামুটি এটা পরিষ্কার যে সমুদ্রগুপ্ত মধ্যপ্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের মধ্য দিয়ে ওড়িষ্যায় প্রবেশ করেন এবং পূর্ব উপকূল ধরে তামিলনাড়ু পেরিয়ে পল্লব রাজ্য পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন। অবশ্য এটাই সকলের মত নয়। সাথিয়ানাথাইয়ের বলেন যে সমুদ্রগুপ্ত অধিকৃত মহাকান্তার ছিল মধ্যপ্রদেশের কঙ্কের ও বস্তার, কৌরাল ছিল পূর্ব গোদাবরী জেলার তুগুর তালুকের চেরলা,

কোট্টূর ছিল পূর্ব গোদাবরী জেলার কোট্টুরু, এরণ্ডপল্ল ছিল পশ্চিম গোদাবরী জেলার এরগুণ্টাপল্লে এবং দেবরাষ্ট্র ছিল সাতারা জেলায়। তাঁর মতে সমুদ্রগুপ্ত উড়িষ্যা গঞ্জাম ও ভিজাগাপটম দিয়ে, অর্থাৎ উপকূল অঞ্চল দিয়ে যাননি, মধ্যপ্রদেশ থেকে সোজা নেমে এসেছিলেন পিঠপুরমে এবং তিনি ফেরার পথে দক্ষিণাপথের পশ্চিম অংশের স্থানগুলি দখল করেন।

বৈদেশিক সম্পর্ক ঃ আমরা আগেই বলেছি যে প্রত্যন্ত রাজ্যগুলি এবং দক্ষিণভারতের বিজিত রাজ্যগুলিকে সমুদ্রগুপ্ত নিজ রাজত্বের এলাকাভূক্ত করেননি, ওই সকল স্থানের রাজাদের আনুষ্ঠানিক বশ্যতা গ্রহণ করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। পশ্চিমভারতের শক ক্ষত্রপেরা তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পশ্চিম পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের কুষাণ রাজা, যাঁর উপাধি ছিল দৈবপুত্র-শাহি-শাহানুশাহী, তাঁর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কুষাণ ধরনের কিছু মুদ্রায় সমুদ্র ও চন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। গুপ্ত ধরনের কিছু মুদ্রা পশ্চিমের শক শাসকেরা চালু করেছিলেন যা প্রমাণ করে যে ওই সকল অঞ্চলে সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল।

একটি চৈনিক পুঁথি থেকে জানা যায় যে সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ (৩৫২-৭৯ খৃঃ) বৌদ্ধ গয়াতে সিংহলী ভিক্ষুদের জন্য একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রগুপ্তের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছিলেন যা সমুদ্রগুপ্ত মঞ্জুর করেছিলেন। এই সংঘারামটি পরে খুব বৃহৎ হয়েছিল যা হিউয়েন সাঙ বলে গেছেন।

ব্যক্তিগত গুণাবলী ও তারিখ ঃ সমুদ্রগুপ্ত যে খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং অশোকের পর তিনিই একমাত্র সম্রাট যিনি প্রায় গোটা ভারতবর্ষেরই আনুগত্য আদায় করেছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁকে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ বলে অভিহিত করা কয়েছে এবং তাঁর মুদ্রায় তাঁর বীণাবাদনরত মূর্তি দেখে ওই দাবিকে সত্য বলেই মনে হয়। সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে বিশেষ এক ধরণের মুদ্রারও প্রচলন করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ৩৮০ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর সিংহাসনারোহণ ঘটেছিল ৩৪০ থেকে ৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে। কেউ কেউ তাঁকে ৩২০ খৃষ্টাব্দের গুপ্তাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন। এ মত সঠিক নয়।

৬॥ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যিনি ৩৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক অতি উৎসাহের প্রাবল্যে বিশাখদত্ত রচিত দেবী-চন্দ্রগুপ্ত নামক একটি নাটকের কাহিনী অবলম্বনে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের পিছনে একটি নাটকীয় কাহিনী যোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। দেবী-চন্দ্রগুপ্ত নাটকে বলা আছে যে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রামগুপ্ত জনৈক শক রাজার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে স্বীয় পত্নী ধ্রুবাদেবীর বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করতে চান, কিন্তু এটা অপমানকর মনে করে তাঁর ভাই চন্দ্রগুপ্ত নিজেই ধ্রুবাদেবীর ছদ্মবেশে শকশিবিরে হাজির হয়ে শক রাজাকে হত্যা করেন, এবং তার পর রামগুপ্তকে হত্যা করে নিজে রাজা হন এবং ধ্রুবাদেবীকে বিবাহ করেন।

নাটক-নভেলের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস লেখার বিড়ম্বনা থেকে কবে যে মুক্তি পাওয়া যাবে জানিনা, কিন্তু তার চেয়েও আরও অস্বস্তিকর বড় বড় পণ্ডিতেরা যখন ইতিহাস চেতনাকে বিসর্জন দিয়ে এই সব ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করেন। এই নিয়ে মাথা ঘামাবার আগে কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ থেকে মগধের দূরত্বটা কত দূর তা হিসাব করার দরকার নিশ্চয়ই ছিল। আমরা পূর্বেই দেখেছি, গুপ্তদের আবির্ভাবের সময় শকশক্তির কার্যত পতন ঘটে গিয়েছিল, ভারত ইতিহাসে তাদের আর কোন ভূমিকাই ছিল না। তারা নামে মাত্রই টিকেছিল, এবং তাদের অস্তিত্বটুকুও চন্দ্রগুপ্ত লোপ করে দিয়েছিলেন।

রামগুপ্ত বলে কোন গুপ্ত সম্রাট ছিলেন না। ওই নামের কয়েকটি মুদ্রা অবশ্য পাওয়া গেছে। ইনি ছিলেন মালবের একজন স্থানীন শাসক।

চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পিতা সমুদ্রগুপ্তের মতই সামরিক প্রতিভাবান ছিলেন। সুদূর দক্ষিণের কিছু এলাকা, এবং দক্ষিণভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বাকাটকদের বাদ দিয়ে, অবশিষ্ট ভারতের প্রায় সবটুকুই সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করেছিল, এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ও তা বজায় ছিল। পশ্চিম ভারতের অর্থাৎ গুজরাট ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের শক শাসকেরা সম্ভবত সমুদ্রগুপ্তের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। তার কিছু ইঙ্গিত আমরা পূর্বে দিয়েছি। অসম্ভব নয় যে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তারা সেই বশ্যতা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। অথবা এও হতে পারে যে সাম্রাজ্যে আরও কিছু এলাকা যুক্ত করা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অভিপ্রায় ছিল। দ্বিতীয় অনুমানটিই অধিকতর সঙ্গত। কেননা চন্দ্রগুপ্ত

শকদের পরাস্ত করে তাদের এলাকাগুলি নিজ রাজ্যের অঙ্গীভূত করে নেন। প্রশাসনিক অসুবিধার জন্যই সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় করলেও নিজ রাজ্যের আয়তন বেশি বাড়ানোর বিপক্ষে ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সেই নীতি পরিবর্তন করে-ছিলেন, এবং আমাদের মনে হয় তা একটি মাত্র কারণেই, এবং তা হচ্ছে রোমক বাণিজ্যের সদ্ব্যবহার। এই কারণেই বন্দর সমৃদ্ধ পশ্চিম ভারতের উপকূল ভাগ দখল করার প্রয়োজন তাঁর ছিল, এবং এই একই কারণেই তিনি উত্তর-পশ্চিমের বাহ্লীক দেশ (ব্যাকট্রিয়া) পর্যন্ত জয় করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংস না হলেও তার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, যার ফলে স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথেই বাণিজ্য বিঘ্নিত হচ্ছিল। স্থলপথে পণ্যসমূহ বিভিন্ন দুর্ধর্ষ ট্রাইবের দ্বারা লুণ্ঠিত হচ্ছিল, কাজেই পরের ভরসায় চন্দ্রগুপ্ত বসে থাকেননি। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে ভারতের অভ্যন্তরে বেশি যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত লিপ্ত হতে চাননি। পশ্চিম-দক্ষিণাপথের উঠতি শক্তি বাকাটকদের বিরুদ্ধে তিনি কোন যুদ্ধ করেননি, বরং তাদের রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে নিজকন্যা প্রভাবতী গুপ্তার বিবাহ দিয়েছিলেন।

শকদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত আক্রমণ চালিয়েছিলেন মালব থেকে। এ বিষয়ে তিনটি লেখমালা আছে, একটি ভীলসার নিকটবর্তী উদয়গিরিতে, যা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন তাঁর মন্ত্রী বীরসেন, অপরটি ওই একই অঞ্চলে যা উৎকীর্ণ করিয়ে-ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীনস্থ একজন সামন্তরাজা এবং তৃতীয়টি সাঁচীতে যা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন আম্রকার্দব নামক তাঁর এক সেনাপতি। চন্দ্রগুপ্ত শকদের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করেছিলেন ৪০৯ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে। শক নেতা তৃতীয় রুদ্রসিংহকে তিনি শুধু পরাস্তই করেননি, তাঁর সমস্ত এলাকা তিনি নিজ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেছিলেন যার কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

চন্দ্রগুপ্তের অপরাপর অভিযান সম্পর্কে কোন বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর মন্ত্রী শাব এবং সেনাপতি আম্রকার্দব যে লেখমালা সমূহ উৎকীর্ণ করিয়ে-ছিলেন, তাতে তাঁকে গৌরবার্থে সর্বজগত-বিজেতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লীর কুতবমিনারে একটি লৌহস্তম্ভ আছে যাতে জনৈক চন্দ্ররাজার দিগ্বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে তিনি বঙ্গের বিদ্রোহী নেতাদের একটি সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন, সিন্ধু নদীর সাতটি মুখ অতিক্রম করেছিলেন এবং বাহ্লীকদের পরাস্ত করেছিলেন। এই চন্দ্রকে

অনেকেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, এবং তা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

আমরা আগেই বলেছি, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চন্দ্রগুপ্ত অনাবশ্যক যুদ্ধ পরিহার করেছিলেন। তিনি নিজে নাগদের রাজকন্যা কুবেরনাগাকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁর কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সঙ্গে বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ দিয়েছিলেন। কুন্তলের কদম্বশাসক কাকুৎস্থবর্মার লেখমালা থেকে জানা যায় যে গুপ্তদের সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চন্দ্রগুপ্ত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা নিজের শক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের অপর নাম ছিল দেবগুপ্ত এবং দেবরাজ। এ ছাড়া তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়েছিলেন। তাঁর পরম ভাগবত উপাধি প্রমাণ করে যে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অনুকূল ছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তীরা নিছক স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করলেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রারও প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর কিছু মুদ্রায় শক-শৈলীর প্রভাব আছে। মুদ্রার উপর তিনি কয়েকটি নূতন ধরনের ছাপেরও প্রবর্তন করেছিলেন। এক ধরনের মুদ্রায় তাঁকে সিংহ নিধনকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। ওই সিংহ তাঁর গুজরাত অঞ্চল জয়ের প্রতীক। তাঁর সময় বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে কিছুই লেখেন নি, এমনকি চন্দ্রগুপ্তের নামও উল্লেখ করেন নি, তবে তাঁর রচনায় তৎকালীন নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছল্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

৭॥ প্রথম কুমারগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নী ধ্রুবাদেবীর গর্ভজাত কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন ৪১৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি ৪৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে-ছিলেন। পিতা ও পিতামহের অর্জিত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, এবং মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি নিয়েছিলেন। তিনি স্কন্দ কার্তিকের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর মুদ্রায় ওই দেবতার ছাপ আছে। তাঁর আমলের বহু লেখমালা পাওয়া গেছে যেগুলিতে তাঁর অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের উল্লেখ আছে। অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে ইতিমধ্যে সামন্ত-প্রথা বেশ দৃঢ় ভিত্তি অর্জন করেছিল।

কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে একটি বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে। এই সংবাদটি আমরা পাই ভিটরি স্তম্ভ লিপি থেকে। আক্রমণকারীদের বলা হয়েছে পুষ্যমিত্র। ওই লিপিটিতে ফ্লীট পড়েছেন পুষ্য-মিত্রাংশ্চ, কিন্তু দিবেকর বলছেন ওটার আসল পাঠ হবে যুধ্য-অমিত্রাংশ্চ। অবশ্য পুষ্যমিত্র বলে একটি ট্রাইবের উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণে আছে। সে যাই হোক রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে একটি দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করেন। এটা ঘটেছিল ৪৫৫-৫৬ সালে, অর্থাৎ কুমারগুপ্তের মৃত্যুকালে।

৮ ॥ স্কন্দগুপ্ত

কুমারগুপ্তের উত্তরাধিকারী ছিলেন স্কন্দগুপ্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন গুপ্ত-লিপিতে, এমনকি স্কন্দগুপ্তের নিজের লিপিতেও, তাঁর মায়ের কোন নাম নেই। তাঁর পিতার আমলে সংঘটিত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার পর স্কন্দগুপ্ত যে লেখমালা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন তাতে লেখা আছে যে তিনি তাঁর মাকে বিজয়সংবাদ দেবার পর তিনি তাঁকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গ্রহণ করেন, যেমন দেবকী গ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণকে। এ থেকে অনেকে বলেন যে তাঁর মায়ের নাম ছিল দেবকী, কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই মনে হয় এটি একটি উপমা।

স্কন্দগুপ্তের, এবং অপরাপর গুপ্ত লেখমালায়, স্কন্দগুপ্তের মায়ের নামের অনুল্লেখ এবং তাঁর পূর্ববর্তীদের প্রধানা মহিষীদের নামের উল্লেখ থেকে, কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেছেন যে স্কন্দগুপ্তের মা তাঁর পিতার কোন প্রধানা মহিষী ছিলেন না, এবং সিংহাসনের উপর তাঁর দাবিও বৈধ ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাঁকে সিংহাসন দখল করতে হয়েছিল। এও অনুমান করা হয়েছে যে, ওই পুষ্যমিত্রদের সঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়ে কুমারগুপ্ত মারা যান। তখন স্কন্দগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে, এবং সেই অবসরে পূরুগুপ্ত রাজা হন। পরে স্কন্দগুপ্ত ফিরে এসে তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করে নিজে রাজা হন। কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে কিছুই বলা যায় না।

স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল খুব শান্তির হয়নি। তাঁর সমকালীন লেখমালা সমূহ থেকে জানা যায় যে তাঁকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং আক্রমণ উভয়েরই মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বৈদেশিক আক্রমণ বলতে হূণ আক্রমণ। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে হূণ আক্রমণের দ্বারা যেমন একদিকে রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়েছিল অপর দিকে তা ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামনেও বিপদ নিয়ে এসেছিল।

হূণদের একটি শাখা যারা এফথালাইটেস বা শ্বেতহূণ নামে পরিচিত অক্সাস উপত্যকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং ভারত অভিমুখে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত সে আক্রমণ প্রতিহত করেন, এবং অতঃপর পঞ্চাশ বছর হূণেরা কোন ব্যাপক আক্রমণ চালাতে সাহস পায়নি।

স্কন্দগুপ্তের মুদ্রার সংখ্যা কম, এবং তার ধরণও কেবলমাত্র একটি, যা থেকে বোঝা যায় হূণ আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে স্কন্দগুপ্তকে যে-সকল যুদ্ধ করতে হয়েছিল তার ফলে রাজকোষের উপর প্রবল চাপ পড়েছিল। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বিখ্যাত সুদর্শন বাঁধ বিনষ্ট হওয়া। এই বাঁধটি তৈরী হয়েছিল মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে। ওই বাঁধ ভেঙে পড়ায় স্কন্দগুপ্ত কাথিয়াবাড় অঞ্চলের শাসক পর্ণদত্তকে তা সংস্কার করার নির্দেশ দেন এবং কিভাবে সেই নির্দেশ কার্যকরী হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পর্ণদত্ত কর্তৃক উৎকীর্ণ গির্ণার লেখমালায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই বাঁধটি ইতিপূর্বে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামা একবার সংস্কার করিয়েছিলেন।

স্কন্দগুপ্তই ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা। ৪৬৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর মৃত্যু হবার পর গুপ্তসাম্রাজ্যে ভাঙনের লক্ষণ দেখা যায়। অবশ্য গুপ্তদের পতন হতে আরও বিলম্ব হয়েছিল।

৯॥ ভাঙনের যুগ : পূরুগুপ্ত ও বুধগুপ্ত

গুপ্তদের সরকারী বংশতালিকায় স্কন্দগুপ্তের নাম নেই, প্রথম কুমারগুপ্তের পরেই পূরুগুপ্তের নাম বলা হয়েছে, যিনি ছিলেন অনন্তদেবীর গর্ভজাত প্রথম কুমারগুপ্তের সন্তান। স্কন্দগুপ্তের পর, অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্টাব্দের পর তিনি কতকাল রাজত্ব করেছিলেন তা বলা যায় না, তবে পরবর্তী রাজারা—বুধগুপ্ত ও নরসিংহ গুপ্ত—ছিলেন তাঁর বংশীয়, স্কন্দগুপ্তের নয়। আরও কয়েকজন গুপ্তরাজার নাম তাঁদের লেখমালায় পাওয়া গেছে, গুপ্তবংশে যাঁদের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। যেমন ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে রচিত জনৈক দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের একটি লিপি পাওয়া গেছে। ইনি স্কন্দগুপ্তের পুত্র হলেও হতে পারেন। আবার ইনি পূরুগুপ্তের পুত্র এবং বুধগুপ্তের বড় ভাইও হতে পারেন। আসল কথা সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব স্কন্দগুপ্তের পর থেকে আর চাপা ছিল না।

৪৭৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন বুধগুপ্ত যিনি পূরুগুপ্ত ও তাঁর মহিষী চন্দ্রদেবীর গর্ভজাত বলে কথিত। তাঁর আমলের মালব ও বাংলাদেশের শাসকদের

লেখমালা সমূহ প্রমাণ করে যে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির তুলনায় প্রাদেশিক শাসকরাই ক্রমশই বিশিষ্টতা অর্জন করছিলেন। প্রাদেশিক শাসকদের পদগুলিও সামন্ত-রাজাদের মতই বংশভিত্তিক হয়ে উঠছিল। কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে মৈত্রকরা বংশগতভাবেই শাসন করতে শুরু করেছিলেন। যেমন ভটার্ক, তাঁর পুত্র ধরসেন, তাঁর ভাই দ্রোণসিংহ। শেষোক্ত ব্যক্তি মহারাজ উপাধি নিয়েছিলেন। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের পরিব্রাজক বংশ, উচ্চকল্পের রাজা জয়নাথের বংশ, বান্দা ও বাঘেলখণ্ডের পাণ্ডুবংশ, এলাহাবাদ ও রেওয়া অঞ্চলের মহারাজ লক্ষ্মণের বংশ, মাহিষ্মতী অঞ্চলে মহারাজ সুবন্ধুর বংশ, ইত্যাদি বহু বংশের লেখমালা সমূহ প্রমাণ করে যে, তাঁরা এই সময়ে হয় সামন্ত রাজা ছিলেন, না হয় প্রাদেশিক শাসনকর্তা থেকে সামন্ত রাজা হয়েছিলেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই গুপ্তদের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে উত্তরবঙ্গের শাসকের উপাধি ছিল উপরিক কিন্তু বুধগুপ্তের আমলে তা মহারাজ-এ দাঁড়ায়। এগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া, বুধগুপ্তের আমল থেকেই গুপ্তদের এড়িয়ে ভারতে অপরাপর রাজশক্তির বিকাশ হতে দেখা যায়। বাকাটক রাজা নরেন্দ্রসেন বুধগুপ্তের চোখের সামনেই কোসল, মেকল ও মালব অধিকার করেছিলেন।

বুধগুপ্তের শেষ জানা তারিখ হচ্ছে ৪৯৫ খৃষ্টাব্দ। তবে তিনি মারা গিয়েছিলেন ৫০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ।

১০ ॥ নরসিংহ গুপ্ত ও পরবর্তী সম্রাটগণ

বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই নরসিংহ গুপ্ত, এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্র, তৃতীয় কুমারগুপ্ত ও বিষ্ণুগুপ্ত, রাজত্ব করেছিলেন। এই তিন রাজার রাজত্বকাল মোটামুটি ৫০০ থেকে ৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধরা হয়।

কিন্তু এঁরা ছাড়াও আরও দুজন গুপ্তরাজার নিদর্শন পাওয়া গেছে। একজনের নাম বৈন্যগুপ্ত যাঁর একটি উৎকীর্ণ লিপি (৫০৭ খৃষ্টাব্দে রচিত) পাওয়া গেছে বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলা থেকে। এছাড়া তাঁর কিছু স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে। অপরজন ছিলেন ভানুগুপ্ত, যাঁর পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার এরাণ নামক স্থানে প্রাপ্ত ৫১০ খৃষ্টাব্দের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে। সেখানে বলা হয়েছে মহারাজ ভানুগুপ্ত এবং তাঁর সামন্ত গোপরাজ একটি

বিরাট যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সম্ভবত হূণদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে গোপরাজ নিহত হন এবং তাঁর পত্নী তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হন।

এই বৈন্যগুপ্ত ও ভানুগুপ্তের সঙ্গে মূল গুপ্তবংশের সম্পর্ক কি রকম ছিল জানা যায় না। দুরকম সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে করা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে এঁরা উভয়েই গুপ্তবংশের সন্তান ছিলেন, একজন বাংলাদেশের অপরজন মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, এবং কেন্দ্রীয় দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হচ্ছে এঁরা নরসিংহগুপ্তের পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন অত্যল্পকালের জন্য। হূণ আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়েই হোক, বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, এঁদের অকাল মৃত্যুর পর নরসিংহগুপ্ত সিংহাসনে বসেন।

নরসিংহগুপ্তের আমলে এমন অনেকগুলি ঘটনা ঘটে যা গুপ্ত সাম্রাজ্যকে সোজাসুজি ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়, যদিও নরসিংহগুপ্ত অবস্থার সামাল দিয়েছিলেন। প্রথমটি হচ্ছে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ, সামন্ত রাজাদের ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা; দ্বিতীয়টি হচ্ছে গুপ্ত এলাকার মধ্যেই যশোধর্মা নামক একজন ভাগ্যান্বেষীর একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; এবং তৃতীয়টি হচ্ছে হূণ আক্রমণ। বিদ্রোহী সামন্তদের এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নরসিংহগুপ্ত কতখানি বাগে আনতে পেরেছিলেন জানা যায় না। তবে তিনি ছিলেন মোটামুটি শক্তিমান সম্রাট, কাজেই অনুমান করা যায় যে তাদের কাছ থেকে বাস্তব আনুগত্য না হলেও একটা আনুষ্ঠানিক আনুগত্য তিনি আদায় করতে পেরেছিলেন। যশোধর্মার অভ্যুত্থান গুপ্তদের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও তা ছিল একেবারেই সাময়িক, এবং সেই কারণেই তা গুপ্তদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর হলেও নরসিংহগুপ্তকে অল্পের জন্য রেহাই দিয়েছিল। তৃতীয় ঘটনাটির ক্ষেত্রে, নরসিংহগুপ্ত হূণদের পরাস্ত করেছিলেন, এবং হূণ নেতা মিহিরকুল তাঁর অধীনতা মানতে এবং তাঁকে কর দিতে বাধ্য হন। একথা একদিকে যেমন হিউয়েন সাঙ বলেছেন, অপর দিকে তেমনই খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত একটি নালন্দা-লিপির দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন।

নরসিংহগুপ্তের পর তাঁর পুত্র তৃতীয় কুমারগুপ্ত ও তাঁর পৌত্র বিষ্ণুগুপ্ত রাজা হন যাঁদের রাজত্বকাল ৫৩৫ থেকে ৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তাঁদের আমলেই গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তবুও দেখা যায় ৫৪৩ খৃষ্টাব্দের একটি

উত্তরবঙ্গের লিপিতে গুপ্তদের সার্বভৌম বলা হয়েছে, যদিও তখন বঙ্গদেশের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছে, বলভীর শাসকেরা ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্তদের আনুগত্য স্বীকার করেছে, কলিঙ্গে গুপ্তদের সার্বভৌমত্ব ৫৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মানা হয়েছে। অর্থাৎ গুপ্তদের পতন হয়েছে ধীরে ধীরে, বহু সময় ধরে।

১১ ॥ গুপ্তদের পতনের কারণ

মৌর্য সাম্রাজ্য যে কারণে ধ্বংস হয়েছিল গুপ্তদের পতনের ক্ষেত্রেও সেই একই কারণগুলি বর্তমান। এদেশে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বহুলাংশে ব্যক্তিনির্ভর বলেই শক্তিমান রাজা না থাকলে রাজত্ব থাকেনা। সিংহাসনের জন্য গুপ্তদের মধ্যে গৃহবিবাদ গুপ্ত ইতিহাসের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য, আর এরই ফলে কেন্দ্রীয় শাসন মাঝে মাঝে দুর্বল হয়েছে, এবং সামন্ত রাজারা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সেই সুযোগে বার বার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এমনকি গুপ্ত বংশেরই অনেকে পৃথক পৃথক এলাকায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, উপরিউক্ত দুর্বলতা এদেশের সকল রাজ বংশের বৈশিষ্ট্য হলেও, একমাত্র গুপ্তদের ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে এখানে বেশি সংখ্যায় শক্তিমান রাজা এসেছিলেন। গুপ্তদের শেষ পর্যায়েও নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের মত শক্তিমান রাজার আবির্ভাব হয়েছিলেন। এবং বালাদিত্য যে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। তাহলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের আরও গূঢ় কারণ বর্তমান! এবং তা হচ্ছে হূণ আক্রমণ। স্কন্দগুপ্তের সময় থেকে একনাগাড়ে হূণ আক্রমণ হয়ে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয় যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হূণ আক্রমণ এখানে প্রতিহত করা হয়েছে। হূণরাজ মিহিরকুল নরংহিগুপ্তের অধীনতা মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাহলে হূণ আক্রমণকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলা যায় না। তাহলে সেই কারণটি কি? এই কারণ একান্তই অর্থ নৈতিক।

একদিকে ক্রমাগত হূণ আক্রমণ এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যুদ্ধবিগ্রহ বিদ্রোহ দমন এই সকল ব্যাপারে গুপ্তদের অর্থ নৈতিক শক্তি একেবারে ভেঙে পড়েছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় স্কন্দগুপ্তের পর থেকে গুপ্ত মুদ্রাসমূহের হতমান অবস্থা থেকে। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ যখন রাজাদের বারোমাসের ব্যাপার—সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদিরা কম যুদ্ধ করেননি এবং তাতে ব্যয়ও কম হয়নি—সে ক্ষেত্রে একই একটি কারণেই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে যাবে এটাও মেনে

নেওয়া যায়না। তাই অনুমান করা যায় এমন কিছু ঘটেছিল যাতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থাগমে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটেছিল।

গুপ্তদের অর্থনৈতিক শক্তি দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। একটি ছিল ভূমির উদ্বৃত্ত এবং আভ্যন্তরীণ আদায়সমূহ যা সামন্তরাজারা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা গুপ্ত সম্রাটদের যোগাতেন। আর দ্বিতীয়টি ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রে অর্জিত অর্থ। এই দ্বিতীয় উৎসটি পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায় ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর। ঠিক ওই সময় থেকেই গুপ্তদেরও ভাঙন শুরু হয়েছিল। কাজেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের একমাত্র কারণ রোমক সাম্রাজ্যের পতন। আমরা পরে দেখব বহির্বাণিজ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার জন্যই গুপ্তদের পর কার্যত উত্তর ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে একেবারে রিক্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী ভারত ইতিহাসে দক্ষিণই প্রাধান্য পেয়েছে, উত্তর নয়। আর দক্ষিণের সাফল্যের মূলে ছিল ওই বহির্বাণিজ্য, রোমকদের পতনের পরেও অপরাপর সূত্র থেকে জলপথে তা চালাতে দক্ষিণের কোন অসুবিধা হয়নি।

১২ ॥ হূণ আক্রমণ

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকেই হূণেরা অক্সাস বা অক্ষু উপত্যকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এরা ইয়ে-থা বা এফথালাইটেস নামেই পরিচিত ছিল। হিন্দুকুশ অতিক্রম করে এরা গন্ধার জয় করেছিল, কিন্তু আর বেশিদূর তারা এগোতে পারেনি। ৪৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ স্কন্দগুপ্ত তাদের উৎখাত করেছিলেন।

ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে তোরমাণ নামক একজন হূণ নেতা পাঞ্জাব, পশ্চিম ভারতের কিয়দংশ, এমনকি মধ্যপ্রদেশেরও কিয়দংশ, যেমন এরাণ অঞ্চল, অধিকার করেন। তোরমাণ সম্পর্কে আমরা খুব বেশি জানিনা, তবে তাঁর মুদ্রা থেকে ওই সব অঞ্চলের উপর তাঁর আধিপত্য প্রমাণিত হয়।

৫১৫ খৃষ্টাব্দে তোরমাণের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র মিহিরকুল। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে মিহিরকুলের কথা আছে, কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে মিহিরকুলকে তোরমাণের বহু আগে স্থান দিয়েছেন। চৈনিক লেখক সুঙ্গ-উন-এর রচনা থেকে আমরা অবশ্য মিহিরকুল সম্পর্কে বাস্তব সংবাদ কিছু পাই, কেননা উক্ত লেখক নিজেই তাঁর রাজসভায় চৈনিক দূত হিসাবে ছিলেন ৫২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। কসমাস ইণ্ডিকোপ্লেউস্টেস নামক একজন

আলেকজাণ্ড্রিয়াবাসী গ্রীক লেখকও ভারতে হূণ অধিকারের কিছু সংবাদ দিয়েছেন। মিহিরকুলের একটি নিজস্ব উৎকীর্ণ লিপিও পাওয়া গেছে যা আনুমানিক ৫৩০ খৃষ্টাব্দে রচিত, এই লিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁর সাম্রাজ্য গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কিন্তু এদেশে হূণেরা স্থায়ীভাবে কিছুই করতে পারেনি, এদেশের জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে মিশে যাওয়া ভিন্ন। মিহিরকুল কাশ্মীর অঞ্চলে একটি যুদ্ধে মালবরাজ যশোধর্মার নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই যুদ্ধের কথা হুয়েন-সাঙ-এর রচনাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু যশোধর্মার মৃত্যুর পর মিহিরকুল আবার পাদপ্রদীপের সামনে আসেন। কিন্তু এবারও তাঁকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হতে হয় গুপ্তরাজা নরসিংহগুপ্তের কাছে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাশ্মীর এলাকায় হূণদের কিছু প্রভাব থেকে যায়। আমরা পরে দেখব মৌখরিরাজ ঈশানবর্মা এবং তাঁর পুত্র সর্ববর্মা হূণদের পরাস্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভারতে হূণদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। তাদের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল অক্ষু উপত্যকা থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছিল ৫৬৩-৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পারসিক ও তুর্কী বাহিনীর যুগ্ম আক্রমণে। কাজেই মূল শক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এখানে তাদের আর কিছু করার ছিল না।

১৩॥ যশোধর্মা ও অপরাপর গুপ্ত বিরোধী শক্তিসমূহ

গুপ্তরা হূণদের বারবার পরাস্ত করলেও হূণ আক্রমণ তাঁদের যে দুর্বল করে দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে দাক্ষিণাত্যের বাকাটকরাজ হরিষেণ যে মালব ও গুজরাট অধিকার করেছিলেন সে কথা আমরা আগেই বলেছি। নানা কারণে মালব অঞ্চলটি এই সময়ে গুরুত্ব অর্জন করেছিল। বাকাটক ছাড়া হূণেরাও এখানে ঘাঁটি করার চেষ্টা করছিল। গুপ্তদের মালব নিয়ে কিছু মাথাব্যথা ছিল। এই সুযোগে ঘূর্ণ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যশোধর্মা নামক স্থানীয় নেতা মালবে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসেন, এবং হূণদেরও তিনি পরাস্ত করেন।

এই যশোধর্মার গোড়ার ইতিহাস কিছু জানা যায় না, তবে তাঁর কীর্তিকলাপের কাহিনী তিনি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন যা মান্দোশোর-লিপি নামে খ্যাত। এই লিপিতে বলা হয়েছে যে যশোধর্মার রাজ্য উত্তরের হিমালয়, দক্ষিণের মহেন্দ্র পর্বত (গঞ্জাম জেলা); পূর্বের ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমের মহাসমুদ্র

দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অবশ্য এই দাবির অধিকাংশই ছিল প্রথাগত, কেননা দুটি গ্রাম জয় করেও আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত সাম্রাজ্য দাবি করা চলত। সে যাই হোক, এই যশোধর্মা যে হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করেছিলেন, যা তাঁর লিপিতেও উল্লিখিত আছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, এবং তিনি অতঃপর সেই প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে আশেপাশের কিছু সামন্তরাজাদের আনুগত্যও অর্জন করেছিলেন এটাও নিশ্চিত। যুদ্ধের দ্বারা কিছু অঞ্চল জয় করাও কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে তিনি গুপ্তদের ধ্বংস করতে পারেননি, হূণশক্তিকেও একেবারে নির্মূল করতে পারেননি। যশোধর্মা ৫৩০ থেকে ৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়েছিলেন, অনেকটা যেন উল্কার মত, যা কোন গভীর ছাপ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে রেখে যেতে পারেনি।

যশোধর্মার পর ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে, গুপ্তদের পতনকালে, যে সকল শক্তির সমাবেশ হয়েছিল তারা মৌখরি ও পরবর্তী-গুপ্তগণ। মৌখরিরা আদিতে ছিল বিহার ও উত্তরপ্রদেশে গুপ্তদের সামন্ত, তাদের একটি শাখা রাজত্ব করত মালবের কাছাকাছি অঞ্চলে, অপর শাখাটি মগধের কাছাকাছি অঞ্চলে। বঙ্গ এবং গৌড়ও গুপ্তদের অবক্ষয়ের যুগে যে কার্যত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ আছে। নিম্নে আমরা এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলাচনা করব।

১৪ ॥ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারত

বলভী: ভটার্ক নামে মৈত্রক-গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তি, যিনি গুপ্তদের সেনাপতি ছিলেন ও সেই সঙ্গে সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড় অঞ্চলের শাসক ছিলেন, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষের দিকে শক্তি সঞ্চয় করেন। তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ধরসেন নিজেদের সেনাপতি বলে পরিচিত করতেন, কিন্তু এই বংশের তৃতীয়জন, ধরসেনের ছোটভাই দ্রোণসিংহ মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই বংশের সর্বপ্রাচীন লেখমালার তারিখ ৫০২ খৃষ্টাব্দ, যা মহারাজ দ্রোণসিংহ উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। এঁদের রচিত সমস্ত লেখমালাই, যেগুলি মূলত ভূমিসংক্রান্ত দানপত্র; রাজধানী বলভী থেকেই প্রচারিত হয়েছিল, এবং এই কারণেই এঁদের বলভীর মৈত্রক বংশ বলা হয়।

বলভী রাজত্বের সীমানা কিরকম ছিল তা বলা কঠিন, তবে বলভী ছিল বর্তমান বল শহর (২১°৫২ উঃ, ৭১°৫৭ পূঃ), যা পূর্ব কাথিয়াবাড় অঞ্চলে

অবস্থিত। মৈত্রক বংশের রাজাদের পরিচয় তাঁদের লেখমালার দৌলতে খুব অজানা নয়। মহারাজ দ্রোণসিংহের উত্তরাধিকারী হন তাঁর ভাই মহারাজ প্রথম ধ্রুবসেন, যাঁর অন্যূন ষোলটি লিপি পাওয়া গেছে। তিনি গুপ্তদের আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করতেন এবং আনুমানিক ৫২৫ থেকে ৫৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর ভাই মহারাজ ধরপট্ট যাঁর কোন লেখমালা পাওয়া যায়নি। অতঃপর তাঁর পুত্র মহারাজ গুহসেন সিংহাসনে বসেন আনুমানিক ৫৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর কোন লেখমালায় এমন কোন কথা লেখা নেই যা থেকে প্রমাণিত হবে তিনি কোন বৃহৎ শক্তির আনুগত্য স্বীকার করতেন। অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে ৫৫০ থেকে ৫৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুপ্তদের পাকাপাকি পতন হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে গুহসেনও বলভী অঞ্চলের সার্বভৌম রাজায় পরিণত হন।

গুহসেনের পর দ্বিতীয় ধরসেন ও তাঁর পুত্র প্রথম শিলাদিত্য-ধর্মাদিত্য রাজা হন। দ্বিতীয় ধরসেনের যে লেখমালাগুলি পাওয়া গেছে সেগুলির তারিখ ৫৭১ থেকে ৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, শিলাদিত্য-ধর্মাদিত্যের ৬০৬ থেকে ৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময় এঁরা শুধু সার্বভৌম রাজাই ছিলেন না, এঁদের অধীনে বেশ কিছু সামন্তরাজাও ছিলেন। এইরকম একটি সামন্তবংশের (গারুলক বংশ) একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে যাতে দেখা যায় যে ওই বংশের 'সামন্ত-মহারাজ' দ্বিতীয় বরাহদাস মৈত্রকদের হয়ে দ্বারকা জয় করেছিলেন। এই পর্যায়ে মৈত্রকদের রাজ্যের পরিধি কতটা ছিল বলা কঠিন, তবে দ্বিতীয় ধরসেনের মহারাজাধিরাজ উপাধি থেকে মনে হয় যে তাঁর প্রভাবের এলাকা বেশ বিস্তৃত ছিল।

পরবর্তী রাজা শিলাদিত্যের কথা হিউয়েন সাঙ বলেছেন। তিনি তাঁকে দেখিয়েছেন ধার্মিক বৌদ্ধরূপে যিনি অনেক বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটা শিলাদিত্যের ধর্মাদিত্য উপাধির দ্বারাও প্রমাণিত হয়। হিউয়েন সাঙ তাঁকে মো-লা-পো বা মালবের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। অসম্ভব নয় যে মালব, বিশেষ করে মালবের পশ্চিম অংশ, বলভীর মৈত্রকদের হাতে চলে গিয়েছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছেন যে তাঁর সমকালীন বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন শিলাদিত্যের ভাগ্নে ছিলেন। মৈত্রকদের লেখমালাতেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

রাজস্থানের গুর্জরগণ ঃ গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হরিচন্দ্র নামক জনৈক গুর্জর নেতা যোধপুর অঞ্চলে

একটি রাজ্য স্থাপন করেন। গুর্জর ট্রাইবেরা একদা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বাস করত, এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান-নামের সঙ্গে গুর্জরদের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন পাঞ্জাবের গুরজানওয়ানা, গুজরখান, গুজরাত (সাহারণপুর জেলারও একটি নাম ছিল গুজরাত), গোয়ালিয়রের গুজরগড় প্রভৃতি। গুর্জরদের উদ্ভব নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন যে তারা আসলে ছিল বিদেশী যারা হূণদের সঙ্গে এসেছিল, কেউ কেউ আবার হূণদের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত করেন। কিন্তু এসবই অনুমানের ব্যাপার, প্রমাণসিদ্ধ নয়, এবং তা করার মত তথ্যও আমাদের হাতে নেই।

যে হরিচন্দ্রের কথা আমরা উল্লেখ করলাম, তাঁর সম্পর্কে প্রতীহার বাহুকের যোধপুর লেখমালায় যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা প্রতীহার ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, এবং তাঁর ক্ষত্রিয়া পত্নী ভদ্রার গর্ভজাত সন্তানেরা প্রতীহার রাজবংশের পত্তন করেছিলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে ভোগভট, কক্ক, রজ্জিল এবং দদ্দ। এঁদের মধ্যে রজ্জিল মাণ্ডব্যপুরে (যোধপুরের পাঁচ মাইল উত্তরে বর্তমান মান্দোর) রাজত্ব করতেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র নরভট। তাঁর পুত্র নাগভট মেড়ান্তকে (যোধপুরের ৭০ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত বর্তমান মেরতা) রাজধানী স্থাপন করেন। হরিচন্দ্র ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা আনুমানিক ৫৫০ থেকে ৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বংশধরেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন যা আমরা পরে দেখব।

নান্দীপুরীর গুর্জরগণ ঃ গুর্জরদের আর একটি শাখা ভৃগুকচ্ছ বা ব্রোচ অঞ্চলে রাজত্ব শুরু করেছিল। এদের রাজত্বের সীমা ছিল উত্তরে মহী নদী, দক্ষিণে কিম নদী, পশ্চিমে আরব সাগর ও পূর্বে মালব খান্দেশের পশ্চিমসীমা। এদের চারটি লেখমালা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল রাজধানী নান্দীপুরী (নান্দোদ) থেকে ৬২৯ থেকে ৬৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন দ্বিতীয় দদ্দ প্রশান্তরাগ, যিনি ছিলেন প্রথম বীতরাগ জয়ভটের পুত্র এবং প্রথম দদ্দের পৌত্র। এই প্রথম দদ্দ সম্ভবত ছিলেন পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যোধপুরের গুর্জররাজ হরিচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। এই দদ্দ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর বংশধরেরা নিজেদের সামন্ত বলেই উল্লেখ করেছেন, কোন রাজকীয় উপাধি নেননি। তবে তাঁরা যে ঠিক কাদের সামন্ত ছিলেন তা বলা কঠিন।

মৌখরিগণ ঃ ট্রাইব হিসাবে মৌখরিগণ খুবই প্রাচীন, যাদের উল্লেখ পাণিনির ব্যাকরণে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত কিছু মৌখরি লেখমালাও পাওয়া গেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।

সে যাই হোক, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বিহারের গয়া অঞ্চলে আমরা একটি মৌখরি রাজত্ব দেখি। এই রাজবংশের তিনজন রাজার নাম জানা গেছে বরাবর ও নাগার্জুনি পাহাড়ে উৎকীর্ণ লেখমালা থেকে। এঁরা হচ্ছেন যজ্ঞবর্মা, তাঁর পুত্র শার্দুলবর্মা এবং তাঁর পুত্র অনন্তবর্মা। এঁরা সকলেই গুপ্তদের সামন্ত রাজা ছিলেন।

কিন্তু মৌখরিদের অপর একটি শাখার সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং এই শাখাটিই পরবর্তীকালে প্রবল হয়ে ওঠে। এদের লেখমালা ও সীলসমূহ থেকে যে বংশতালিকা পাওয়া যায় তাতে প্রথম তিনজন হরিবর্মা, আদিত্যবর্মা ও ঈশ্বরবর্মা মহারাজ উপাধি দ্বারা উল্লিখিত, বাকি চারজন ঈশানবর্মা, শর্ববর্মা, অবন্তীবর্মা ও সু (...) মহারাজাধিরাজ হিসাবে বর্ণিত হয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চতুর্থ রাজা অর্থাৎ ঈশানবর্মা থেকেই মৌখরিরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিল, এবং তার আগে তারা ছিল দক্ষিণ বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশে গুপ্তদের সামন্তরাজা। ঈশানবর্মা শুধু মহারাজাধিরাজ উপাধিই গ্রহণ করেননি, নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রারও প্রচলন করেছিলেন। তাঁর একটি জানা তারিখ ৫৫৪ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ গুপ্তদের পতনকাল। ঈশানবর্মার সঙ্গে পরবর্তী-গুপ্তরাজদের যুদ্ধ হয়েছিল, এবং তাতে তিনি পরাজিতও হয়েছিলেন। আমরা পরে তা দেখব।

ঈশানবর্মা ও তাঁর পরবর্তীদের সম্পর্কে খুব কম কথা জানা যায়, তবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে রচিত বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিতে মৌখরিদের শক্তিশালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশানবর্মা অথবা তাঁর পুত্র শর্ববর্মা হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং তাদের পরাস্তও করেছিলেন। মৌখরিদের মুদ্রা ও লেখমালাসমূহের প্রাপ্তিস্থান থেকে অনুমান করা যায় যে শর্ববর্মা ও তাঁর পুত্র অবন্তীবর্মার সময়ে দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ ছাড়াও প্রায় সমগ্র উত্তরপ্রদেশ তাঁদের অধিকারে ছিল। মৌখরিদের রাজধানী ছিল কনৌজ।

মুদ্রাসমূহের সাক্ষ্য থেকে অনুমতি হয় যে ঈশানবর্মার রাজত্বকাল ছিল আনুমানিক ৫৫০-৫৭৬ খৃষ্টাব্দ, শর্ববর্মার রাজত্বকাল ছিল ৫৭৬-৮০ খৃষ্টাব্দ এবং অবন্তীবর্মার রাজ্যকাল ছিল ৫৮০-৬০০ খৃষ্টাব্দ।

অবন্তীবর্মার পরবর্তী রাজা কে ছিলেন তা নিয়ে সংশয় আছে। বাণভট্টের হর্ষচরিত অনুযায়ী অবন্তীবর্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রহবর্মা থানেশ্বরের পুষ্পভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু নালন্দা থেকে প্রাপ্ত একটি সীলে যে নামটি দেওয়া আছে তার প্রথম অক্ষর সু (…), দ্বিতীয় অক্ষর হয় (…)ব, না হয় (…)চ। ইনি আর যেই হোন নিশ্চয়ই গ্রহবর্মা নন। হতে পারে ইনি গ্রহবর্মার ভাই, তাঁর মৃত্যুর পরে যিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। সে যাই হোক বাণভট্ট যাঁকে অবন্তীবর্মার পুত্র গ্রহবর্মা বলে উল্লেখ করেছেন, এবং যাঁর শোচনীয় মৃত্যুর রাজনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল, তাঁকে আমরা একটি সীলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উড়িয়ে দিতে পারিনা।

পরবর্তী গুপ্তগণ : গুপ্ত উপাধিধারী এই রাজারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরাও আদিতে গুপ্তদের অধীনস্থ সামন্তরাজা ছিলেন। গুপ্তদের সঙ্গে এঁদের রক্তের সম্পর্ক ছিল কিনা বলা শক্ত। গয়ার নিকটে প্রাপ্ত অফসদ লেখমালায় এই বংশের আটজনের নাম দেওয়া আছে যাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে কৃষ্ণগুপ্ত, হর্ষগুপ্ত, জীবিতগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, দামোদরগুপ্ত, মহাসেনগুপ্ত, মাধবগুপ্ত ও আদিত্যসেন। এঁরা কেউই কোন জমকালো রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেননি, নিছক নৃপ উপাধিতেই খুশি ছিলেন।

এই বংশের প্রথম তিনজন সম্পর্কে বিশেষ খবর পাওয়া যায় না, শুধু বলা আছে তৃতীয় রাজা জীবিতগুপ্ত আসমুদ্র হিমাচল অধিকার করেছিলেন, যা নিছক কথার কথা। তবে চতুর্থ রাজা কুমারগুপ্ত সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি মৌখরিরাজ ঈশানবর্মাকে (যাঁর জানা তারিখ ৫৫৪ খৃষ্টাব্দ, এবং রাজ্যকাল মোটামুটি ৫৫০ থেকে ৫৭৬ পর্যন্ত) পরাজিত করেন। মনে রাখা দরকার যে ৫৫৩ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত আসল গুপ্তদের আর কোন উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায় নি, এবং অনুমান করা যায় যে ওই তারিখের কিছু পর থেকে, অর্থাৎ এই কুমারগুপ্তের আমল থেকেই, পরবর্তী গুপ্তরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করে দেন।

পরবর্তী রাজা দামোদরগুপ্ত মৌখরিদের আরও একবার পরজিত করেন। তাঁর প্রতিপক্ষ ঈশানবর্মা ছিলেন, না তাঁর পুত্র শর্ববর্মা ছিলেন, তা বলা যায় না। দামোদরগুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্ত লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর কামরূপ

অভিযানের কথা অফসদ লেখমালায় উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে হর্ষচরিতে বলা হয়েছে যে মহাসেনগুপ্ত মালবের অধীশ্বর ছিলেন।

মহাকূট স্তম্ভলিপির বিবরণ অনুযায়ী চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা (৫৬৭-৫৯৭ খৃষ্টাব্দ) অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ আক্রমণ করেছিলেন। তিব্বতী বৃত্তান্তসমূহ থেকে জানা যায় যে ওখানকার রাজা স্রোন-সান (৫৮১-৬০০ খৃষ্টাব্দ) ভারতের কেন্দ্রীয় অঞ্চল (সম্ভবত উত্তরপ্রদেশ ও বিহার) আক্রমণ করেছিলেন। এই দুটি ঘটনা সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে এই আক্রমণ দুটির ধাক্কা মৌখরিদের সামলাতে হয়েছিল, যার ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এবং সেই সুযোগেই মহাসেনগুপ্ত তাদের এলাকা অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। অথবা এও হতে পারে যে মহাসেনগুপ্তই মগধের উপর সর্বাত্মক আঘাত করতে পেরেছিলেন, এবং এই দুই আক্রমণের ধাক্কা তিনিই সামলে নিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মহাসেনগুপ্তই গুপ্তদের হৃতগৌরব কতক পরিমাণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বলভীর মৈত্রকরাজ প্রথম শিলাদিত্য মালবের পশ্চিমাঞ্চল দখল করেছিলেন, যা আমরা আগেই দেখেছি। কলচুরিরাজ শঙ্করগণ ৫৯৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ উজ্জয়িনী অধিকার করেন। ফলে গোটা মালব অঞ্চলটাই মহাসেনগুপ্তের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই সময়ই শশাংক যিনি সম্ভবত মহাসেনগুপ্তের অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন গৌড়ে (উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মহাসেনগুপ্তের কপালে হয়ত আরও দুর্যোগ ঘটেছিল কেননা তাঁর দুই পুত্র —কুমারগুপ্ত এবং মাধবগুপ্ত—থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের আশ্রিত ছিলেন। প্রভাকরবর্ধন মহাসেনগুপ্তের ভগ্নীপতি ছিলেন। এই দুই ভাই প্রভাকরবর্ধনের দুই পুত্র রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সহচর ছিলেন। কোন ঘটনাচক্রের ফলে নিশ্চয়ই মহাসেনগুপ্তের এই পুত্রদ্বয় রাজ্যচ্যুত হয়ে থানেশ্বরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।

এই সময় দেবগুপ্ত নামক পরবর্তী গুপ্তদেরই কোন শাখাবংশের এক ব্যক্তি মালবে নিজ অধিকার স্থাপন করেন। ইনি গৌড়ের রাজা শশাংকের স্বাধীনতা মেনে নেন এবং তাঁর সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করেন। মহাসেনগুপ্তদের পতনের মূলে এই দেবগুপ্তের হাত থাকলেও থাকতে পারে, তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। মহাসেনগুপ্তের পৌত্র আদিত্যসেন ও তাঁর বংশধরেরা মগধে রাজত্ব করেছিলেন, যা আমরা পরে দেখব।

বঙ্গদেশ : গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে বঙ্গদেশে দুটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। একটি গড়ে উঠেছিল দক্ষিন, পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষ নিয়ে; যার নাম বঙ্গ, অপরটি উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে যার নাম গৌড়। বঙ্গ অঞ্চলের রাজাদের ছয়টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে যেগুলিতে তিনজন রাজার নাম আছে— গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে গোপচন্দ্র ৫০৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আঠারো বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং তারপর ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব রাজত্ব করেন, শেষোক্ত জন রাজত্ব করেছিলেন চোদ্দ বছর। এঁরা তিনজনেই মহারাজাধিরাজ উপাধি নিয়েছিলেন, এবং সমাচারদেব নিজ নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন করেছিলেন। এই তিনজনের মোট রাজত্বকাল আনুমানিক ৫২৫ থেকে ৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। পূর্ববঙ্গ থেকে আরও কিছু নিম্নমানের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। কারা এগুলির প্রচলন করেছিলেন তা জানা যায় না, তবে সেগুলি থেকে দুটি নাম মোটামুটি পড়া যায়, নাম দুটি হল পৃথুবীর এবং সুধন্যাদিত্য। এঁদের খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে স্থান দেওয়া যায়। তবে গোপচন্দ্র-ধর্মাদিত্য-সমাচারদেবের লাইনের সঙ্গে এঁদের কি সম্পর্ক ছিল তা জানা যায় না।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে গৌড়র রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, তবে এটুকু মনে করার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে, পরবর্তী-গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের আমলে, গৌড়ের শাসক শশাংক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শশাংকের আদি ইতিহাস কিছু জানা যায় না, তবে রোটাসগড়ের পার্বত্য-দুর্গের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে শ্রীমহাসামন্ত শশাংক লেখা আছে, যাঁকে গৌড়ের শশাংকের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। সম্ভবত শশাংক গুপ্তদেরই সামন্ত ছিলেন এবং পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বাণভট্ট, এবং হিউয়েন সাঙ উভয়েই শশাংককে গৌড়ের অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার নিকটবর্তী রাঙামাটি।

শশাংকের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে মেদিনীপুর ও গয়া জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে মানবংশ নামক একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই বংশের রাজা শম্ভুযশঃ উড়িষ্যার কিছুটা অঞ্চল জয় করেছিলেন আনুমানিক ৫৮০ খৃষ্টাব্দে এবং ৬০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তা নিজ অধিকারে রেখেছিলেন। এঁকে অথবা এঁর উত্তরাধিকারীকে পরাস্ত করে শশাংক নিজেকে দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কোঙ্গোদের প্রভু বলে ঘোষণা করেন। কোঙ্গোদ বা দক্ষিণ উড়িষ্যায় শৈলোদ্ভবরা রাজত্ব করতেন, এবং তাঁরা

যে ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাংকের নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। শশাংক দক্ষিণে গঞ্জাম জেলার মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত জয় করেছিলেন, পশ্চিমে মগধ তাঁর এলাকাভুক্ত ছিল। পশ্চিমে শশাংক যে অভিযান চালিয়েছিলেন সেটা স্বাভাবিকভাবেই মৌখরিদের কাছে স্বস্তিদায়ক হয়নি, এবং এটাই সম্ভবত থানেশ্বরের পুষ্পভূতিদের সঙ্গে মৌখরিদের রাজনৈতিক মিত্রতার কারণ।

অপরদিকে শশাংকও রাজনৈতিক চাল চেলেছিলেন। তিনি কনৌজের মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার বিরুদ্ধে মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। এদিকে থানেশ্বরের পুষ্পভূতিরাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার বিবাহের ফলে পুষ্পভূতি ও মৌখরিদের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব পাকা হয়। কিন্তু শশাংক-দেবগুপ্ত জোটই আকস্মিকভাবে সাফল্য অর্জন করে। অতর্কিতে, থানেশ্বর থেকে সাহায্য আসার আগেই, শশাংক ও দেবগুপ্তের যুগ্মবাহিনী কনৌজ আক্রমণ করে। গ্রহবর্মা নিহত হন এবং রাজ্যশ্রী বন্দী হন। শশাংক কনৌজের ব্যাপার সমূহ নিষ্পত্তির জন্য সেখানে থেকে যান, কিন্তু দেবগুপ্ত থানেশ্বর অভিমুখে অভিযান করেন। এখানেই সম্ভবত একটি কৌশল গত ভ্রান্তি ঘটেছিল। থানেশ্বরের নূতন রাজা রাজ্যবর্ধন সরাসরি দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর শশাংকের পক্ষে নিজ রাজ্যসীমার বাইরের ব্যাপারে লিপ্ত থাকা সম্ভবপর হয়নি। নিজ দখলীকৃত এলাকার মধ্যেই তিনি তাঁর শক্তি সংহত করেন।

হর্যবর্ধন কোনদিন শশাংকের উপর প্রতিশোধ নিতে পেরেছিলেন কিনা বলা শক্ত। মঞ্জুশ্রীমুলকল্প নামক একটি বৌদ্ধগ্রন্থে শশাংকের বিরুদ্ধে হর্যবর্ধনের যুদ্ধাভিযানের কথা বলা আছে। কতদূর বিশ্বাস্য তা বলা যায় না, কারণ ৬১৯ খৃষ্টাব্দেও উড়িষ্যার শৈলোদ্ভবরা শশাংকের আনুগত্য যে স্বীকার করতেন তার প্রমাণ আছে। হর্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে এবং তিনি রাজত্ব করেছিলেন ৬৪৭ পর্যন্ত। শশাংক মারা গিয়েছিলেন ৬৩৭-৩৮এ। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে তাঁর মৃত্যুকালে মগধ শশাংকেরই অধীনে ছিল। কাজেই হর্যবর্ধন শশাংকের উপর প্রতিশোধ নিতে পারেননি বলে মনে হয়। শশাংকের পর গৌড় ও বঙ্গের রাজনৈতিক চিত্র বড়ই অস্পষ্ট।

নেপালঃ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেপালেরও কিছু ভূমিকা আছে। যদিও নেপালের বৃত্তান্তসমূহে, সেগুলি বংশাবলী নামে পরিচিত,

নেপালের ইতিহাসকে কলিযুগের স্থচনা থেকে টানা হয়েছে, নেপালের রাজনৈতিক ইতিহাস কার্যত শুরু হয়েছে বৃষদেব থেকে যিনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে নেপালের রাজা ছিলেন। বৃষদেবের পুত্র শংকরদেব, তাঁর পুত্র ধর্মদেব, এবং তাঁর পুত্র মানদেব। লেখমালাসমূহের সাক্ষ্য অনুযায়ী মানদেবের রাজত্বকাল ৪৬০ থেকে ৫০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মানদেব লিচ্ছবিবংশীয় ছিলেন এবং তিনি গণ্ডকী নদী অতিক্রম করে মল্লদের পরাজিত করেছিলেন। নেপালী বংশাবলীতে মানদেবের স্থান বিংশতিতম, এবং সেই হিসাবে অনুমান করা যায় যে নেপালে লিচ্ছবি রাজত্বের শুরু হয়েছিল খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতক থেকে। নেপালী লিচ্ছবিদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত যে লিচ্ছবিকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন তাদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা বলা শক্ত। মানদেবের পরবর্তী রাজা ছিলেন মহীদেব ও বসন্তদেব। বসন্তদেবের পর নেপাল কিছুকালের জন্য আভীরদের অধিকারে যায়; কিন্তু লিচ্ছবি রাজা শিবদেব আবার তা পুনরায় অধিকার করেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে অংশুবর্মা নামক এক মহাসামন্ত নেপালের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করেন। তিনি প্রাক্তন লিচ্ছবিদের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ৬১০ থেকে ৬২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। নেপালের বংশাবলী অনুযায়ী রাজা বিক্রমাদিত্য নেপাল জয় করে সেখানে নিজের অব্দ প্রচলন করেন। অনেকে মনে করেন যে হর্ষবর্ধনই ওই বিক্রমাদিত্য। কিন্তু হর্ষবর্ধন যে নেপাল জয় করেছিলেন তার প্রমাণ নেই, বিশেষ করে হিউয়েন সাঙ নিজেই যখন পরলোকগত অংশুবর্মাকে স্বাধীন ও গুণবান নরপতি বলে বর্ণনা করেছেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি চৈনিক কূটনৈতিক মিশন নেপালে আসে, তখন নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকাল। অংশুবর্মা ও নরেন্দ্রদেবের মধ্যবর্তী আরও দুজন রাজা ছিলেন।

গুপ্তোত্তর যুগে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেপালের ভূমিকা গৌণ হলেও কালক্রমে নেপাল যে সেখানে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল তা আমরা পরে দেখব।

কামরূপ ঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কামরূপে একটি রাজবংশেরই শাসন চলেছিল আনুমানিক ৩৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে এবং এই রাজবংশের শাসন দীর্ঘকাল ধরে বজায় ছিল, তিনশো বছরেরও বেশি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব, এবং কামরূপের বিচ্ছিন্নতাই এর জন্য সম্ভবত দায়ী। বাংলাদেশ পেরিয়ে আরও পূর্বদিকে অভিযান করতে খুব কম রাজাই আগ্রহ বোধ করেছিলেন।

কামরূপের উপরি উক্ত রাজবংশের বারজন রাজার নাম পাওয়া গেছে নালন্দায় প্রাপ্ত উৎকীর্ণ লিপি, ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসন এবং সাহিত্যগত উপাদান সমূহ থেকে। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে পুষ্যবর্মা, সমুদ্রবর্মা, কল্যাণবর্মা, গণপতিবর্মা, মহেন্দ্রবর্মা, নারায়ণবর্মা, ভূতিবর্মা, চন্দ্রমুখবর্মা, স্থিতবর্মা, সুস্থিতবর্মা ও সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা। ত্রয়োদশ রাজা ভাস্করবর্মা সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মার ভাই ছিলেন, এবং হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। সেই হিসাবে তাঁর তারিখ খৃষ্টীয় সপ্তম শতক।

এই রাজারা খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে গুপ্তদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কামরূপ ও ডবাক (নওগাঁ অঞ্চল) তাঁর নিকট বশ্যতা স্বীকারকারী প্রত্যন্ত রাজ্য হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত রাজবংশের প্রথম ছয়জন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সপ্তম সম্রাট নারায়ণবর্মা সম্ভবত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি গুপ্তদের অধীনতা অস্বীকার করেন। তিনি দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন বলে জানা গেছে। অষ্টম সম্রাট ভূতিবর্মার সময় কামরূপ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। প্রাচীন ডবাক ও সুর্মা উপত্যকাও তাঁর অধিকারে আসে। কাপিলি উপত্যকায় প্রাপ্ত তাঁর একটি লিপি থেকে তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কথা জানা যায়। তিনি সম্ভবত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র চন্দ্রমুখবর্মা সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও, শেষোক্তের পুত্র স্থিতবর্মা ও পৌত্র সুস্থিতবর্মা সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়া যায়। সুস্থিতবর্মার সঙ্গে পরবর্তী-গুপ্তবংশের রাজা মহাসেনগুপ্তের যুদ্ধ হয় এবং তাতে সুস্থিতবর্মা পরাজিত হন। মহাসেনগুপ্ত যে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তা আমরা পূর্বে দেখেছি। সুস্থিতবর্মার দুই পুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা ও ভাস্করবর্মা। তাঁরা উভয়েই সম্ভবত গৌড়ের অধিপতি শশাংকের নিকট পরাজিত হয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন। পরে ভাস্করবর্মা সে আনুগত্য ত্যাগ করেন, এবং কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাংকবিরোধী জোটে যোগদান করেন।

উড়িষ্যা ঃ গুপ্তযুগে উড়িষ্যা গুপ্তরাজগণের অধীন ছিল কিনা সে বিষয়েও কোন প্রত্যক্ষ তথ্য নেই, তবে দু'একটি লেখমালা এমন সাক্ষ্য দেয় যে উড়িষ্যার রাজ্যগুলি সম্ভবত গুপ্তদের আনুগত্য স্বীকার করত। যেমন খল্লিকোটের নিকট সুমণ্ডল নামক একটি গ্রামে একটি উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে কলিঙ্গরাজ হিসাবে জনৈক পৃথিবীবিগ্রহের নাম উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য আসল

কলিঙ্গ অঞ্চলটি ছিল মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যস্থ উপকূল অঞ্চল যা খারবেলের মৃত্যুর পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য এলাকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই কলিঙ্গের কথা আমরা পরে উল্লেখ করব। সে যাই হোক, আমাদের আলোচ্য লিপি ২৫০ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৫৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে রচিত, এবং এতে গুপ্তদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শিত হয়েছে।

এই পৃথিবীবিগ্রহ, যাঁর এলাকা সম্ভবত কলিঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বর্তমান ছিল, এবং তাঁর বংশ সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ জানা যায় না। তবে এটুকু বিশ্বাস করার কারণ আছে যে ৫৭০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাঁদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে, এবং এই সময় থেকেই উড়িষ্যার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে যথাক্রমে মান ও শৈলোদ্ভবদের প্রাধান্য সূচিত হয়।

হাজারিবাগ থেকে প্রাপ্ত একটি লিপি হতে জানা যায় যে উদয়মান, শ্রীধৌতমান এবং অজিতমান নামক তিনজন বণিক ভ্রাতা অযোধ্যা থেকে তাম্রলিপ্তে এসে বহু সম্পদের অধিকারী হয়, এবং ক্রমশ মেদিনীপুর ও গয়া জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি ছোট রাজ্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়। ষষ্ঠ শতকের শেষে সম্ভবত ওই বংশেরই শম্ভুযশঃ উত্তর ও দক্ষিণ তোসলী অর্থাৎ পুরী ও বালাসোর জেলাদ্বয়ে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই শম্ভুযশের দুটি লিপি পাওয়া গেছে যেগুলির তারিখ যথাক্রমে ৫৮০ ও ৬০৩ খৃষ্টাব্দ।

মানদের দক্ষিণাঞ্চলে শৈলোদ্ভবদের প্রাধান্য বর্তমান ছিল, এবং এঁদের রাজ্যের নাম ছিল কোঙ্গোদ। বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপি থেকে এই রাজবংশের নিম্নোক্ত রাজাদের নাম পাওয়া যায়—রণভীত, তাঁর পুত্র প্রথম সৈন্যভীত-মাধবরাজ, পৌত্র অয়শোভীত, এবং প্রপৌত্র দ্বিতীয় সৈন্যভীত-মাধবরাজ। শেষোক্ত জন ৬১৯ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

মান ও শৈলোদ্ভব উভয় বংশই গৌড়ের অধিপতি শশাংকের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। তবে মানদের ক্ষমতা শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে যায়। শশাংক সোমদত্ত নামক এক ব্যক্তিকে মান এলাকার শাসনভার দেন। ইনি নিজেকে শশাংকের অধীন উৎকল ও দণ্ডভূক্তির সামন্তমহারাজ বলে লেখমালাসমূহে পরিচিত করেন, কিন্তু তাঁর পুত্র ভানুদত্তের লিপিতে শশাংকের নিকট অধীনতার পরিচয় নেই, যা প্রমাণ করে যে শশাংকের মৃত্যুর পরই তিনি স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। শৈলোদ্ভব বংশের দ্বিতীয় সৈন্যভীত মাধবরাজের ৬১৯ খৃষ্টাব্দের একটি লিপিতে শশাংকের নিকট অধীনতার কথা উল্লিখিত থাকলেও,

তাঁর পরবর্তী লিপিসমূহে সে উল্লেখ প্রত্যাহৃত হয়েছে। শশাংকের মৃত্যুর পর তাঁদের স্বাধীনভাবে রাজত্ব করা বেশিদিন সম্ভব হয়নি। অনুমান করার পক্ষে কারণ আছে যে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ হর্ষবর্ধন উড়িষ্যার কিয়দংশ জয় করে নেন। কলিঙ্গদের কথায় আমরা পরে আসছি।

১৫ ॥ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত (পশ্চিমার্ধ)

বাকাটকগণ ঃ দক্ষিণাপথের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে বিন্ধ্যশক্তি এবং তৎপুত্র প্রথম প্রবরসেনের অধীনে বাকাটক শক্তি গড়ে ওঠার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রবরসেন মারা যান খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে। লেখমালাসমূহের সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রবরসেন তাঁর রাজ্য তাঁর দুই পুত্র গৌতমীপুত্র এবং সর্বসেনের মধ্যে ভাগ করে দেন, প্রথমোক্তের বংশধরদের শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র হয় নাগপুর অঞ্চল, এবং শেষোক্তের বংশধরদের কেন্দ্র হয় বৎসগুল্ম, আকোলা জেলায়।

গৌতমীপুত্র সম্ভবত তাঁর পিতা বেঁচে থাকতেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন মহারাজ প্রথম রুদ্রসেন, যিনি তাঁর মাতুল ভারশিব নাগবংশীয় রাজা ভবনাগের সাহায্যে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিলেন। ইনি শৈব ধর্ম অবলম্বী ছিলেন। প্রথম রুদ্রসেনের পর তাঁর পুত্র প্রথম পৃথিবীসেন রাজা হন খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষের দিকে। তাঁর বংশধরদের লেখমালা সমূহে তাঁকে খুব ধার্মিক শৈব রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অধীনস্থ সামন্ত ব্যাঘ্রদেবের দুটি লিপিতেও তাঁর নাম উল্লিখিত আছে।

পৃথিবীসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহারাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেন রাজা হন। ইনি গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তাকে বিবাহ করেছিলেন। গুপ্তদের সঙ্গে বাকাটকদের এই বৈবাহিক সম্পর্ক রাজনীতির দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় রুদ্রসেন মারা যান। অতঃপর তাঁর তিন নাবালক পুত্র দিবাকরসেন, দামোদরসেন ও প্রবরসেনের অভিভাবক হিসাবে প্রভাবতী গুপ্তাই শাসনকার্য চালাতে থাকেন। প্রভাবতী গুপ্তার শাসনকালের ত্রয়োদশ বছরের একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে পুণা থেকে যাতে তিনি যুবরাজ দিবাকরসেনের মাতা বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। দিবাকরসেন সম্ভবত মহারাজপদে অভিষিক্ত হবার আগেই মারা যান। কেননা প্রভাবতী গুপ্তার আর একটি লিপিতে, যা দ্বিতীয় প্রবরসেনের রাজত্ব

কালের উনিশ বছরে রচিত হয়েছিল, তিনি নিজেকে মহারাজ দামোদরসেন ও মহারাজ প্রবরসেনের মাতা বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে এই যে দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র দিবাকর-সেনের হয়ে প্রভাবতী শাসন পরিচালনা করেন। মহারাজ উপাধি গ্রহণ করার আগেই দিবাকরসেনের মৃত্যু হয়। এবং এই ঘটনার পর তাঁর অপর ভাই দামোদরসেন মহারাজ হন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় প্রবরসেন মহারাজ হন। প্রভাবতী গুপ্তা অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রবরসেন পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লেখমালার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে বিদর্ভ অঞ্চল এবং তার সংলগ্ন বহু এলাকায় তাঁর শাসন বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় প্রবরসেনের লেখমালা সমূহে তাঁর আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের 'সেনাপতি' নামক একটি বিশেষ উপাধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপাধির কারণ বোধহয় এই যে এই সব আঞ্চলিক শাসকেরা জায়গীর ভোগ করতেন, এবং সেই জায়গীরের পরিমাণ অনুযায়ী সম্রাটকে সৈন্য জোগাবার দায়িত্ব তাঁদের ছিল। দ্বিতীয় প্রবরসেন প্রাচীন রাজধানী নন্দিবর্ধনের পরিবর্তে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন প্রবরপুর। নন্দিবর্ধনকে কেউ নাগপুরের উত্তরে নগর্ধন বা নন্দরধন শহরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, আবার কেউ আরও মাইল কুড়ি উত্তরে নন্দপুরকেই প্রাচীন নন্দিবর্ধন বলে মনে করেন। প্রবরপুর এই দুই স্থানেরই নিকট ছিল, কেউ কেউ মনে করেন ওয়ার্ধা জেলার পাওনার নামক স্থানটিই প্রাচীন প্রবরপুর। দ্বিতীয় প্রবরসেন কবি ছিলেন, সেতুবন্ধ-কাব্য নামক মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতে লেখা একটি কাব্যকে তাঁরই রচনা বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় প্রবরসেনের পর তাঁর পুত্র মহারাজ নরেন্দ্রসেন বাকাটকদের রাজা হন। অজ্ঝিত ভট্টারিকা নামক কুন্তলবংশীয় এক রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে এই রাজকন্যার পিতা ছিলেন কদম্বরাজ কাকুৎস্থবর্মা। নরেন্দ্রসেনের পুত্র মহারাজ দ্বিতীয় পৃথিবীষেন সম্ভবত বাকাটক-দের আর একটি শাখা বৎসগুল্মীয় রাজা হরিষেনের সঙ্গে এবং নলবংশীয় ভবদত্তবর্মার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দ্বিতীয় পৃথিবীষেনের পর এই পরিবার সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

বৎসগুল্মের বাকাটকগণ ঃ আমরা দেখেছি যে বাকাটকরাজ প্রথম প্রবরসেন তাঁর রাজত্বের অপর একটি ভাগ দিয়েছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র

সর্বসেনকে। এই শাখাটির কেন্দ্র হয় বৎসগুল্ম, বেরারের আকোলা জেলার অন্তর্গত বর্তমান বেসিম। সর্বসেনের পুত্র দ্বিতীয় বিন্ধ্যশক্তি শক্তিমান রাজা ছিলেন। বেসিমে প্রাপ্ত তাঁর উৎকীর্ণ লিপি থেকে অনুমিত হয় যে বেরারের একাংশ এবং প্রাক্তন হায়দ্রাবাদের উত্তরাঞ্চল তাঁর শাসনাধীন ছিল। অজন্তার একটি গুহায় প্রাপ্ত একটি ভাঙাচোরা লিপিতে সর্বসেনের ও বিন্ধ্যশক্তির নাম উল্লেখিত আছে, এবং একথা বলা হয়েছে যে তিনি কুন্তলের এক রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। পূর্বে মনে করা হত যে এই লিপিটি বাকাটকদের মূল বংশের, কিন্তু পরে দেখা গেছে যে ওটি এই বেসিম শাখার।

ওই অজন্তা লিপি অনুযায়ী দ্বিতীয় বিন্ধ্যশক্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন দ্বিতীয় প্রবরসেন যিনি মূল শাখার ওই নামের রাজার থেকে পৃথক। এই প্রবরসেন দীর্ঘদিন জীবিত থাকেননি। পরবর্তী রাজা ছিলেন তাঁর পুত্র দেবসেন। তাঁর নিজের একটি লিপি পাওয়া গেছে যা বৎসগুল্ম থেকে জারি করা হয়েছিল। হস্তিভোজ নামে তাঁর এক মন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায় ঘটোৎকচ গুহালিপি থেকে। পরবর্তী রাজা ছিলেন তাঁর পুত্র হরিষেন, যাঁর আমলে এই অজন্তা-লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। তিনি নিজেকে কুন্তল, অবন্তী, কলিঙ্গ, কোশল, ত্রিকূট, লাট ও অন্ধ্রের অধিপতি বলে দাবিও করেছেন। ওই সকল রাজ্যের সঙ্গে তাঁর সঠিক সম্পর্ক কি ছিল তা বলার উপায় নেই। তাঁর আমলে বাকাটকদের মূল শাখার সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

দাক্ষিণাত্যে বাকাটক শক্তির পতন হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে। তাদের রাজত্বের একটা বড় অংশ চলে যায় নলদের হাতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, পরে চালুক্যরা ওই এলাকায় প্রাধান্য স্থাপন করে।

নলগণ ঃ নলেরা আগে বাস করত উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের জয়পুর-বস্তার অঞ্চলে, এবং সেখান থেকে তারা বাকাটকদের এলাকায় সরে আসে এবং ক্রমশ তা অধিকার করে নেয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে রচিত রিথপুর তাম্রশাসনে নলরাজা ভবত্তবর্মা এবং কদম্বগিরি নামক একটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই তাম্রশাসনটি জারি করা হয়েছিল নন্দিবর্ধন থেকে, যা ছিল বাকাটকদের প্রথম রাজধানী। কদম্বগিরি গ্রামটি হচ্ছে বেরারের ইয়োতমাল জেলার বর্তমান কলম্ব নামক স্থানটি। ভবত্তবর্মা নামটি ভবদত্তবর্মার প্রাকৃত রূপ। এই তাম্রশাসনটি জারি করেছিলেন ভবদত্তবর্মার পৌত্র অর্থপতি।

আর একটি নল-লেখমালা পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যের

সীমানায় কোরাপুট জেলার পোতাগড় নামক স্থানে যাতে ভবদত্তের পুত্র স্কন্দবর্মার নাম আছে এবং বলা হয়েছে যে তিনি পরিত্যক্ত পুষ্করা নগরীতে (পোড়াগড়) পুনরায় জনবসতি ঘটিয়েছিলেন। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা হয় যে এই স্কন্দবর্মা বাকাটকরাজ দ্বিতীয় পৃথিবীষেনের সঙ্গে, দক্ষিণ কোশলের পাণ্ডুবংশী রাজা নন্নের সঙ্গে এবং চালুক্যরাজ প্রায় কীর্তিবর্মার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন।

স্কন্দবর্মার পুত্র অর্থপতির আরও একটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে কোরাপুট জেলার উমরকোট থানার অন্তর্গত কেশরিবেদ নামক গ্রামে। এছাড়া তাঁরা ও তাঁর পিতামহ ভবদত্তের এবং ওই বংশেরই জনৈক বরাহের নামাঙ্কিত কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে বস্তারের কোণ্ডেগাঁও তহশীলের এডেঙ্গ গ্রামে। নলরাজারা বৎসগুল্মের বাকাটক ও মানপুরের রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়, তবে তাঁরা কোন স্থায়ী শক্তি গড়ে তুলতে পারেননি।

ভোজগণ ঃ ভোজেরা খুবই প্রাচীন ট্রাইব, তবে যে সময়ের কথা আমরা বলছি, তখন তারা গোয়া অঞ্চলে রাজত্ব করেছে। এই ভোজদের আমরা একটি তাম্রশাসন পাই যা মিরোদ-লিপি নামে পরিচিত এবং তা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষের দিকে রচিত। এতে দেবরাজ নামক জনৈক রাজার নাম উল্লেখিত আছে যাঁর শাসনকেন্দ্র ছিল চন্দ্রপুর, বর্তমান গোয়ার চান্দোর। গোয়া থেকে তামার পাতে লেখা একটি দানপত্র পাওয়া যায় যাতে জনৈক মহারাজ চন্দ্রবর্মার নাম উল্লিখিত আছে। লিপির ধরন দেখে মনে হয় ওটি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত হয়েছে। এই চন্দ্রবর্মা ভোজবংশের কেউ ছিলেন কিনা তাতে অবশ্য সংশয় আছে। গোয়ার সন্নিকটে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি তাম্রশাসনে—সেগুলি খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে রচিত বলে অনুমান করা হয়—তিনজন ভোজবংশীয় রাজার নাম পাওয়া গেছে পৃথিবীমল্লবর্মা, কাপালিবর্মা এবং অশংকিত। এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বা পূর্ববর্তী ভোজবংশীয় রাজাদের সঙ্গে এঁদের কি সম্পর্ক ছিল তা জানা যায় না।

ত্রৈকূটকগন ঃ অপরান্ত বা উত্তর কোংকনের ত্রিকূট পাহাড়ের নাম অনুসারেই ত্রৈকূট ট্রাইবের নামকরণ হয়েছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন অবশ্য ত্রৈকূটরা ট্রাইবাল পর্যায়ে ছিল না। ত্রৈকূট রাজবংশ প্রথমে আভীরদের অধীনে সামন্তরাজা ছিল। চন্দ্রবল্লী লিপি থেকে জানা যায় যে আভীর ও ত্রৈকূটগণ একযোগে কদম্বরাজ ময়ূরশর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মাঝামঝি সময়ে। লেখমালা ও মুদ্রাসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে তিনজন ত্রৈকূটক মহারাজা সুরাট থেকে কানহেরী পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। এঁরা ছিলেন ইন্দ্রদত্ত, তৎপুত্র দহ্রসেন এবং তৎপুত্র ব্যাঘ্রসেন। ত্রৈকূটকদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গুর্জর এবং কলচুরিরা ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাদের উৎখাত করে।

কলচুরিগণ : খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং মালবের কিছু অংশে কলচুরিগণ প্রাধান্য অর্জন করেছিল। লেখমালাসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে জনৈক কৃষ্ণরাজ এই রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর পুত্র শংকরগণ খুব শক্তিমান রাজা ছিলেন। নাসিক জেলায় অহবোন নামক স্থানে তাঁর একটি লিপি পাওয়া গেছে যা ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত। ওই লিপি থেকে অনুমিত হয় যে শংকরগণ দক্ষিণে নাসিক থেকে মালব পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তাঁর পুত্র বুদ্ধরাজের বাদনের লিপি (৬০৮ খৃষ্টাব্দ) থেকে জানা যায় যে তিনি মালবের পুর্বাঞ্চলও জয় করেছিলেন। এঁর সঙ্গে চালুক্যরাজ মঙ্গলেশের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল। ৬০২ খৃষ্টাব্দে রচিত মঙ্গলেশের একটি লিপিতে বুদ্ধরাজের উপর তাঁর বিজয়লাভের কথা বলা আছে, কিন্তু পূর্বোক্ত বাদনের-লিপির সাক্ষ্য অন্যরূপ। হতে পারে কলচুরি রাজ্যের দক্ষিণের কিছু এলাকা মঙ্গলেশ দখল করেছিলেন। পরে অবশ্য চালুক্যেরা কলচুরিদের পরাজিত করে একটি গৌণ শক্তিতে পরিণত করেছিল।

৫৯৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মনকানি-লিপিতে কলচুরিবংশীয় জনৈক মহারাজ নন্ন ও তাঁর পুত্র তরলস্বামীর উল্লেখ পাওয়া গেছে যাঁরা গুজরাত অঞ্চলে রাজত্ব করতেন এবং সম্ভবত কলচুরিদের একটি শাখাবংশের লোক ছিলেন।

মানপুরের রাষ্ট্রকূটগণ : লেখমালাসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনৈক মানাঙ্ক রাষ্ট্রকূট রাজবংশের শাসন প্রবর্তন করেন। এঁদের শাসনকেন্দ্র ছিল মানপুর, বর্তমান সাতারা জেলার অন্তর্গত মান। এই মানাঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর বংশধর অভিমন্যুর উণ্ডিকবাটিকা-লিপি থেকে। সম্ভবত ইনি বাকাটকদের সামন্তরাজা ছিলেন এবং সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর নাতি অবিধেয়ের পাণ্ডুরঙ্গপল্লী-লিপি থেকে জানা যায় যে মানাঙ্ক বিদর্ভ ও অশ্মক জয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবরাজ রাজা হন। দেবরাজের তিন পুত্রের মধ্যে এক

পুত্র অবিধেয় যাঁর পাণ্ডুরঙ্গপল্লী-লিপির কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দেবরাজের আর এক পুত্রের নাম ভবিষ্য, এবং তাঁর পুত্র ছিলেন অভিমন্যু। অভিমন্যুর পর এই বংশের ইতিহাস সুস্পষ্ট নয়। মানপুরের এই রাষ্ট্রকূটেরা মৌর্য অথবা নলদের দ্বারা উৎখাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং পরে চালুক্যরা গোটা দক্ষিণ মহারাষ্ট্র অঞ্চলটাই দখল করে নেয়।

বেরারের রাষ্ট্রকূটগণঃ মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় তিওয়ারখেদ এবং মুলতাই নামক স্থানে দুটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, যা থেকে জানা যায় যে বেরার অঞ্চলে আরও একটি রাষ্ট্রকূট বংশ রাজত্ব করেছিল। ওই তাম্রশাসন দুটি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন নন্নরাজ যাঁর তারিখ ৭০৯ খৃষ্টাব্দ, যেখানে মোট চারজন রাজার নাম দেওয়া হয়েছে—দুর্গরাজ, গোবিন্দরাজ, স্বামিকরাজ এবং নন্নরাজ। দুর্গরাজ সপ্তম শতকের মাঝামাঝি আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনুমান করা যায় যে তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাষ্ট্রকূট বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

১৬॥ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণভারত (পূর্বার্ধ)

অন্ধ্রের আনন্দগণঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষের দিকে অন্ধ্র অঞ্চল কাঞ্চীর পল্লবদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। অন্ধ্রের গুণ্টুর জেলা ও তার চারদিকের কিছু অঞ্চলকে মুক্ত করে আনন্দ নামে একটি রাজবংশ। এই বংশের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গেছে—কন্দর, অত্তিবর্মা ও দামোদরবর্মা—যাঁরা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্য থেকে পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের রাজধানী ছিল কন্দরপুর, গুণ্টুর জেলার বর্তমান চেজার্‌লা অঞ্চল। ওখানে প্রাপ্ত কন্দরের দৌহিত্র সৎসভামল্লের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে কন্দর ধান্যকটক (অমরাবতী) অঞ্চলে একটি যুদ্ধে পল্লবদের পরাজিত করেছিলেন। পল্লবদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধেই এই বংশের ধ্বংস হয়।

শালংকায়নগণঃ শালংকায়নরা কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যাঞ্চলের পূর্বভাগে রাজত্ব করত, তাদের রাজধানী ছিল বেঙ্গী, বর্তমান গোদাবরী জেলার এলোরের নিকট পেদ্দা-বেগি। টলেমি তাঁর ভূবৃত্তান্তে এদের *Salakenoi* বলে উল্লেখ করেছেন। শালংকায়নগণ আগে সাতবাহনদের অধীন ছিল। বিভিন্ন লেখমালার ভিত্তিতে জানা যায় যে স্বাধীন শালংকায়ন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম হস্তিবর্মা। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র প্রথম নন্দিবর্মা। প্রথম নন্দিবর্মার

দুই পুত্র—দ্বিতীয় হস্তিবর্মা ও স্কন্দবর্মা। দ্বিতীয় হস্তিবর্মার পুত্র চণ্ডবর্মা, স্কন্দবর্মার পুত্র দ্বিতীয় নন্দিবর্মা।

প্রথম হস্তিবর্মা নিঃসন্দেহে বেঙ্গীর সেই রাজা যাঁকে চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেছিলেন। বাকি রাজারা পঞ্চম শতকের শেষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পল্লবরাজ সিংহবর্মার মঙ্গলুর-লিপি থেকে জানা যায় যে পঞ্চম শতকের শেষের দিকে শালংকায়নরা পল্লবগণ কর্তৃক পরাজিত হয়।

বিষ্ণুকুণ্ডীগণঃ বিষ্ণুকুণ্ডীদের আদি নিবাস ছিল কুর্ণুল জেলার শ্রীশৈল পাহাড়ের ৬০ মাইল পূর্বে বিনুকোন্দ নামক স্থানে। প্রথম যে বিষ্ণুকুণ্ডী রাজার নাম পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন বিক্রমহেন্দ্র (আনুমানিক ৫০০ খৃষ্টাব্দ) যাঁর নাম তাঁর পুত্রের লিপিতে উল্লিখিত আছে। বিক্রমহেন্দ্রর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র গোবিন্দবর্মা যাঁর কোন লিপি এখনও পাওয়া যায়নি। তৃতীয় রাজা, গোবিন্দবর্মার পুত্র প্রথম মাধববর্মার (৫৩৫-৮৫ খৃষ্টাব্দ) সময় থেকেই বিষ্ণুকুণ্ডীদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই মাধববর্মা এগারোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন যা তাঁর শক্তির পরিচায়ক। প্রায় সমগ্র অন্ধ্র অঞ্চলে তাঁর প্রাধান্য ছিল। তাঁর পোলামুরু-লিপিতে উল্লেখিত আছে যে তিনি পূর্বাঞ্চল জয় করার জন্য গোদাবরী নদী অতিক্রম করেছিলেন। মাধববর্মা বাকাটকবংশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মা প্রথম মাধববর্মার উত্তরাধিকারী হন।

দ্বিতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইন্দ্রভট্টারকবর্মা আনুমানিক ৫৯০ থেকে ৬২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রামতীর্থম-তাম্রশাসন থেকে অনুমিত হয় যে তিনি পূর্বদিকে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই তাম্রশাসনটি থেকে জানা যায় যে বর্তমান ভিজাগাপটম জেলাটিও তাঁর অধিকারে ছিল। কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে ইন্দ্রভট্টারকবর্মাকে পূর্বাঞ্চলীয় একটি শক্তিজোটের সম্মিলিত আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছিল যা তাঁর অবস্থাকে বিপন্ন করে তুলেছিল।

পরবর্তী রাজা ছিলেন ইন্দ্রভট্টারকবর্মার পুত্র তৃতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মা (৬২০-৩১ খৃঃ) যিনি তঁর রাজত্বের দশম বৎসরে এল্লোরের নিকটবর্তী দেন্দুলুরু নামক স্থান থেকে একটি সনদ জারি করেছিলেন যা চিক্কুল্লা লিপি নামে পরিচিত। তৃতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মার সময়ে, সম্ভবত ৬৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজত্ব কালের শেষ বছরে, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী বিষ্ণুকুণ্ডীদের রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং

এল্লোরের নিকটবর্তী কোল্লেরু হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত একটি দুর্গ অধিকার করেন। চালুক্যদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধেই বিষ্ণুকুণ্ডীদের পতন ঘটে।

বিষ্ণুকুণ্ডীদের বংশতালিকা নিয়ে একটু গোলমাল আছে। যে তালিকা আমরা অনুসরণ করেছি তা হচ্ছে, বিক্রমহেন্দ্রবর্মা (৫০০), গোবিন্দবর্মা, মাধববর্মা (৫৩৫-৮৫), দ্বিতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মা, ইন্দ্রভট্টারকবর্মা (৫৯০-৬২০), তৃতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মা (৬২০-৬৩১)। কিন্তু কয়েকটি লেখমালার সাক্ষ্য ভিন্নরূপ হওয়াতে কেউ কেউ নিম্নলিখিত বংশতালিকা উপস্থাপিত করেছেন প্রথম মাধববর্মা (৪৪০-৬০), প্রথম বিক্রমেন্দ্রবর্মা (৪৬০-৮০), ইন্দ্রভট্টারকবর্মা (৪৮০-৫১৫), দ্বিতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মা (৫১৫-৩৫), গোবিন্দবর্মা (৫৩৫-৫৬), তৃতীয় মাধববর্মা (৫৫৬-৬১৬)।

কলিঙ্গের রাজবংশসমূহ : সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে যে সব রাজা তৎকর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে তাঁদের অনেকেরই রাজ্য কলিঙ্গ অঞ্চলে, অর্থাৎ মহানদী ও গোদাবরীর অন্তর্বর্তী উপকূল অঞ্চলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এঁরা ছিলেন কোট্টুরের স্বামিদত্ত, পিষ্ঠপুরের মহেন্দ্রগিরি, এরণ্ডপল্লের দমন এবং দেবরাষ্ট্রের কুবের। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পিষ্ঠপুর বর্তমান পূর্ব-গোদাবরী জেলার পিঠাপুরম, এবং দেবরাষ্ট্রকে কেউ কেউ ভিজাগাপটম জেলার এল্লামাঞ্চিলি তালুকে নির্দিষ্ট করেন। এই রাজ্যগুলির ইতিবৃত্ত কার্যত আমাদের অজানা।

উমবর্মা নামক জনৈক কলিঙ্গাধিপতির কিছু লেখমালা পাওয়া গেছে সিংহপুরম (বর্তমান চিকাকোলের নিকটবর্তী সিঙ্গুপুরম) এবং বর্ধমানপুর (ভিজাগাপটমের পালকোণ্ড-তালুকের অন্তর্গত বদম) থেকে। তাঁর উত্তরাধিকারী ও পুত্র চণ্ডবর্মারও কয়েকটি লেখমলা পাওয়া গেছে যা থেকে অনুমিত হয় যে তাঁরা পিতৃভক্ত নামক একটি বংশের অন্তর্গত ছিলেন এবং তাঁদের রাজধানী ছিল সিংহপুর। নন্দপ্রভঞ্জনবর্মা নামে আরও একজন রাজার সন্ধান পাওয়া গেছে যাঁর চিকাকোল-লিপিতে পিতৃভক্ত শব্দটি আছে। এঁদের সম্পর্কে আর কোন খবর জানা যায় না।

পিষ্টপুর, অর্থাৎ বর্তমান পূর্ব গোদাবরী জেলার পিঠাপুরম অঞ্চলে মাঠর-বংশ বলে একটি রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায় যে বংশের রাজা শক্তিবর্মার রগোলু-লিপি থেকে জানা যায় যে তাঁরা পিষ্টপুর অঞ্চল থেকে মধ্য-কলিঙ্গের পিতৃভক্তদের এলাকায় অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন। ওই মাঠর বংশের

অনন্তশক্তিবর্মার সিংহপুর থেকে জারি করা সকুনক লিপি থেকেও এই কথা প্রমাণিত হয় কেননা সিংহপুর ছিল পিতৃভক্তদের শাসন কেন্দ্র। অনন্তশক্তিবর্মা ছিলেন সম্ভবত শক্তিবর্মার পৌত্র। অনন্তশক্তিবর্মার পিতা এবং শক্তিবর্মার পুত্র ছিলেন প্রভঞ্জনবর্মা যাঁর নিনগোন্দি তাম্রশাসন ওই সিংহপুর থেকেই জারি করা হয়েছিল।

কলিঙ্গ অঞ্চলে আরও একটি রাজবংশের পরিচয় আমরা পাই যা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ ও ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ভিজাগাপটম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বংশটি বাসিষ্ঠ নামে পরিচিত, এবং এই বংশের রাজা অনন্তবর্মার শ্রুঙ্গবরপুকোট এবং সিরিপুরম-লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি প্রভঞ্জনবর্মার পুত্র ও গুণবর্মার পৌত্র এবং তাঁরা দেবরাষ্ট্রের অধিপতি। সিরিপুর বা শ্রীপুর (ভিজাগাপটমের অন্তর্গত আধুনিক সিরিপুরম) থেকে জনৈক বিশাখবর্মা নামক রাজা একটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন, যা কোরোষণ্ড-লিপি নামে পরিচিত। এই বিশাখবর্মার সঙ্গে পূর্বতন রাজাদের সম্পর্ক কি ছিল তা সঠিক জানা যায়না।

কলিঙ্গ অঞ্চলে খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে যখন এই ক্ষুদ্র শক্তিগুলি পরস্পরের মধ্যে লিপ্ত, সেই সময়ে গঙ্গবংশীয় রাজারা মধ্য কলিঙ্গে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন, আর নিম্ন কলিঙ্গ অর্থাৎ পিষ্টপুর অঞ্চল চালুক্যদের অধীনে চলে এসেছিল। এই গঙ্গরা পূর্ব-গঙ্গ নামে পরিচিত। সম্ভবত এঁরা মহীশূর অঞ্চলের গঙ্গদের শাখা। এঁদের রাজধানী ছিল কলিঙ্গ নগর, গঞ্জাম জেলার বর্তমান মুখলিঙ্গম। এ ছাড়া আরও একটি শাসনকেন্দ্র ছিল, যার নাম দন্তপুর, চিকাকোলের নিকটবর্তী দন্তবক্ত্র।

পূর্ব-গঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম ইন্দ্রবর্মা, যিনি লেখমালাসমূহে নিজেকে ত্রিকলিঙ্গপতি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখমালাসমূহ গুপ্তাব্দ অনুসারী এবং সেই হিসাবে তাঁর শাসনকালকে ৪৯৬ থেকে ৫৩৫ এর মধ্যে ফেলা হয়েছে। পরবর্তী রাজা ছিলেন হস্তিবর্মা, যিনি রাজসিংহ এবং রণভীত নামেও পরিচিত, যাঁর লেখমালা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি ৫৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্মা, যাঁর জানা তারিখ ৫৮৩ ও ৫৮৭ খৃষ্টাব্দ। পরবর্তী রাজা ছিলেন যথাক্রমে তৃতীয় ইন্দ্রবর্মা (৬২৪ খৃঃ) ও চতুর্থ ইন্দ্রবর্মা। শেষোক্ত রাজা নিজেকে জনৈক দানার্ণবের পুত্র বলে পরিচিত করেছেন। এঁর জানা তারিখ ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ। এর পর দেবেন্দ্রবর্মা (৬৭৯-৬৯১ খৃঃ) ও তাঁর পুত্র অনন্তবর্মা (৭০১ খৃঃ)। অনন্তবর্মার দুই পুত্র

নন্দবর্মা (৭১৭ খৃঃ) এবং দ্বিতীয় দেবেন্দ্রবর্মা (৭৫০খৃঃ)। এই পূর্ব-গঙ্গ রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে গঙ্গদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, যা আমরা পরে দেখব।

পূর্ব বা আদি গঙ্গবংশের আর একটি শাখা রাজত্ব করত শ্বেতক নগরে (গঞ্জাম জেলার সোমপেটা তালুকের অন্তর্গত চিকতি)। এই বংশের প্রথম রাজা জয়বর্মা প্রথমে কলিঙ্গ নগরের গঙ্গদের রাণক বা সামন্ত ছিলেন। তিনি যে ৬১৬ খৃষ্টাব্দেও বর্তমান ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর গঞ্জাম-লিপি থেকে। এই বংশের-অপরাপর যে সব রাজাদের নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হচ্ছেন সামন্তবর্মা (সপ্তম শতক) ও ইন্দ্রবর্মা (অষ্টম-নবম শতক)।

দক্ষিণ কোসলের রাজবংশসমূহ ঃ দক্ষিণ কোসল বলতে বোঝাত মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার রায়পুর-বিলাসপুর-সম্বলপুর অঞ্চল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তৎকর্তৃক পরাজিত দক্ষিণ কোসলের রাজা মহেন্দ্রের উল্লেখ আছে যিনি চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন। রায়পুরের আরঙ্গ নামক স্থানে জনৈক মহারাজ দ্বিতীয় ভীমসেনের একটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে (গুপ্তাব্দ ২৮২, অর্থাৎ ৬০১ খৃষ্টাব্দ) যাতে একটি রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায়। বংশধারাটি হচ্ছে ঃ শূর, প্রথম দৈত্য, বিভীষণ, প্রথম ভীমসেন, দ্বিতীয় দৈত্যবর্মা, দ্বিতীয় ভীমসেন। তাহলে বুঝতে হবে এই রাজবংশ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে চালু হয়েছিল।

দক্ষিণ কোসল অঞ্চলে আর একটি রাজবংশ ছিল শরভপুরে। এই শহরটির সঠিক অবস্থান জানা না গেলেও তা যে রায়পুর অঞ্চলেই ছিল তা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয়। এই বংশেব প্রতিষ্ঠাতা শরভ ও তাঁর পুত্র নরেন্দ্রের নাম পাওয়া যায় শেষোক্তের পিপরদুলা এবং কুরুদ লেখমালা থেকে। এঁরা পঞ্চম শতকের শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন। ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে শরভপুরের সিংহাসন চলে যায় প্রসন্ন নামক এক রাজার হাতে যাঁর নামাংকিত কিছু রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। তাঁর পরবর্তী রাজারা ছিলেন জয়রাজ, মানমাত্র-দুর্গরাজ, সুদেবরাজ ও প্রবররাজ। শেষোক্তজন ষষ্ঠ-শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরে পাণ্ডুবংশীরা দক্ষিণ কোসলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

প্রথম পাণ্ডুবংশী (সোমবংশী) রাজার নাম তীবর, যাঁর শ্রীপুরে উৎকীর্ণ রজিম ও বলোদ লিপিদ্বয় থেকে জানা যায় যে তিনি নিজেকে সমগ্র কোসলের

অধিপতি হিসাবে উল্লিখিত করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল নন্ন, পিতামহের নাম ইন্দ্রবল ও প্রপিতামহের নাম উদয়ন। তীবরের উত্তরাধিকারী হন তাঁর ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত (অবশ্য অন্য সূত্র থেকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নন্নের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়)। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র হর্ষগুপ্ত মৌখরি ঈশানবর্মার অধীনস্থ সামন্ত সূর্যবর্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। হর্ষগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন বালার্জুন যিনি শিবগুপ্ত ও মহাশিবগুপ্ত উপাধি নিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন, কেননা তাঁর রাজত্বের ৫৭তম বছরে তিনি একটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। দক্ষিণ কোসলের পাণ্ডুবংশীদের পরবর্তী ইতিহাস কিছুটা অন্ধকারময়। লেখমালাসমূহের সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে বালার্জুনের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই দক্ষিণ কোসল পাণ্ডুবংশীদের হাতছাড়া হয় এবং নলেরা ওই অঞ্চল দখল করে। পরবর্তী যুগের সোমবংশীদের সঙ্গে দক্ষিণ কোসলের পাণ্ডুবংশীদের ঠিক কি রকম সম্পর্ক ছিল তা জানা যায় না।

মেকলের পাণ্ডুবংশীগণ : প্রাচীন মেকল দেশটি ছিল বর্তমান অমরকণ্টক পর্বতমালা অঞ্চলে। মেকল থেকে উৎপন্ন মৈকল নামটি ওই পর্বতমালাকে বোঝাবার জন্য আজও ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ কোসলের পাণ্ডুবংশীদের একটা শাখা এখানে রাজত্ব করত খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে। রেওয়ার অন্তর্গত সোহাগপুর তহশীলের বমহানি নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে এই বংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায় যাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে জয়বল, বৎসরাজ, নাগবল এবং ভরতবল। প্রথম দুজন সম্ভবত গুপ্তদের সামন্ত ছিলেন, এবং শেষ দুজনের সময় মেকলের পাণ্ডুবংশীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বাকাটকরাজ নরেন্দ্রসেন তাঁর একটি লিপিতে কোসল, মেকল ও মালবের আনুগত্য দাবি করেছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে যে পঞ্চম শতকের তৃতীয় পাদে এই রাজ্যগুলি কিছুকালের জন্য বাকাটকদের সামন্তরাজ্য হিসাবে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

কনৌজ-বাদামি-কাঞ্চী

১॥ পূর্বাভাস

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের যেটুকু গতিবিধি লক্ষ্য করা গেল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই ইতিহাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও রাজবংশেরই ভূমিকা সর্বাধিক ব্যাপক, মাঝে মাঝে বৃহৎ রাজশক্তি অবশ্য গড়ে উঠেছে, কিন্তু সেটা যেন ব্যতিক্রমই। মৌর্য, কুষাণ বা গুপ্ত সাম্রাজ্য না গড়ে উঠলেও ক্ষতি ছিল না, কেননা সেগুলি ইতিহাসের গতিপথে খুব সামান্যই গুণগত পরিবর্তন এনেছিল। এর কারণ অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনের চিহ্ন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতে দেখা যায় নি। ভারতীয় অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষিনির্ভর। বৃত্তিমূলক উৎপাদন সমূহের ক্ষেত্র, পরিধি ও পদ্ধতি ছিল বাঁধা, এবং স্মৃতিগ্রন্থগুলি এই ছকবদ্ধতাকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। চতুর্বর্ণমূলক জীবনাদর্শকে এমনভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল যে সমাজের উপর তলায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণ নিয়ে দ্বিজ ও নীচের তলায় বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মে নিযুক্ত শূদ্রদের ভূমিকা কাগজে কলমে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার দার্শনিক শংকরের মত লোকও— যিনি জগতকে মিথ্যা, মায়া, ভ্রম বলে উড়িয়ে দিয়েছেন—চতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে মায়া বা মিথ্যা বলতে পারেননি। জগত মিথ্যা হলেও জাতিভেদ মিথ্যা নয়। তাই শংকরের মত দার্শনিককেও দেখা যায় প্রতি পদে পদে মনুকে অথরিটি হিসাবে মানতে।

বলাই বাহুল্য এই অনড় সমাজব্যবস্থা সামান্য কিছু ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা ভিন্ন আর কিছু প্রসব করতে পারেনি, আর তারই ফলে হয়ত কোন ছোট রাজা শক্তি সঞ্চয় করে তাঁর পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকা দখল করেছেন, আবার অপরের দ্বারা উৎখাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, এই রকম ঘটনাই ঘটেছে বারবার। কখনও কখনও পালে একটু হাওয়া লেগেছে, এবং সে হাওয়া এনেছে বৈদেশিক

বাণিজ্য। এই বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আহরিত উদ্বৃত্ত যখন কোন রাজার হাতে জমা হয়েছে, তা তাঁকে অপরের তুলনায় অনেকটা বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছে। স্থান, কাল ও অবস্থার সুযোগ নিয়ে যিনি এভাবে ওই উদ্বৃত্তকে শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পেরেছেন, তিনিই আকস্মিক ভাবে অপরাপর পার্শ্ববর্তী রাজাদের চেয়ে অনেকখানি বেড়ে গেছেন, এবং এই ধরনের ঘটনার কিছু নিদর্শন ভারত ইতিহাসে মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে।

আমরা আগে দেখেছি, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সমকালীন রোমক সাম্রাজ্যের পতন, যার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের দুয়ার অকস্মাৎ ভারতের সামনে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় শতবর্ষ এই অবস্থা চলে এবং লক্ষ্যণীয় যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘকাল কোন বড় শক্তি গড়ে উঠতে পারেনি, এবং এই দুই-এর মধ্যে সম্পর্ককে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আবার কিছুটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে, বিশেষ করে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে, যেসব দেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেগুলি ছিল পূর্বে চীন ও ইন্দোনেশিয়া, এবং পশ্চিমে আরব, পারস্য ও ইথিওপিয়া। পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য, অর্থাৎ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, তবে তা হত পারসিকদের মাধ্যমে। দুর্গমতার জন্য স্থলপথের চেয়ে জলপথই অধিকতর ব্যবহৃত হত, এবং সেদিক থেকে উত্তরের চেয়ে দক্ষিণ ভারতই কিছু বেশি সুবিধা পেয়েছিল। এবং এই কারণেই আমরা দেখি যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে উত্তরের তুলনায় দক্ষিণই ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করেছে। উত্তরের বন্দর বলতে পশ্চিমে গুজরাত-সৌরাষ্ট্রের বন্দরগুলি এবং পূর্বে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত ভিন্ন আর কিছু ছিল না। এবং লক্ষ্যণীয় যে বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্তে এই দুই অঞ্চলের রাজারা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। হর্ষবর্ধনের মত শক্তিশালী রাজাও এই দুই অঞ্চলে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করেছিল দক্ষিণ। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট হর্ষবর্ধন শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। বহির্বাণিজ্যে চালুক্যরা যে রীতিমত উন্নতি করেছিল তার প্রমাণ হিসাবে চালুক্যদের সঙ্গে পারসিকদের সুনিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয় পুলকেশী পারস্যরাজ খুসরুর কাছে (৫৯০-৬২৮

খৃঃ) দূত ও উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, যার পিছনে বাণিজ্যিক স্বার্থই ছিল স্বাভাবিকভাবে সর্বপ্রধান।

বহির্বাণিজ্যের দ্বারা দক্ষিণে যে বিপুল উদ্বৃত্ত জমা হয়েছিল তা ব্যবহৃত হয়েছিল দু'ভাবে—স্থাপত্যে-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এবং যুদ্ধবিগ্রহে। সপ্তম শতক থেকে দক্ষিণের দুটি শক্তিমান রাজ্য—চালুক্য ও পল্লব—একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছে, এবং এই লড়াই চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, দক্ষিণের উত্তরাঞ্চল বনাম দক্ষিণের দক্ষিণাঞ্চল, সেই বাহমনী-বিজয়নগর রাজ্যের যুগ পর্যন্ত। ঘটনা-চক্রে মাঝে মাঝে যখনই দক্ষিণে একটি শক্তিই প্রধান হয়ে উঠেছে, সেই শক্তি অনিবার্যভাবেই উত্তর ভারতে হামলা চালিয়েছে, এবং উত্তর বারবার ঘা খেয়েছে, দক্ষিণী শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারেনি। দক্ষিণের এই রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের উপর তার সাংস্কৃতিক বিজয়ও লক্ষণীয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করব।

২॥ গুপ্তযুগের রাজনৈতিক আদর্শ ও তার উত্তরাধিকার

মূলত স্মৃতিগ্রন্থসমূহ—মনু, নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন রচিত স্মৃতিগ্রন্থসমূহ—বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুপুরাণ, কামন্দকের নীতিসার এবং সমসাময়িক গ্রন্থসমূহ থেকে দেখা যায় যে, ছোট বড় সকল ক্ষেত্রেই রাজা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে গণ্য করছেন। স্মৃতিগ্রন্থ ও পুরাণগুলি খোলাখুলি রাষ্ট্রের দৈব-উদ্ভব মতবাদ (Theory of Divine Origin) ব্যক্ত করেছে। রাষ্ট্র সৃষ্টি বিধাতারই অভিপ্রায়, এবং রাজা তাঁরই প্রতিনিধি, এই কথাই হচ্ছে ওই মতবাদের সারকথা। পূর্ববর্তীকালের পালি গ্রন্থসমূহে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে সামাজিক-চুক্তি মতবাদের অনুরূপ একটি মতবাদ পাওয়া যায়। পরবর্তী বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে যেমন বসুবন্ধুর অভিধর্মকোশ এবং বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধিমগ্‌গে অনুরূপ মতবাদের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, কিন্তু বৌদ্ধ রাজারাও দৈব-উদ্ভব মতবাদে বাস্তবে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজার কর্তব্য সম্পর্কে স্মৃতি-পুরাণাদি গ্রন্থসমূহ যে নির্দেশ দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে রাজা চতুর্বর্ণমূলক সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করবেন, অর্থাৎ শ্রমদাতা ও শ্রম-ফলভোগীর পার্থক্যটা পুরোদস্তুর বজায় থাকতে দেবেন। বৌদ্ধ রাজাদের সামনে এইরকম কোন ধর্মশাস্ত্রীয় আদেশ না থাকলেও বাস্তবে ওই ব্যবস্থা বজায় রাখা তাদের পক্ষেও অলাভজনক হয়নি।

৩ ॥ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের শাসনব্যবস্থা

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের শাসনব্যবস্থা পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে গুণগতভাবে পৃথক ছিল না, পরবর্তীকালেও ওই ব্যবস্থাই বর্তমান ছিল। যেহেতু রাজা নরদেহে ঈশ্বর সেই হেতু তিনি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস, তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হওয়া ভিন্ন আর কোন বিকল্প নেই। এই আদেশ প্রতিপালিত হবে রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একটি সুগঠিত আমলাতন্ত্রের দ্বারা, বিভিন্ন পদাধিকারীর বিভিন্ন নাম, যে কথায় আমরা পরে আসছি। বৃহৎ রাজার অধীনে ছিলেন অনেক সামন্ত রাজা, তাঁরাও নিজেকে তাঁদের এলাকাসমূহে ঈশ্বর মনে করতেন এবং তাঁরাও শাসন করতেন ওই একই আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে। বৃহৎ রাজা ও তাঁর অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের ক্ষমতা ও কার্যধারার পার্থক্য ছিল নিছক পরিমাণগত।

এর পর আমরা বিভিন্ন পদাধিকারীদের নাম করছি : সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে রাজা উল্লিখিত হয়েছেন মর্তে বাসকারী দেবতা হিসাবে। গুপ্ত রাজারা মহারাজাধিরাজ, পরমরাজাধিরাজ, রাজরাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। রাজপুত্রেরা পূর্ববর্তী যুগের মতই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। রাজকীয় আমলাতন্ত্র গঠিত হ'ত মন্ত্রী, মহাবলাধিকৃত (প্রধান সেনাপতি), মহাদণ্ডনায়ক (সেনাপতি), মহাপ্রতিহার (আভ্যন্তরীণ বিষয়ক প্রধান), সন্ধিবিগ্রহিক (বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী) প্রভৃতি নিয়ে। এঁদের উপর ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দায়িত্ব।

গুপ্তযুগে প্রদেশ সমূহকে বলা হত ভুক্তি। এইগুলি যাঁরা শাসন করতেন তাঁদের বলা হত উপরিক। প্রদেশগুলি বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত ছিল, জেলাগুলিকে বলা হত বিষয়। বিষয়গুলির ভারপ্রাপ্ত শাসকদের বলা হত কুমারামাত্য, আয়ুক্তক এবং বিষয়পতি।

মালব অঞ্চলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার নাম ছিল রাজস্থানীয়। বলভীর মৈত্রকরা উপরিউক্ত পদসমূহ ছাড়াও দ্রাঙ্গিক, ধ্রুবাধিকরণিক, চৌরোদ্ধারণিক, দণ্ডপাশিক ও অনুৎপন্নদান-সমুদ্গ্রাহক নামক পদগুলির সৃষ্টি করেছিলেন।

হর্ষবর্ধনের আমলাতন্ত্রে গুপ্ত আমলের পদাধিকারীরা ছাড়াও বৃহদশ্ববার (অশ্বারোহী বাহিনীর নেতা), কটুক (ফৌজদারী প্রশাসক), গ্রামাক্ষপটলিক (গ্রামের ভারপ্রাপ্ত), মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রমাতার প্রভৃতি পদসমূহ বর্তমান ছিল। তাঁর সময়েও প্রদেশগুলির নাম ছিল ভুক্তি, জেলাগুলির নাম ছিল বিষয়,

এবং ওই সকলের প্রশাসকদের নাম ছিল ভোগপতি, আযুক্তক, প্রতিপালক পুরুষ, ইত্যাদি।

৪ ॥ থানেশ্বরের পুষ্পভূতি বংশ

থানেশ্বর বা স্থানীশ্বর ছিল বর্তমান হরিয়ানা অঞ্চল। এখানে পুষ্পভূতি নামক একটি রাজবংশ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে রাজত্ব করত। লেখমালাসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নরবর্ধন। তাঁর পুত্র ছিলেন রাজ্যবর্ধন। তাঁর পুত্র ছিলেন আদিত্যবর্ধন যাঁর সঙ্গে পরবর্তী-গুপ্ত-বংশীয় রাজা মহাসেনগুপ্তের ভগিনী মহাসেনগুপ্তা দেবীর বিবাহ হয়েছিল। এঁদের পুত্র ছিলেন প্রভাকরবর্ধন, যাঁর রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল ৫৮০খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে।

প্রভাকরবর্ধনের সম্পর্কে সংবাদের উৎস বাণভট্টের হর্ষচরিত। এখানে ইঙ্গিত আছে যে তিনি হূণ, সিন্ধু, গুর্জর, গান্ধার, লাট ও মালব রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই সকল রাজ্যগুলি তাঁর ভয়ে ভীত ছিল। প্রভাকরবর্ধন সত্যই এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে।

তবে হূণদের বিরুদ্ধে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র রাজ্যবর্ধন একটি অভিযান করেছিলেন একথা হর্ষচরিতে বলা হয়েছে, এবং আরও বলা হয়েছে যে ওই অভিযানের সময় রাজ্যবর্ধন সংবাদ পান যে তাঁর পিতা প্রভাকরবর্ধন গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে দেখেন যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর পত্নী রাণী যশোমতী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যোগদান করেছেন।

কিন্তু আরও গুরুতর দুঃসংবাদ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কনৌজ থেকে খবর এসেছিল যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর জামাতা, অর্থাৎ কন্যা রাজ্যশ্রীর স্বামী, মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা মালবের রাজা দেবগুপ্তের হস্তে নিহত হয়েছেন, রাজ্যশ্রী বন্দিনী হয়েছেন, এবং দেবগুপ্ত থানেশ্বর আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছেন। এই সংবাদ শুনে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বর রক্ষার দায়িত্ব তাঁর ছোট ভাই হর্ষবর্ধনের উপর ন্যস্ত করে দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। রাজ্যবর্ধন যুদ্ধে দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করলেন, কিন্তু নিজে গৌড়ের রাজার (শশাংক) চক্রান্তে নিহত হলেন।

৫ ॥ হর্ষবর্ধন

হর্ষ ও কনৌজ ঃ বাণভট্টের বর্ণনা অনুযায়ী ওই দুর্যোগের সংবাদ জানা মাত্র হর্ষবর্ধন শশাংক ও গৌড়দের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য এক দারুণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এরপর তিনি হংসবেগ নামক একজন দূত মারফত প্রাগজ্যোতিষ বা আসাম অঞ্চলের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি যেখানে রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন সেখানে হাজির হন, এবং রাজ্যবর্ধনের সেনাপতি ভণ্ডির কাছ থেকে জানতে পারেন যে তাঁর ভগিনী রাজ্যশ্রী বন্দীশালা থেকে পলায়ন করেছেন। অতঃপর ভণ্ডিকে গৌড়ের দিকে বাহিনীসহ অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়ে হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীর সন্ধানে যাত্রা করেন এবং বিন্ধ্য অরণ্যের মধ্যে তাঁকে অগ্নিতে আত্মবিসর্জনে উদ্যত দেখেন। ওই অবস্থায় তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন।

বাণভট্ট এখানে কিছুটা নাটক করেছেন, কেননা দেবগুপ্তের মৃত্যুর পর বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে থানেশ্বরে চলে আসতে রাজ্যশ্রীর অসুবিধা ছিল না, এবং তিনি যদি আত্মহত্যা করতেই মনস্থ করেছিলেন, সেজন্য তাঁর সুদূর বিন্ধ্যাচলে যাবার প্রয়োজন ছিল না।

বাণভট্টের হর্ষচরিত ছাড়াও হর্ষবর্ধনের জীবনকথা জানার জন্য চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা হিউয়েন-সাঙ শুধু হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে আসেননি, তিনি হর্ষবর্ধনের বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।

হিউয়েন-সাঙ তাঁর বৃত্তান্তে কিন্তু বরাবর হর্ষকে কনৌজের সম্রাট বলেছেন, থানেশ্বরের নয়। তাঁর রচনা থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন শূন্য ও উত্তরাধিকারীবিহীন হয়ে গেলে, এবং রাজ্যশ্রী ওই সিংহাসনের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলে, কনৌজের মন্ত্রীরা হর্ষবর্ধনকে কনৌজের সিংহাসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন, এবং কিছুটা ইতস্তত করার পর হর্ষ রাজি হন। পরে তিনি কনৌজেই পাকা হয়ে বসেন এবং ওখানেই রাজধানী সরিয়ে আনেন।

কিন্তু ব্যাপারটি সম্ভবত এভাবে হয়নি। নালন্দায় প্রাপ্ত একটি সীল থেকে জানা গেছে যে কনৌজের মৌখরিরাজ অবন্তিবর্মার গ্রহবর্মা ছাড়াও আরও একজন পুত্র ছিল। কাজেই গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন খালি ছিল একথা বলা চলে না। ফাং-চি নামক একটি চৈনিক গ্রন্থের বক্তব্য থেকে

জানা যায় যে হর্ষবর্ধন তাঁর বিধবা ভগ্নীর তরফ থেকেই প্রথমে কনৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং ক্রমশ কনৌজের সিংহাসনের অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দেন। অনুমান করা যায় যে ৬১২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ হর্ষবর্ধন নিজেকে কনৌজের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন।

হর্ষের সামরিক অভিযানসমূহ ঃ হর্ষের সামরিক অভিযানসমূহ মোটামুটি চারটি শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল ঃ (১) বলভী ও গুর্জরের শাসকবৃন্দ, (২) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী, (৩) সিন্ধু এবং (৪) পূর্বদিকের দেশসমূহ যথা—মগধ, গৌড়, ওড্র ও কোঙ্গোদ।

(১) প্রথম শিলাদিত্য-ধর্মাদিত্যের নেতৃত্বে বলভী রাজ্য শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। শিলাদিত্যের পর যথাক্রমে তাঁর ভাই খরগ্রহ (৬১৩-১৬) ও পুত্র তৃতীয় ধরসেন (৬১৬-২৮), দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (৬২৮-৪১) ও চতুর্থ ধরসেন (৬৪১-) রাজত্ব করেছিলেন এবং এঁরা সকলেই ছিলেন হর্ষের সমকালীন। তাই ঠিক কার বিরুদ্ধে হর্ষ যুদ্ধ করেছিলেন তা সঠিক বলা শক্ত।

ব্রোচের গুর্জরবংশীয়দের লিপি থেকে জানা যায় যে তাদের প্রাক্তন নৃপতি দ্বিতীয় দদ্দ তাঁর প্রভু বলভীরাজের পক্ষ অবলম্বন করে বিখ্যাত হর্ষদেবকে পরাস্ত করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে বলভীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে হর্ষ গোড়ার দিকে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, কিন্তু পরে দ্বিতীয় দদ্দ বলভীরাজের সমর্থনে এলে অবস্থা হর্ষের প্রতিকূলে চলে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় দদ্দের নিজের কোন লিপিতে এ ঘটনার উল্লেখ নেই।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোলি-লিপিতে গুর্জর মালব এবং লাটদের পুলকেশীর অধীন সামন্তশক্তি বলা হচ্ছে, এবং এও বলা হয়েছে যে তারা কোন একটি-বৃহৎ শক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় তাঁর অধীন হয়েছে। সম্ভবত বলভীদের পক্ষ নেওয়ায় দ্বিতীয় দদ্দ হর্ষের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলেন, এবং আত্মরক্ষার্থেই তিনি শক্তিশালী চালুক্যদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। হর্ষের সঙ্গে পুলকেশীর যুদ্ধের এটাও একটা কারণ হতে পারে। আবার এও হতে পারে যে দ্বিতীয় দদ্দ ছিলেন খুবই গৌণ শক্তি যিনি প্রথমে বলভীদের ও পরে চালুক্যদের হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন এবং পরে তাঁর বংশধরেরা তাঁকে এই ব্যাপারে প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করেছিলেন।

বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (৬২৮-৪১) হর্ষের জামাতা হয়েছিলেন, এবং

মাত্র এইটুকু তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, তিনি হয় হর্ষের নিকট পরাস্ত হয়ে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করে নিজ অধিকার বজায় রেখেছিলেন, না হয় হর্ষ তৎকর্তৃক পরাস্ত হয়ে, অথবা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শেষ করার মানসে নিজ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। এ যুদ্ধ তাঁর বড় ভাই তৃতীয় ধরসেনের আমলে শুরু হওয়া অসম্ভব ছিল না, খরগ্রহ ও শিলাদিত্যের আমলে হওয়াও বিচিত্র নয়, তবে সম্ভবত তার সমাপ্তি ঘটেছিল ধ্রুবসেনের আমলে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, বলভীর সঙ্গে হর্ষের যুদ্ধ হয়েছিল ৬৪১ খৃষ্টাব্দের পর এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চতুর্থ ধরসেন। চতুর্থ ধরসেন যেসব রাজকীয় উপাধিসমূহ গ্রহণ করেছিলেন তা সুস্পষ্টভাবেই হর্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জমূলক।

(২) হর্ষের দ্বিতীয় সামরিক অভিযান ছিল চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে। নর্মদার তীরে এই যুদ্ধে হর্ষ পরাজিত হয়েছিলেন। হিউয়েন-সাঙ লিখেছেন যে হর্ষ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের নিয়োগ করেছিলেন, এবং নিজেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সাফল্যলাভ করেননি। চালুক্যদের লিপিসমূহেও হর্ষের বিরুদ্ধে পুলকেশীর বিজয়ের কথা সাড়ম্বরে বলা হয়েছে। হর্ষের এই যুদ্ধ ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের আগে ঘটেছিল।

(৩) সিন্ধুতেও হর্ষবর্ধন সাফল্যলাভ করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে, যদিও বাণভট্ট লিখেছেন যে হর্ষবর্ধন সিন্ধুর রাজার সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে হরণ করেছিলেন।

(৪) পূর্বদিকে আসামের ভাস্করবর্মার সঙ্গে হর্ষ যে রাজনৈতিক মিত্রতায় আবদ্ধ হয়েছিলেন তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ হিউয়েন সাঙ কামরূপে গিয়েছিলেন, এবং তিনি লিখেছেন যে সেই সময় হর্ষ কোঙ্গোদ ও উড়িষ্যা জয় করে রাজমহলের নিকটবর্তী কজঙ্গলে গঙ্গার তীরে অপেক্ষা করছিলেন। মা-তোয়ান-লিন লিখেছেন যে শিলাদিত্য অর্থাৎ হর্ষবর্ধন ৬৪১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ মগধরাজ উপাধি নিয়েছিলেন। এই কথার সঙ্গে হিউয়েন সাঙের বক্তব্যের মিল আছে। ৬৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে মগধে ভ্রমণকালে হিউয়েন সাঙ দেখেছিলেন যে, শশাংক সেই সময়ের কিছু আগে গয়ার বোধিবৃক্ষটির মূলোচ্ছেদ করেন, এবং তার অনতিকাল পরেই মারা যান। তাহলে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেছিলেন ৬৩৮ সালের পর, এবং সেই হিসাবে ৬৪১ সালে তাঁর মগধরাজ উপাধি গ্রহণ কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

গৌড়ে যদি হর্ষ কিছু সাফল্য অর্জন করে থাকেন তা তিনি করেছিলেন

শশাংকের মৃত্যুর পর। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হর্ষ পুণ্ড্রে অভিযান করে শশাংককে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু একথা কতদূর সঠিক তা বলা যায় না। তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে যদি তিনি শশাংকের বিরুদ্ধে কোন অভিযান করে থাকতেন, তাহলে তা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়েছিল। লেখমালাসমূহ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, ৬১৯ খৃষ্টাব্দেও শশাংক বঙ্গদেশ, দক্ষিণ বিহার ও উড়িষ্যার একাংশে সগৌরবে রাজত্ব করেছেন। এটা অবশ্য অসম্ভব নয় যে হর্ষবর্ধন মগধ, ওড্র ও কোঙ্গোদ জয় করার কালে, অর্থাৎ ৬৪১-৪২ এর মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গেরও একাংশ জয় করেছিলেন, এবং তা শশাংকের মৃত্যুর পরে।

হর্ষের রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের উপর ভিত্তি করে আগেকার দিনে হর্ষের রাজ্যের এলাকা সম্পর্কে একটা অতিরঞ্জিত ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে হর্ষের রাজত্ব ছিল বর্তমান হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের একাংশ, মধ্যপ্রদেশের উত্তরাঞ্চল এবং বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশ নিয়ে। সিন্ধুপ্রদেশে হর্ষের অধিকার সম্পর্কে কোন পাকা প্রমাণ নেই। হিউয়েন সাঙ নিজেই হর্ষের সমসাময়িককালে উত্তর-পশ্চিমে কপিশ ও উদ্যান, উত্তরে কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। পশ্চিম মালবে (মো-লা-পো) তখন স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি বর্তমান ছিল। পূর্বদিককার অবস্থা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দক্ষিণেও হর্ষবর্ধন চালুক্যদের এলাকা ভেদ কয়তে পারেননি। তবে উত্তর ভারতের অনেকখানি অঞ্চলে তাঁর অধিকার ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হর্ষের সামরিক জীবন খুব সাফল্যমণ্ডিত না হলেও, তিনি যে খুবই শক্তিমান রাজা ছিলেন এটা মানতে হবে। সাম্রাজ্যের এলাকা খুব বৃহৎ না হলেও তাঁর প্রভাবের ক্ষেত্র বড় কম ছিল না। দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালা সমূহে তাঁকে সকল-উত্তরাপথনাথ বলা হয়েছে, যা তাঁর খ্যাতির ব্যাপ্তির পরিচায়ক।

হর্ষ ও চীন ঃ সম্ভবত হিউয়েন সাঙের কাছ থেকে হর্ষবর্ধন চীন দেশ ও চীন সম্রাটের কথা শোনেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনে একজন দূত প্রেরণ করেন। এই ঘটনার উল্লেখ চৈনিক ঐতিহাসিক মা-তোয়ান-লিন করেছেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে লি-ই-পিয়াও এবং ওয়াং-হিউয়েন-সের নেতৃত্বে আরও একটি দৌত্য হর্ষের রাজসভায় আসে। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ চীনে প্রত্যাবর্তন করার পর, তাঁর কাছ থেকে হর্ষের সংবাদ প্রত্যক্ষভাবে জেনে চীন সম্রাট পুনরায়

ওয়াং-হিউয়েন-সে এবং সিয়াং চেউ-জেনকে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে পাঠান। তাঁরা ভারতে এসে পৌঁছে শোনেন যে হর্ষ মারা গেছেন। হর্ষের মৃত্যু হয়েছিল ৪৪৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ।

হর্ষের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী ঃ রাজা হিসাবে হর্ষবর্ধন যতটা না বড় ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী সারা ভারতেই তাঁকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। হর্ষের কথা পরবর্তী লেখকেরা বারবার উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যিক হিসাবে হর্ষের প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দ নামক তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন। ই-সিং লিখেছেন : 'শিলাদিত্য সাহিত্যের রীতিমত অনুরাগী ছিলেন, তিনি শুধু বোধিসত্ত্ব জীমূতবাহনের (নাগানন্দ) কাহিনীকে ছন্দোবদ্ধই করেননি, নৃত্য ও অভিনয়ের দ্বারা তিনি তা প্রদর্শন করিয়েছিলেন।'

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হর্ষ প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন বলে হিউয়েন উল্লেখ করেছেন। হর্ষের ধর্ম সম্পর্কে কোন গোঁড়ামি ছিল না। সম্ভবত ব্যক্তিগত ভাবে তিনি শৈব ছিলেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ সূর্যোপাসক ছিলেন, এবং তাঁর বড় ভাই রাজ্যবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ। হর্ষ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই মুক্তহস্ত ছিলেন, এবং নিজে শৈব হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তাঁর সময়ে কনৌজে একটি ধর্ম সম্মেলন হয়, যাতে ভাস্করবর্মা সহ কুড়িজন রাজা ও বহু পণ্ডিত যোগদান করেন। এই সম্মেলনটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক, যেখানে হিউয়েন সাঙও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। হর্ষ ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি।

দানশীলতার জন্যও হর্ষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে দান ধ্যান করতেন।

হর্ষ একটি অব্দের প্রচলন করেছিলেন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর সিংহাসনারোহণের সময় থেকে। আলবিরুনী লিখেছেন যে কনৌজ ও মথুরা অঞ্চলে তাঁর সময় এই অব্দের প্রচলন ছিল। হর্ষ কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাননি।

৬॥ হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারত (৬৫০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ)

মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশীয়গণ ঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমরা মগধের সিংহাসনে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের দেখতে পাই। এঁদের পূর্বপুরুষদের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি (৪।১৪)। মহাসেনগুপ্তের পুত্রদ্বয় মাধবগুপ্ত এবং কুমারগুপ্ত হর্ষবর্ধনের রাজসভায় আশ্রিত ছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর প্রথমে কুমারগুপ্ত ও পরে তাঁর ছোট ভাই মাধবগুপ্ত মগধে

রাজত্ব শুরু করেন। মাধবগুপ্তের পর তাঁর পুত্র আদিত্য সেন রাজা হন যাঁর অফসদ-লেখমালা থেকে কিছু সংবাদ জানা যায়। তাঁর মেয়ের সঙ্গে মৌখরি বংশীয় ভোগবর্মার বিবাহ হয়। আদিত্যসেন মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। একটি লিপি থেকে তাঁর ৬৬ হর্ষাব্দের একটি তারিখ পাওয়া গেছে, যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি ৬৭২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। আদিত্যসেনের তিনজন উত্তরাধিকারীর নাম জানা গেছে—দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত এবং জীবিতগুপ্ত। জীবিতগুপ্তের কোন উত্তরাধিকারী বা তাঁদের পরবর্তী ইতিহাসের খবর আমরা জানি না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মগধ অঞ্চল কনৌজের যশোবর্মা কর্তৃক অধিকৃত হয়।

কনৌজের যশোবর্মা ঃ হর্ষবর্ধনের পর প্রায় পঞ্চাশ বছরের কনৌজের ইতিহাস সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে আনুমানিক ৬৯০ থেকে ৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমরা যশোবর্মা নামে এক রাজাকে কনৌজে রাজত্ব করতে দেখি, যাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী বাকপতির গৌড়বহো নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত একটি কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। বাক্‌পতির বর্ণনা অনুযায়ী যশোবর্মা শোন-উপত্যকা অতিক্রম করে বিন্ধ্যপর্বতে হাজির হন। তারপর পূর্বদিকে তিনি মগধ অভিমুখে যাত্রা করেন। মগধরাজ তাঁর ভয়ে পলায়ন করলেও ওখানকার সামন্তরাজারা তাঁর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যুদ্ধ করেন। তাঁদের পরাজিত করে যশোবর্মা সমুদ্রতীরে বঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। বঙ্গগণ তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে তাঁকে অধিপতি হিসাবে মেনে নেয়। অতঃপর তিনি মলয় পর্বতে হাজির হন এবং দক্ষিনের রাজাদের বশ্যতা আদায় করেন। নর্মদার তীরে তিনি অধিকার স্থাপন করেন। দুর্গম পশ্চিমঘাট পর্বতাঞ্চলের রাজাদের কাছ থেকে তিনি কর আদায় করেন। অতঃপর তিনি পারসিককের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাদের পরাজিত করেন। তারপর তিনি রাজস্থানে আসেন, সেখান থেকে থানেশ্বর। তিনি মন্দর ও হিমালয় পর্বতাঞ্চলের রাজাদের কাছ থেকেও আনুগত্য আদায় করেন, এবং এই ভাবে চারদিক জয় করে কনৌজে ফিরে আসেন।

প্রশস্তিকারের এই বর্ণনায় নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু এ বিষয়ে আরও কয়েকটি তথ্যের সাক্ষ্য উড়িয়ে দেওয়া য়ায় না। প্রথমত, নালন্দা থেকে প্রাপ্ত একটি লিপিতে এমন ইঙ্গিত আছে যে যশোবর্মা মগধ এবং সেই সঙ্গে বঙ্গদেশের কিছু অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে বিনয়াদিত্যের সময়ে,

৬৯৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ, জনৈক উত্তরাপথের রাজার সঙ্গে চালুক্যদের যুদ্ধ হয়েছিল। এই উত্তরাপথের রাজা যশোবর্মা হতে পারেন। তৃতীয়ত, চৈনিক সূত্র থেকে জানা যায় যে মধ্যভারতের রাজা যি-শা-ফু-মো (যশোবর্মা) তাঁর মন্ত্রী পু-তা-সিন (বুদ্ধসেন)-কে চীনে পাঠিয়েছিলেন ৭৩১ খৃষ্টাব্দে। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যও ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত আরবদের বিরুদ্ধে চীনের সাহায্য পাওয়া। আরবেরা সিন্ধু জয় করে কনৌজ আক্রমণ করেছিল, কিন্তু সেই আক্রমণ প্রতিহত হয়। যশোবর্মা কর্তৃক পারসিকদের উপর বিজয়লাভের যে কথা বাকপতি বলেছেন তা আসলে সিন্ধুর আরবদের উপর যশোবর্মার বিজয়।

কনৌজরাজ যশোবর্মা এবং কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য আরবদের বিরুদ্ধে এক হয়েছিলেন, কিন্তু উভয় শক্তির সখ্যতা বেশিদিন থাকেনি। রাজতরঙ্গিণীর সাক্ষ্য অনুযায়ী কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের সঙ্গে অচিরেই যশোবর্মার যুদ্ধ হয় এবং তাতে যশোবর্মা চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত এবং সম্ভবত নিহত হন।

কাশ্মীর : হর্ষবর্ধনের সময়ে, আনুমানিক ৬২৭ খৃষ্টাব্দে, কাশ্মীরে দুর্লভ-বর্ধন কার্কোট বা নাগবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। হিউয়েন সাঙ, যিনি তাঁর সময়ে কাশ্মীর পরিদর্শন করেছিলেন, লিখেছেন যে তাঁর সময়ে তক্ষশিলা, সিংহপুর, উরশা, পান-নু-শো (পুঞ্চ) এবং রাজপুর (রাজৌরি) কাশ্মীরের অধীন ছিল। দুর্লভবর্ধন ৩৬ বছর এবং তাঁর পুত্র দুর্লভক ৫০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্তমান আছে এবং তা হচ্ছে কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী।

রাজতরঙ্গিণীর বক্তব্য অনুযায়ী, দুর্লভকের পর তাঁর পুত্র চন্দ্রাপীড় কাশ্মীরের রাজা হন। ইনি ৭১৩ খৃষ্টাব্দে চীনের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে একজন দূত পাঠান, কেননা আরব সেনাপতি মুহম্মদ-ইবন-কাসিম কাশ্মীর সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু কাশ্মীরে যুদ্ধ করা তাঁর বরাতে হয়নি, কেননা আরব কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছিল। সাড়ে আট বছর রাজত্ব করার পর চন্দ্রাপীড় তাঁর ভাই তারাপীড় কর্তৃক নিহত হন। তারাপীড় চার বছর রাজত্ব করেন। পরবর্তী রাজা হন তাঁর ছোটভাই ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় যিনি সিংহাসনে বসেন ৭২৪ খৃষ্টাব্দে।

রাজা হয়ে ললিতাদিত্য প্রথমে তিব্বতীদের এবং পরে দর্দ, কাম্বোজ ও তুর্কদের জয় করেন। এই তুর্ক বলতে সম্ভবত আরবদের বোঝান হয়েছে।

অতঃপর তিনি যশোবর্মাকে পরাস্ত করে কনৌজ জয় করেন। কল্হণ তাঁর রাজতরঙ্গিণীতে ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়ের একটি অতিরঞ্জিত কাহিনী বলেছেন যা অনুযায়ী তিনি নাকি কলিঙ্গ, গৌড়, কর্ণাট, দ্বারকা, অবন্তী, প্রাগজ্যোতিষ, স্ত্রীরাজ্য, উত্তরকুরু এবং দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত জয় করেছিলেন। ঠিক কতটা অঞ্চল ললিতাদিত্যের অধিকারে ছিল তা সঠিক বলা যায় না। তবে গৌড়ের রাজার সঙ্গে তাঁর কোন রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল, এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন। কল্‌হণ লিখেছেন যে এই গৌড়ের রাজাকে ললিতাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করান। এই সংবাদ পেয়ে কয়েকজন গৌড়বাসী কাশ্মীরে গিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেছিল। তারা বিষ্ণু-রামস্বামীর মন্দিরটি ধ্বংস করেছিল, এবং প্রত্যেকে নিহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিল। তাদের এই বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কথা কল্হণ মুক্ত কণ্ঠে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত ঐতিহাসিকের মতই তিনি জাতি-বৈরতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। ললিতাদিত্য মারা যান ৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৩৬ বছর রাজত্ব করার পর। তাঁর উত্তরাধিকারীরা দুর্বল ছিলেন। তাঁর পৌত্র জয়াপীড় অবশ্য কাশ্মীরের পূর্ব মর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছিল। কার্কোট বংশ নবম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল।

ভারতবর্ষে সামন্তপ্রথা যে কি ধরনের ছিল কাশ্মীরের ইতিহাস দেখলেই তা বোঝা যাবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তা দেখব। যেহেতু কাশ্মীরের একটি লিখিত ইতিহাস আছে, তাই কাশ্মীরের অবস্থাটা জানতে অসুবিধা হয়না। অপরাপর স্থানের লিখিত ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকার দরুণ, আমাদের পক্ষে সে সকল স্থানে সামন্ততন্ত্র কেমন ছিল তা জানতে অসুবিধা হয়। অনুমান করা যায় যে কাশ্মীরের অবস্থা কম বেশি সর্বত্রই বর্তমান ছিল।

নেপাল : ৬২৩ খৃষ্টাব্দে অংশুবর্মার মৃত্যুর পর (দ্রষ্টব্য ৪।১৪) জনৈক জিষ্ণুগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র বিষ্ণুগুপ্ত নেপালে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের লেখমালা থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁরা ৬৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। অতঃপর লিচ্ছবি বংশীয় নরেন্দ্রদেব নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চৈনিক সূত্র থেকে জানা যায় যে তিনি পিতৃপুরুষের সিংহাসন লাভের জন্য তিব্বতের রাজার সাহায্য পেয়েছিলেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে লি-ই-পিয়াও-র নেতৃত্বে একটি চৈনিক কূটনৈতিক মিশন হর্ষবর্ধনের রাজসভায় যাবার পথে নেপাল হয়ে যায়, এবং নরেন্দ্রদেব তাদের সংবর্ধনা জানান। ৬৪৭-৪৮

খৃষ্টাব্দে ওয়াং-হিউয়েন-সের নেতৃত্বে আর একটি চৈনিক মিশন হর্ষবর্ধনের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়েছে। চৈনিক সূত্র থেকে বলা হয়েছে যে হর্ষের মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন নিয়ে একটি শরিকী দ্বন্দ্ব হয়েছিল যাতে ওয়াং-হিউয়েন-সেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে নরেন্দ্রদেব কিছু অশ্বারোহী দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নরেন্দ্রদেব ৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

নরেন্দ্রদেবের পর তাঁর পুত্র শিবদেব রাজা হন যিনি ৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই শিবদেবের সঙ্গে মৌখরি ভোগবর্মার কন্যা বৎসদেবীর বিবাহ হয়। এই ভোগবর্মা ছিলেন পরবর্তী-গুপ্তবংশীয় মগধরাজ আদিত্যসেনের জামাই, এবং প্রাক্তন নেপালরাজ অংশুবর্মার ভাগ্নে। শিবদেবের সঙ্গে বৎসদেবীর বিবাহ নেপালের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাজবংশের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবার উদ্দেশ্য সম্ভবত সিদ্ধ করেছিল।

শিবদেবের পুত্র জয়দেবের একটি তারিখ পাওয়া গেছে ৭৩৭ খৃষ্টাব্দ। তাই অনুমান করা যায় যে জয়দেব অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। নরেন্দ্রদেবের সময় থেকেই নেপাল তিব্বতের কাছে একটা আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করত, এবং শিবদেব জয়দেবের সময়ও তা বহাল ছিল।

কামরূপ ঃ ভাস্করবর্মা পর্যন্ত কামরূপের রাজবংশাবলী আমরা আগে উল্লেখ করেছি (৪।১৪)। হর্ষের সঙ্গে ভাস্করবর্মার রাজনৈতিক মিত্রতা হয়েছিল, কিন্তু শশাংকের বিরুদ্ধে ভাস্করবর্মা হর্ষকে কিরকম সাহায্য করেছিলেন তা আমরা জানিনা। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে তিনি যখন নালন্দায় ছিলেন তখন তাঁকে পাবার জন্য হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। অবশ্য এখানে হিউয়েন সাঙ নিজের দর বাড়িয়েছেন কিনা বলা শক্ত। কনৌজের ধর্ম সম্মেলনেও আমরা ভাস্করবর্মাকে হাজির থাকতে দেখি। কর্ণসুবর্ণ থেকে জারি করা ভাস্করবর্মার একটি দানপত্র পাওয়া গেছে যা থেকে মনে হয় যে শশাংক ও হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভাস্করবর্মা বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করেছিলেন। ভাস্করবর্মার পর তাঁর রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে ভাস্করবর্মার পর কিছুকাল আসাম তিব্বতের অধীনে ছিল, এবং পরে সালস্তম্ভ নামে একটি ব্যক্তি সেখানে একটি নূতন রাজবংশের পত্তন করেন। ওই বংশের হর্ষ বা হর্ষবর্মা বলে এক রাজার নাম পাওয়া গেছে। এই হর্ষবর্মার কন্যা রাজ্যমতীর সঙ্গে সম্ভবত নেপালের রাজা জয়দেবের বিবাহ হয়েছিল।

বঙ্গদেশ : শশাংকের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী বঙ্গদেশের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে, শশাংকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই হিউয়েন সাঙ বঙ্গদেশে এসেছিলেন, এবং তিনি এখানে পাঁচটি রাজ্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন —কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। শশাংকের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সুযোগে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা হয়ত বঙ্গদেশের কোন কোন অঞ্চল জয় করেছিলেন।

কিন্তু শীঘ্রই গৌড়ে বা পশ্চিমবঙ্গে জয়নাগ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর বংশধরদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ আমরা জানিনা।

বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গে এক ব্রাহ্মণ-রাজবংশ রাজত্ব করতেন, নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্র যে বংশের ছিলেন বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন। এর পর খড়গ নামক একটি বৌদ্ধবংশ ক্ষমতায় আসে যে বংশের চারজন রাজা, একে অপরের পুত্র, পরপর রাজত্ব করেছেন, যাঁরা হলেন, খড়গোদ্যম, জাতখড়গ, দেবখড়গ এবং রাজরাজভট। দেবখড়গকে চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং দেববর্মা এবং রাজরাজভটকে রাজভট বলে উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই বংশ পূর্ববঙ্গ, এবং দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গের কতকাঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন।

অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে শৈলবংশের এক রাজা উত্তরবঙ্গে অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন। ৭২৫ থেকে ৭৩৫ খৃষ্টাব্দের যশোবর্মা বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করেছিলেন, এবং সেই সূত্র ধরেই পরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়ের উপর আধিপত্য দাবি করেছিলেন, এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক গৌড়রাজাকে কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিলেন (কাশ্মীর দ্রষ্টব্য)। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসন হারিয়ে পুণ্ড্রবর্ধনে আসেন, এবং সেখানকার রাজা জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করেন বলে রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে।

লেখমালা থেকে সমতটে রাটবংশীয় দুজন রাজার নাম পাওয়া যায়—জীবধারণ ও শ্রীধারণ। এছাড়া আরও কিছু রাজার নাম আছে যেমন লোকনাথ, জয়তুঙ্গ-বর্ষ ইত্যাদি। তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথ পূর্ববঙ্গের একটি চন্দ্র-বংশের কথা উল্লেখ করেছেন, যে বংশের গোবিচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে রাজত্ব করেছিলেন।

মোটের উপর শশাংক-পরবর্তী বঙ্গদেশের শতবর্ষের ইতিহাস ছোট ছোট আঞ্চলিক রাজ্যের ভাঙাগড়ার ইতিহাস, যে কারণে সমসাময়িক একটি লিপিতে

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বোঝাতে 'মাৎস্যন্যায়' নামক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চলের ইতিহাসও কার্যত ভিন্ন কিছু ছিলনা, দুচারজন প্রবল প্রতাপ রাজার রাজত্ব ছাড়া।

উড়িষ্যা ঃ হর্ষবর্ধনের অধিকারের পরেও কোঙ্গোদ অঞ্চলে শৈলোদ্ভবদের রাজত্ব বজায় ছিল এবং পরে তাদের অধিকারের বিস্তৃতিও ঘটেছিল। এই বংশের রাজাদের বংশতালিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। হর্ষের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অয়শোভীতের সময়ে শৈলোদ্ভবদের রাজত্ব উত্তরে মহানদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারী মানভীত ধর্মরাজের সময়ে শৈলোদ্ভবদেরই আর একটি শাখার জনৈক মাধব একটি ব্যর্থ রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। তেক্কলি-লিপি থেকে জানা যায় যে মানভীত ধর্মরাজের তিনজন উত্তরাধিকারী ছিলেন—মধ্যমরাজ দ্বিতীয় রণক্ষোভ, অল্লবরাজ এবং তৃতীয় মধ্যমরাজ। এঁদের রাজত্বকাল সম্পর্কে কিছু বলা যায়না।

মধ্যপ্রদেশের রাঘোলি নামক স্থান থেকে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন থেকে একটি শৈলবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়, যে বংশের রাজাদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ শ্রীবর্ধন, পৃথুবর্ধন, প্রথম জয়বর্ধন, দ্বিতীয় শ্রীবর্ধন ও দ্বিতীয় জয়বর্ধন। এঁদের রাজত্ব ছিল মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলা অঞ্চলে। এঁদের সঙ্গে শৈলোদ্ভবদের সম্পর্ক কি বলা ছিল শক্ত।

মালয়েশিয়ায় যে শৈলেন্দ্র বংশ অষ্টম শতকে একটি শক্তিশালী রাজত্ব গড়ে তুলেছিল, তাদের সঙ্গেও এই শৈলোদ্ভবদের সম্পর্ক টানার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।

বলভী ঃ আমরা দেখেছি হর্ষবর্ধনের রাজত্বের শেষের দিকে বলভীতে মৈত্রকবংশীয় চতুর্থ ধরসেন রাজত্ব করছিলেন (৫।৫)। ৬৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ধরসেনের রাজত্ব শেষ হয়। ৬৫১-৫৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তৃতীয় ধরসেন, এবং ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় শিলাদিত্য রাজত্ব করেন। তারপর সিংহাসনে আসেন তৃতীয় শিলাদিত্য যিনি ৬৬২ থেকে ৬৮৪ পর্যন্ত একটানা রাজত্ব করেন।

তৃতীয় শিলাদিত্য, সম্ভবত যাঁর উপাধি ছিল বজ্রট, ছিলেন শক্তিমান রাজা, যিনি গুর্জরদের পরাজিত করেছিলেন এবং ভৃগুকচ্ছ বা ব্রোচ অঞ্চলটি তাদের হাত থেকে দখল করেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল তা বজায় রাখতে পারেননি, কেননা গুর্জররা চালুক্যদের সহায়তায় তাদের হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল।

পরবর্তী রাজারা প্রত্যেকেই ছিলেন শিলাদিত্য নামধারী, সম্পর্কে পিতা-পুত্র। পঞ্চম শিলাদিত্যের সময়ে বলভী আরবদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আরবেরা সিন্ধুকে ঘাঁটি করে কাথিয়াবাড়, গুজরাট ও রাজস্থানে এমনকি উজ্জয়িনীতেও আক্রমণ চালায় ৭২৫ থেকে ৭৩৫ সালের মধ্যে, কিন্তু সে আক্রমণ প্রতিহত হয়। এতে লাটের চালুক্যরা এবং মালবের প্রতীহাররা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গুর্জররাজ চতুর্থ জয়ভটের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে বলভীরাজ তাজিকদের (আরবদের) ভীষণভাবে পরাজিত করেছিলেন।

অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকেই বলভীর মৈত্রক বংশের অবক্ষয় শুরু হয়। কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল পৃথক হয়ে যায় এবং সেখানে সৈন্ধবদের রাজত্ব শুরু হয়। চালুক্যরা, এবং তারপর অবন্তীর প্রতীহাররা এবং রাষ্ট্রকূটেরা ধীরে ধীরে মৈত্রকবংশীয়দের পঙ্গু করে ফেলে। মৈত্রকবংশের শেষ রাজা ছিলেন সপ্তম শিলাদিত্য, যিনি ৭৬৬-৬৭ সালে সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মৈত্রকরা হারিয়ে যায়।

রাজস্থান ও গুজরাত ঃ যে অঞ্চলটিকে আমরা রাজস্থান বলি, পূর্বে তার অধিকাংশেরই নাম ছিল গুর্জরত্রা বা গুজরাত, যদিও পরবর্তীকালে গুজরাতের সীমানা আরও পশ্চিম দিকে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই অঞ্চলে চারটি ট্রাইবের বসতি ছিল, যারা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের পত্তন করেছিল, এবং যাদের থেকে পরবর্তী কালের রাজপুতদের উদ্ভব হয়েছে। এরা ছিল গুর্জর-প্রতীহার, গুহিলোত, চাপোৎকট এবং চাহমান। আমরা একে একে এদের কথা উল্লেখ করছি।

গুর্জর-প্রতীহারগণ ঃ হরিচন্দ্রের অধীনে প্রতীহার বংশের প্রতিষ্ঠার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি (৪।১৪)। আরও একটি প্রতীহারবংশ, যারা গুর্জর-প্রতীহার নামে পরিচিত খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে আবির্ভূত হয়েছিল। এদের এলাকা ছিল যোধপুর, বিকানীর এবং পরবর্তীকালে জয়শলমীর অঞ্চল। এই বংশের রাজারা, যাঁরা আনুমানিক ৬৪০ থেকে ৭২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন, ছিলেন তাত ও তাঁর প্রপৌত্র শীলুক।

আরও কয়েকটি গুর্জর রাজ্য ছিল যেমন লাট বা দক্ষিণ গুজরাত যার রাজধানী ছিল নান্দীপুরী ; অবন্তী, যার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, যেখানে নাগভট নামে একজন প্রতীহার নেতা অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে রাজত্ব করতেন ; এবং আরও কয়েকটি। সম্ভবত এই রাজ্যগুলি আরব আক্রমণের সময় একজোট হয়েছিল। আরব আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে অবন্তীর প্রতীহার রাজা

নাগভট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, এবং এতে তাঁর প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বাড়ে, এবং তিনি কার্যত গুর্জররাষ্ট্রগুলির নেতা হয়ে দাঁড়ান।

নান্দীপুরীর গুর্জর রাজা দ্বিতীয় দদ্দ, যাঁর জানা তারিখ ৬২৯ ও ৬৪১ খৃষ্টাব্দ, হর্ষের বিরুদ্ধে বলভীরাজকে সমর্থন করেছিলেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন দ্বিতীয় জয়ভট, তৃতীয় দদ্দ, তৃতীয় জয়ভট, অহিরোল এবং চতুর্থ জয়ভট। এই চতুর্থ জয়ভটকে আরব আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছিল, এবং চালুক্যরাজ অবনিজনাশ্রয় পুলকেশিরাজের সাহায্যে তিনি ওই আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নান্দীপুরীর গুর্জররা প্রথমে চালুক্যদের, পরে রাষ্ট্রকূটদের এবং পরিশেষে তাদের আর এক শাখা, অবন্তীর প্রতীহারদের অধীন হয়। নান্দীপুরীর গুর্জর পরিবারের শেষ রাজা চতুর্থ জয়ভটের জানা তারিখ হচ্ছে ৭৩৫ খৃষ্টাব্দ।

গুহিলোতগণ : গুহিলোত বা গুহিলপুত্রগণ মেবার অঞ্চলে রাজত্ব করত। ৯৭৭ খৃষ্টাব্দের আতপুর-লিপি থেকে এই বংশের কুড়িজন রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রথম রাজার নাম গুহদত্ত যিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল সম্ভবত নাগহ্রদ, বর্তমান নাগদা। ক্রমশ তারা সমগ্র উদয়পুর অঞ্চলটি নিজেদের অধিকারে আনেন। আনুমানিক ৭২৫ থেকে ৭৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই সব অঞ্চলে আরব আক্রমণ ঘটে, এবং গুহিলোত বংশের নবম রাজা প্রথম খুম্মান, যাঁর উপাধি ছিল বাপ্পা-রাবল, সাফল্যের সঙ্গে তা প্রতিহত করেন। এরপর বাপ্পা-রাবল উপাধিটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং পরবর্তী গুহিলোত রাজাদের মধ্যে অনেকেই এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। গুহিলোতদের আরও কয়েকটি শাখা ছিল সেগুলির মধ্যে একটির শাসনকেন্দ্র ছিল জয়পুরের বাস্তনগর। গুহিলোতদের এই দুটি শাখাই পরে প্রতীহারদের অধীনে আসে।

চাপ বা চাপোৎকটগণ : গুজরাতী বৃত্তান্তসমূহ অনুযায়ী চাপ বা চাপোৎকটগণ পঞ্চাশর অর্থাৎ গুজরাত ও কাচ্ছ মধ্যবর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করত ৭২০ থেকে ৯৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই বংশের জয়শেখরের পুত্র বনরাজ অণহিলপাটক (বর্তমান পাটক) নগরটির পত্তন করেছিলেন ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে। ৭৩৮ খৃষ্টাব্দের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে চাপোকেটরা আরবদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। ৯১৪ খৃষ্টাব্দে চাপরাজা ধরণীবরাহ পূর্ব কাথিয়াবাড়ে রাজত্ব করতেন। চাপেদের রাজ্যের এলাকা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। মোটামুটি

দক্ষিণ রাজস্থান, উত্তর গুজরাত এবং কাথিয়াবাড় অঞ্চলগুলিতেই তারা ঘুরেফিরে রাজত্ব করেছিল।

চাহমানগণঃ ৭৫৬ খৃষ্টাব্দের একটি লিপিতে চাহমান রাজাদের নাম আছে, এবং শেষ নামটি হচ্ছে দ্বিতীয় ভর্তৃবদ্ধের যিনি নিজেকে নাগাবলোক বা প্রতীহাররাজ প্রথম নাগভটের সামন্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। চাহমান বা চৌহানদের আদি নিবাস ছিল শাকম্ভরী হ্রদ অঞ্চলে যদিও ভর্তৃবদ্ধ রাজত্ব করেছিলেন ব্রোচ জেলায়। চিতোরগড় থেকে প্রাপ্ত ৭১৩ খৃষ্টাব্দের একটি লিপিতে মহেশ্বর, ভীম, ভোজ এবং মান এই চারজন রাজার নাম আছে। লক্ষ্যণীয় যে দ্বিতীয় ভর্তৃবদ্ধের দুজন পূর্ববর্তীর নামও যথাক্রমে মহেশ্বর ও ভীম, যা থেকে অনুমিত হয় যে চাহমানদের একটি শাখা চিতোর অঞ্চলেও বাস করত। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে চিতোরগড়-লিপিতে উল্লিখিত রাজারা মৌর্যবংশীর (মোরি রাজপুত) আর চাহমানগণ তাদেরই একটি শাখা।

রাজস্থানের অপরাপর শক্তিসমূহঃ মোরি বা মৌর্য-বংশীয় রাজাদের নাম পাওয়া যায় ৬৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত ঝলরাপতন-লিপিতে এবং কোটা থেকে প্রাপ্ত ৭৩৮ খৃষ্টাব্দের একটি লিপিতে। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে রচিত পূর্বোক্ত চিতোরগড় লিপিতে উল্লেখিত রাজা মানকে মৌর্যবংশীয় বলে কেউ কেউ দাবি করেন। মৌর্যরা রাজত্ব করত চিতোর অঞ্চলে। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে তারা আরবগণ কর্তৃক পরাজিত হয় এবং সেই অবকাশে বাপ্পা রাবল তাদের হটিয়ে চিতোর অঞ্চলে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সিরোহি অঞ্চলে বসন্তগড়ে প্রাপ্ত একটি লিপিতে জনৈক রাজা বর্মলাত ও তাঁর সামন্ত রাজ্জিলের নাম পাওয়া যায়। কোটা প্রদেশের শেরগড়ে জনৈক নাগবংশীয় সামন্ত দেবদত্তের নাম পাওয়া যায় যিনি ৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন।

সিন্ধু এবং পশ্চিম সীমান্তঃ সিন্ধুর সঙ্গে হর্ষবর্ধন ও তাঁর পিতার যে ভাল সম্পর্ক ছিলনা তা আমরা আগেই দেখেছি। সিন্ধুর একটি স্থানীয় রাজ-বৃত্তান্ত আছে যা চচ-নাম নামে পরিচিত। এখান থেকে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সহসি-রাই সিন্ধুর রাজা ছিলেন, তাঁর রাজ্য উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে মাকরাণ এবং পূর্বে কনৌজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, রাজধানী ছিল আলোর। তাঁর পুত্র সহিরস সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে পারস্যরাজ নিমরুজের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। অতঃপর তার পুত্র দ্বিতীয় সহসি-রাই রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর

পর তাঁর ব্রাহ্মণমন্ত্রী চচ সিন্ধুর সিংহাসন অধিকার করেন এবং প্রাক্তন রাজার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে চচের দুই পুত্র হয়, দহরসিয় এবং দাহর। চচের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই চন্দর সিংহাসনে বসেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুরাজ এবং চচের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ বাধে। দুরাজ পরাজিত হবার পর চচের পুত্রদ্বয়, দহরসিয় এবং দাহর সিংহাসন ভাগ করে নেন। এবং দহরসিয়র অকালমৃত্যুর পর দাহর সমগ্র সিন্ধুর রাজা হন। এটা আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এর আট বছর পর পার্শ্ববর্তী এক রাজা রমল সিন্ধু আক্রমন করেন এবং দাহর তা সহজেই প্রতিহত করেন। কিন্তু দাহরের রাজ্যকালের সবচেয়ে বড় ঘটনা আরব আক্রমণ, যে কথায় আমরা পরে আসছি।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজ্যগুলির মধ্যে কাবুল নদী উপত্যকা থেকে হিন্দুকুশ বরাবর ছিল কাপিশ বা কাবুল বা কাবুলিস্তান রাজ্য, এবং তার দক্ষিণে হেলমন্দ নদীর উপত্যকায় ছিল জাবুল বা জাবুলিস্তান। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে উভয় রাজ্যই শক্তিমান ছিল। কাবুলের রাজারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলতেন, জাবুলের রাজাদের উপাধি ছিল শাহী। কাপিশ বা কাবুলের সার্বভৌমত্বের অধীনে দশটি সামন্তরাজ্য ছিল বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে লম্পাক (লঘ্‌মন), নগর (জালালাবাদ) এবং গন্ধার উল্লেখযোগ্য।

আরব আক্রমণ : খলিফা উমরের সময়ে (৬৩৪-৪৪ খৃষ্টাব্দ) আরবের মুসলমান শক্তি জলপথে তিনবার ভারত আক্রমণ করে। প্রথমটি ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ, যা ছিল তনহ্‌ বা বোম্বাই-এর নিকটবর্তী থানা অঞ্চলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ছিল যথাক্রমে বারওয়াস (ব্রোচ) এবং দেবল, এই দুটি বন্দরে। কিন্তু তিনটি আক্রমণই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শেষ দুটি আক্রমণ ঘটেছিল ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে।

৬৬০ খৃষ্টাব্দে খলিফা আলি-র সময়ে স্থলপথে একটি অভিযান ভারত অভিমুখে প্রেরিত হয়। এই বাহিনী বাধাপ্রাপ্ত হয় ৬৬৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সিন্ধুর প্রবেশপথ কিকান অঞ্চলে। এখানে প্রবলভাবে পরাজিত হয়ে তারা ফিরে যায়। পরবর্তী কুড়ি বছরে তারা এই অঞ্চলে ছয়বার অভিযান প্রেরণ করে, কিন্তু এক মাকরান দখল করা ভিন্ন তারা আর কিছু করতে পারেনি।

৬৮০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সিজিস্থানের আরব শাসনকর্তা আব্দর রহমান কাবুল ও

জাবুল জয় করেন, কিন্তু ৬৮৩ খৃষ্টাব্দেই কাবুল বিদ্রোহ করে এবং জুঙ্গার যুদ্ধে আরবদের পরাজিত ও উৎখাত করে। জাবুলের শাসনকর্তাও আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং আরবরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এটা ঘটেছিল ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ।

৬৯৫ খৃষ্টাব্দে অল্‌-হজাজ খলিফা কর্তৃক ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে উবাইদ-উল্লাকে কাবুল জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। কাবুল ও জাবুলের রাজারা যুক্তভাবে আরবদের পরাজিত করেন এবং ভগ্নহৃদয়ে উবাইদ-উল্লা মারা যান। অতঃপর ৬৯৯ খৃষ্টাব্দে আব্দর রহমানের নেতৃত্বে জাবুলে অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু আব্দর রহমান বিদ্রোহী হওয়াতে সে অভিযানও ব্যর্থ হয়। অতঃপর হজাজের সঙ্গে জাবুলের একটি সন্ধিচুক্তি হয় যাতে স্থির হয় যে আরবেরা আর জাবুল আক্রমণ করবে না, বিনিময়ে জাবুল একটি বাৎসরিক কর দেবে। এই চুক্তি ৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ হজাজের মৃত্যু পর্যন্ত কার্যকর ছিল, তারপর জাবুলের রাজা কর দেওয়া বন্ধ করেন। এরপর শতবর্ষেরও অধিককাল কাবুল ও জাবুল স্বাধীন ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশে হজাজ অবশ্য সফল হয়েছিলেন। সিংহল থেকে একটি জাহাজ কিছু মুসলিম তীর্থযাত্রিনী নিয়ে ইরাক যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দেবল বন্দরের নিকট তারা জলদস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়। হজাজ তাদের ফেরত চেয়ে রাজা দাহরের নিকট চিঠি লিখলে দাহর জানান যে জলদস্যুদের উপর তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে হজাজ দেবল আক্রমণের জন্য একটি বাহিনী পাঠান। এই ঘটনাটি অবশ্য হজাজের পক্ষে একটা অজুহাত, কেননা ইতিপূর্বে তিনি স্থলপথে কয়েকবার সিন্ধুতে হানা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক, এই বাহিনী পরাজিত হয়। দ্বিতীয় আক্রমণ হয় বুদাইলের নেতৃত্বে। দাহরের পুত্র জয়সিংহ এক্ষেত্রেও জয়লাভ করেন এবং বুদাইল নিহত হন।

অতঃপর হজাজ বিস্তৃত সামরিক আয়োজন করে নিজ জামাতা মুহম্মদ ইবন কাশিমকে দাহরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এবারে মুহম্মদ দেবল অধিকারে সমর্থ হন। দেবল বন্দরটির সঠিক অবস্থান আমরা জানিনা। সম্ভবত এটি ছিল তট্টা অঞ্চলে। দেবল থেকে মুহম্মদ নেরুন-এ (বর্তমান হায়দরাবাদ) উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে সিউইস্তানে (সেহোয়ান)। অভিযানকালে তিনি কিছু প্রভাবশালী বৌদ্ধ এবং মোকা নামক দাহরের একজন শক্তিমান সামন্তের সাহায্য পান। তারপর তিনি সিন্ধু অতিক্রম করে রাওর নামক

স্থানে দাহরের সম্মুখীন হন। যুদ্ধকালে দাহর অকস্মাৎ নিহত হলে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়। এর পর দাহরের পুত্র জয়সিংহ ব্রাহ্মণাবাদে পিছিয়ে আসেন এবং রাজধানী আলোর রক্ষায় সচেষ্ট হন। ছমাস চেষ্টার পর মুহম্মদ ব্রাহ্মণাবাদ জয় করেন এবং তারপরেই আলোরের পতন ঘটে! অতঃপর মুহম্মদ উত্তর দিকে মূলতান জয় করেন।

৭১৪ খৃষ্টাব্দে হজাজের মৃত্যুর পর খলিফা ওয়ালিদ মুহম্মদকে ইরাকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। মুহম্মদের মৃত্যুতে সিন্ধুর সামন্তরাজারা আরব-অধিকার অস্বীকার করেন। দাহরের পুত্র জয়সিংহ পুনরায় ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করেন। খলিফা দ্বিতীয় উমর (৭১৭-২০) তাঁর নিকট একটা আনুষ্ঠানিক অধীনতার বিনিময়ে এঁদের সামন্তরাজা হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন, একটি শর্তে যে এঁদের সকলকে মুসলমান হতে হবে। জয়সিংহ সমেত অনেকেই তা মেনে নেন। কিন্তু পরবর্তী খলিফা হিসামের (৭২৪-৪৩) আমলে জয়সিংহ বিদ্রোহী হন, এবং খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত সিন্ধুর শাসনকর্তা জুনাইদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

৭২৪ থেকে ৭৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জুনাইদ রাজস্থানের মধ্য দিয়ে পূর্বে মালব ও দক্ষিণে ব্রোচ পর্যন্ত জয় করেন। অধিকৃত স্থানগুলি ছিল বৈলমান (ভল্লমণ্ডল ?) জুর্জ, মরমাদ (মরু-মার, অর্থৎ জয়শলমীর ও যোধপুরের একাংশ) মন্দল, দহ্নজ, বারওয়াস (ব্রোচ), মালিবা ও উজাইন (মালব ও তার রাজধানী উজ্জয়িনী), কিন্তু এই জয়লাভ ক্ষণস্থায়ী হয়। প্রতীহার রাজা নাগভট এবং লাটের (দক্ষিণ গুজরাত) চালুক্যরাজ অবনিজনাশ্রয় পুলকেশিরাজ আরব বাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন।

উত্তর পশ্চিমে মুহম্মদ ইবন কাশিমের চেষ্টায় মুলতান, কিরাজ বা কাংরা ও কাশ্মীরের কিছু অংশ আরবদের অধিকারে এসেছিল, কিন্তু জুনাইদ তা বজায় রাখতে পারেন নি। কনৌজের যশোবর্মা ও কাশ্মীরের ললিতাদিত্য আরব বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন।

এদেশে আরব আক্রমণ কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখতে পারেনি। এক সিন্ধু ছাড়া আর কোন জায়গাতেই আরবরা সফল হয়নি। আরবদের নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে খলিফাদের স্বার্থের সংঘাত, অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে খোদ আরবেই রাষ্ট্রক্ষমতা উম্মীয়দের হাত থেকে চলে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা আরবদের নবজাগরণের ধারটা অনেক ভোঁতা

করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারত ইতিহাসে তুর্কীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার সূত্রপাত আরবরা করেছিল বললে ঠিক বলা হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতের তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আরবের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। অত্যল্পকাল সময়ের মধ্যেও তারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আরবে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলির অনুবাদ করিয়েছিল।

৭॥ দক্ষিণাপথ: বাদামির চালুক্যগণ

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাদামির (বিজাপুর জেলার) চালুক্যগণ, যারা আদি পশ্চিমী চালুক্য নামেও পরিচিত, দক্ষিণভারতে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাদামির এই চালুক্যরা নিজেদের হারীতীপুত্র ও মানব্যগোত্রীয় বলত। এই বংশের গোড়ার দিকে রাজারা ছিলেন জয়সিংহ ও তাঁর পুত্র রণরাগ, যাঁদের বিষয়ে খুব অল্পই জানা যায়। পরবর্তীকালের চালুক্যদের লেখমালায় এঁদের পূর্বপুরুষদের খুব জমকালো বংশতালিকা দেওয়া আছে, এঁদের বিষয়েও অনেক কাল্পনিক কথা বলা আছে।

রণরাগের পুত্র প্রথম পুলকেশী (৫৩৫-৬৬ খৃষ্টাব্দ) বৎপুর-বংশীয় দুর্লভ-দেবীকে বিবাহ করেন এবং ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁর বাদামি-লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি সেখানে একটি দুর্গের পত্তন করেছিলেন। অনুমান করা যায় যে যে বিজাপুর অঞ্চলেই তাঁর রাজত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। বাদামির পূর্ব নাম ছিল বাতাপি।

প্রথম পুলকেশীর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মা (৫৬৬-৫৯৮ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর পুত্রের আইহোলি-লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি নল, মৌর্য এবং কদম্বদের ধ্বংস করেছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে কীর্তিবর্মার সময়ে চালুক্যদের রাজ্য মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল, মহীশূর ও তামিলনাড়ুর কতকাংশে বিস্তৃত ছিল। কীর্তিবর্মা কোংকনের মৌর্যদেরও কিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন।

কীর্তিবর্মার পর তাঁর ভাই মঙ্গলেশ (৫৯৮-৬১১ খৃষ্টাব্দ) রাজা হন। আইহোলি লিপিতে কলচুরিদের উপর তাঁর বিজয়লাভ ও তাঁর রেবতী দ্বীপ (রত্নাগিরি জেলার সমুদ্রোপকূলবর্তী রেদি নামক খাড়ি অঞ্চল) অধিকারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অপরাপর লেখমালাসমূহ থেকেও এই বক্তব্য সমর্থিত হয়। মনে করা যেতে পারে যে মঙ্গলেশের সময় মহারাষ্ট্রের অনেকখানি অংশই

চালুক্যদের অধিকারে এসেছিল। মঙ্গলেশের রাজত্বের শেষ দিকে চালুক্যদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। মঙ্গলেশের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান তাঁর বড় ভাই কীর্তিবর্মার পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী। দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোলি লিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে মঙ্গলেশ নিজপুত্রকে চালুক্যদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১১-৪২ খৃষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর পিতৃ-পুরুষদের মতই শ্রীপৃথিবীবল্লভ ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন। নাসিক থেকে প্রাপ্ত লোহ্‌নের লিপি (৬৩০ খৃঃ) থেকে জানা যায় যে তিনি পরম ভাগবত, অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। মঙ্গলেশের সঙ্গে পুলকেশীর গৃহযুদ্ধের সময়ে চালুক্যদের অধীনস্থ প্রদেশগুলি হাতছাড়া হয়ে যায়, এবং আপ্পায়িক ও গোবিন্দ নামক দুজন সামন্ত রাজা চালুক্যদের রাজ্যের মূল অংশেই আক্রমণ চালান। পুলকেশী কৌশলে উভয়ের মধ্যে ভেদ এনে দিয়ে নিজের অবস্থাকে গুছিয়ে নেন।

তাঁর সভাকবি রবিকীর্তি তাঁর যে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন, যা আইহোলি লিপি নামে খ্যাত, তা থেকে দ্বিতীয় পুলকেশীর দিগ্বিজয়ের কাহিনী জানা যায়। দক্ষিণে তিনি প্রথম পরাজিত করেন বনবাসী অঞ্চলের কদম্বদের, তারপর দক্ষিণ মহীশূরের গঙ্গদের, মহীশূরের সিমোগ জেলার আঢ়ুপদের, কোংকনের মৌর্যদের এবং আরও উত্তরে লাট, মালব ও গুর্জরদের।

এরপর আইহোলি লিপিতে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে; এই যুদ্ধ হয়েছিল রেবা বা নর্মদা নদীর তীরে যাতে দ্বিতীয় পুলকেশী জয়লাভ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য ৫।৫)। এই যুদ্ধের তারিখ নিয়ে সংশয় আছে। এটি সম্ভবত ঘটেছিল ৬৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে। কেননা ৬৩০ খৃষ্টাব্দে রচিত পুলকেশীর লোহ্‌নের লিপিতে এই বিজয়ের উল্লেখ নেই।

অতঃপর আইহোলি-লিপিতে দ্বিতীয় পুলকেশীর দক্ষিণাপথের পূর্বাঞ্চল বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে তিনি কোসল (সম্ভবত দক্ষিণ কোসলের পাণ্ডুবংশীদের) এবং কলিঙ্গদের (সম্ভবত গঞ্জাম জেলার কলিঙ্গনগরের গঙ্গদের) পরাজিত করেন। তারপর তিনি দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে পিষ্টপুর এবং কুনাল হ্রদে (এল্লোরের নিকট কোল্লেরু হ্রদ) একটি দুর্গ অধিকার করেন। বিষ্ণুকুণ্ডী-বংশীয় রাজা তৃতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মাকেও তিনি পরাজিত করেন। পিষ্টপুরের সিংহাসনে তিনি তাঁর ছোটভাই কুব্জ-বিষ্ণুবর্ধনকে বসান, যাঁর থেকে পরে

বিখ্যাত পূর্বচালুক্য বংশের উদ্ভব হয়। আরও দক্ষিণে তিনি পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মাকে (৬০০-৬৩০ খৃঃ) পরাজিত করেন এবং পল্লব রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে যান। পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী তিনি অধিকার করেননি বটে, কিন্তু তা তিনি বিপন্ন করে তুলেছিলেন। পল্লবদের লিপিতেও এই ইঙ্গিত আছে (দ্রষ্টব্য ৫।৯)। এর পর পুলকেশী কাবেরী নদী অতিক্রম করে চোল, কেরল ও পাণ্ড্যদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন। পল্লবদের বিরুদ্ধে এই শক্তিগুলিকে তিনি তাঁর অনুকূলে সক্রিয় রাখতে চেয়েছিলেন।

পল্লবদের উপর কিন্তু পুলকেশীর বিজয়লাভ স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত পল্লবদের হাতেই পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত হতে হয়। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মার পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মা ৬৪২ খৃষ্টাব্দে পুলকেশীকে পাল্টা আক্রমণ করেন। পরিয়ল, মনিঙ্গল, শূরমার ও অপরাপর স্থানে কয়েকটি যুদ্ধে নরসিংহবর্মা পুলকেশীকে পরাস্ত করেন এবং তাঁর রাজধানী বাদামি শহরটিকেও ধ্বংস করেন। তিনি যে সত্যই বাদামি ধ্বংস করেছিলেন তা তাঁর বাতাপিকোণ্ড উপাধি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

চালুক্যদের পরবর্তীকালের লিপিসমূহ থেকে জানা যায় যে দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৮১ খৃঃ) চালুক্যদের রাজা হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশী মারা গিয়েছিলেন ৬৪২ খৃষ্টাব্দে, এবং অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় তের বছর সময় লেগেছিল চালুক্যদের নিজেদের ঘর সামলাতে এই সময়টা যে চালুক্যদের পক্ষে দুর্যোগপূর্ণ ছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায় কয়রা এবং বাগুমুরা লিপিদ্বয়ের সাক্ষ্য থেকে। প্রথম বিক্রমাদিত্য সম্ভবত মাতামহ গঙ্গরাজ দুর্বিনীতের সহায়তায় বাদামিকে শত্রুর প্রভাব থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। লেখমালাসমূহ থেকে জানা যায় যে পুলকেশীর আরও পুত্র ছিল, এবং সিংহাসনের জন্য যে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বতা হয়নি একথা বলা যায়না। পল্লবদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের সংবাদ বিভিন্ন লেখমালা থেকে পাওয়া যায়। জানা যায় যে, তিবি পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মা, তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মা এবং পৌত্র প্রথম পরমেশ্বরবর্মার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং কাঞ্চী অধিকার করেছিলেন, কিন্তু পল্লবদের লিপিতে পাল্টা দাবি করা হয়েছে। আসলে এই দুই রাজশক্তির ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলছিল এবং কখনও এপক্ষ কখনও ওপক্ষ জয়ী হচ্ছিল। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালেই তাঁর ছোট ভাই ধারাশ্রয় জয়সিংহবর্মা গুজরাত লাট অঞ্চলে

একটি সামন্তরাজ্য স্থাপন করেন যার রাজধানী ছিল নবসারি।

বিক্রমাদিত্যের পর তাঁর পুত্র বিনয়াদিত্য (৬৮১-৯৬ খৃঃ) সিংহাসনে বসেন। তাঁর নিজেরও কিছু লেখমালা আছে যেগুলি থেকে জানা যায় যে পল্লব, কাঢ়ভ্র, কেরল, হৈহয় (কলচুরি), ভিঢ়, মালব, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতিরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এই দাবির যে কতটা সত্য এবং কতটা প্রথাগত তা জানার উপায় নেই। পরবর্তী লিপিসমূহে তাঁকে কাবের, পারসিক এবং সিংহলের বশ্যতা আদায়কারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। তিনি একবার উত্তরাপথেও অভিযান করেছিলেন বলে সংবাদ আছে।

বিনয়াদিত্যের পর তাঁর পুত্র বিজয়াদিত্য ৬৯৬ থেকে ৭৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে আবার পল্লবদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। তাঁর আমলের উলচল-শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তাঁর রাজত্বের ৩৫তম বছরে, অর্থাৎ ৭৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী জয় করেন এবং পল্লবরাজ দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মার কাছ থেকে কর আদায় করেন।

পরবর্তী রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের (৭৩৩-৪৫ খৃষ্টাব্দ) সময়েও চালুক্য-পল্লব যুদ্ধের শেষ হয়নি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লবমল্ল। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যও যে পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চীতে প্রবেশ করেছিলেন তার কিছু ইঙ্গিত কাঞ্চীর রাজসিংহের মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি ভাঙাচোরা লিপি থেকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পাণ্ড্য, চোল, কেরল, কাঢ়ভ্র ও অপরাপর রাজ্যগুলিকে নিজের প্রভাবের অধীনে এনেছিলেন বলে দাবি করেছেন। ৭৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁর নরবন-লিপি থেকে রত্নগিরি জেলায় তাঁর একটি গ্রামদানের খবর পাওয়া যায় যা তিনি করেছিলেন তাঁর অধীনস্থ সামন্ত রাষ্ট্রকূট গোবিন্দরাজের অনুরোধে। এই রাষ্ট্রকূটরা পরে খুব শক্তিশালী হয়েছিল। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের আমলেই উত্তরে আরব আক্রমণ হয়েছিল, এবং এই আক্রমণ যাঁরা প্রতিরোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যেরই জ্ঞাতি ভাই অবনিজনাশ্রয়-পুলকেশী প্রথম বিক্রমাদিত্যের সময়ে গুজরাত-লাট অঞ্চলে চালুক্যদের যে শাখাবংশটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই অবনিজনাশ্রয়-পুলকেশী সেই বংশের। এই অঞ্চলটি পরে রাষ্ট্রকূটদের অধিকারে আসে।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার (৭৪৪-৭৫৭ খৃষ্টাব্দ) আমলে বাদামির চালুক্যদের পতন হয়। তাদের গোটা এলাকাটাই

ধীরে ধীরে রাষ্ট্রকূটদেব হাতে চলে যায়। ৭৪২ খৃষ্টাব্দে রচিত রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের এলোরা-লিপি থেকে জানা যায় যে তখনও তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার সামন্ত ছিলেন, কিন্তু ৭৫৪ খৃষ্টাব্দের সমানগড় লিপিতে দন্তিদুর্গকে মহারাজাধিরাজ বলা হয়েছে। ৭৫৭ খৃষ্টাব্দেও দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার স্বাধীন অস্তিত্বের কথাও তাঁর বক্কলেরি-লিপি থেকে জানা যায়; কিন্তু শীঘ্রই পরবর্তী রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণের হাতে চালুক্যরাজ্যের বিলোপ ঘটে।

৮॥ পূর্বী-চালুক্যগণ ঃ

বাদামীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী যে ৬৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে পিষ্টপুরের রাজা এবং বিষ্ণুকুণ্ডীবংশীয় রাজা তৃতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে তাঁদের এলাকার উপর (ভিজাগাপটম জেলার উপকূলভাগ থেকে নেলোর জেলার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত) তাঁর ভাই কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে বসিয়ে দিয়েছিলেন, এবং এই বিষ্ণুবর্ধন থেকেই যে পূর্বী-চালুক্য বংশের উদ্ভব হয়েছিল, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। কোপ্পরম-লিপি এবং অপরাপর লেখমালার সাক্ষ্য থেকে এবং বিষ্ণুবর্ধনের নিজস্ব তিম্মপুরম ও চিপুরপল্লে লিপিদ্বয় থেকে জানা যায় যে পিষ্টপুরেই তাঁর রাজধানী ছিল, যদিও পরে ওই রাজধানী প্রাচীন বেঙ্গীতে সরিয়ে আনা হয়। বিষ্ণুবর্ধনের পর তাঁর পুত্র প্রথম জয়সিংহ (৬৩৩-৬৩ খৃঃ) এবং তারপর তাঁর ভাই ইন্দ্রবর্মা ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিষ্ণুবর্ধন (৬৬৩-৭২ খৃঃ) রাজত্ব করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন বিজয়সিদ্ধি (৬৭২-৯৬), দ্বিতীয় জয়সিংহ (৬৯৬-৭০৯), তৃতীয় বিষ্ণুবর্ধন (৭০৯-৪৬) এবং প্রথম বিজয়াদিত্য (৭৪৬-৬৪)। প্রথম বিক্রমাদিত্যের সময়ে বাদামির চালুক্য এলাকা রাষ্ট্রকূটদের হাতে চলে গিয়েছিল। এবং রাষ্ট্রকূটরা এই পূর্বী-চালুক্যদের উপরেও আক্রমণ চালিয়েছিল। রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে পূর্বী-চালুক্যদের দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলে যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব।

৯॥ কাঞ্চীর পল্লবগণ ও সুদূর দক্ষিণের শক্তিসমূহ ঃ

পল্লবদের উৎপত্তি ও আদি বাসস্থান নিয়ে লেখা হয়েছে বিস্তর কিন্তু এ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য কিছুই জানা যায়নি। পল্লবদের লেখমালাসমূহ তিন ধরনের— প্রাকৃত ভাষায় লিখিত তাম্রশাসনসমূহ যেগুলি ২৫০ থেকে ৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত; সংস্কৃত তাম্রশাসনসমূহ যেগুলির রচনাকাল ৩৫০ থেকে ৬০০ মধ্যে; এবং সপ্তম শতক থেকে শুরু হয়েছে এরকম শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহ।

পল্লবদের বংশতালিকা ও কালানুক্রম সম্পর্কে আমরা যা জানি তা নিম্নে উল্লেখ করছি।

প্রাকৃত লেখমালাসমূহ থেকে আমরা নিম্নলিখিত রাজাদের নাম পাই: সিংহবর্মা (তৃতীয় শতকের শেষ), শিবস্কন্দবর্মা (চতুর্থ শতকের শুরু), স্কন্দবর্মা (চতুর্থ শতকের মধ্য) এবং বিষ্ণুগোপ (চতুর্থ শতকের তৃতীয় ভাগ)।

সংস্কৃত লেখমালাসমূহ থেকে আমরা পনের জন রাজার নাম পাই, যাঁদের মধ্যে দশ জনের রাজ্যকাল সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে প্রথম চারজনের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, প্রাকৃত লিপি সমূহেও যাঁদের নাম পাওয়া যায়। বাকিরা হলেন দ্বিতীয় কুমারবিষ্ণু (পঞ্চম শতকের শুরু), সিংহবর্মা (৪৩৬-৫৮), শান্তিবর্মা (ষষ্ঠ শতকের শুরু), অপর এক সিংহবর্মা (৫৫০-৫৭৫), সিংহবিষ্ণু (৫৭৫-৬০০), প্রথম মহেন্দ্রবর্মা (৬০০-৬৩০)।

উপরি উক্ত তালিকার শেষ তিনজন রাজা থেকে যে বংশ শুরু হয়েছে, এখানে আমাদের আলোচ্য তারাই। সমসাময়িক এবং অপরাপর লেখমালার সাক্ষ্য থেকে এই বংশের যে ধারা ও শাসনকালের পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ: সিংহবর্মা (৫৫০-৭৫), সিংহবিষ্ণু (৫৭৫-৬০০), প্রথম মহেন্দ্রবর্মা (৬০০-৩০), প্রথম নরসিংহবর্মা (৬৩০-৬৮), দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মা (৬৬৮-৭০) প্রথম পরমেশ্বরবর্মা (৬৭০-৯৫), দ্বিতীয় নরসিংহবর্মা (৬৯৫-৭২২), দ্বিতীয় পরমেশ্বর বর্মা (৭২২-৭৩০) এবং নন্দিবর্মা পল্লবমল্ল (৭৩০-৯৬)।

[এছাড়া নেল্লোর-গুণ্টুর অঞ্চলে, অর্থাৎ মূল পল্লব এলাকার উত্তরে পল্লবদের একটি শাখাবংশ রাজত্ব করেছিল আনুমানিক ৩৭৫ থেকে ৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই শাখাবংশের রাজারা ছিলেন যথাক্রমে বীরকূচবর্মা, কুমারবিষ্ণু, প্রথম স্কন্দবর্মা, প্রথম বীরবর্মা, দ্বিতীয় স্কন্দবর্মা, প্রথম বিষ্ণুগোপবর্মা, সিংহবর্মা ও বিষ্ণুগোপবর্মা। পল্লবদের অনুরূপ আরও দু'একটি শাখাবংশ থাকা অসম্ভব ছিল না।]

মূল পল্লবদের এলাকা ছিল উত্তর পেনার নদী থেকে কাবেরী পর্যন্ত। কখনও কখনও উত্তরসীমা কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল। পল্লবদের গৌরবের সূচনা হচ্ছে রাজা সিংহবিষ্ণু থেকে যিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি চোলমণ্ডল জয় করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। দুটি লেখমালার সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে তিনি দক্ষিণে কুম্ভকোনম পর্যন্ত এলাকার অধীশ্বর ছিলেন।

সিংহবিষ্ণুর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মার সময় থেকেই চালুক্য-পল্লব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোলি-লিপি থেকে জানা যায় যে এক্ষেত্রে চালুক্যরাই বিজয়ী হয়েছিল এবং মহেন্দ্রবর্মার হাত থেকে তাঁর রাজত্বের উত্তরাঞ্চল চ্যুত হয়েছিল। তবে দক্ষিণে মহেন্দ্রবর্মা কাবেরী নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বাড়িয়েছিলেন। মহেন্দ্রবর্মার রাজত্বকাল আনুমানিক ৬০০ থেকে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ। তিনি মত্তবিলাস নামক একটি প্রহসন রচনা করেছিলেন এবং কয়েকটি বিখ্যাত মন্দিরেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর ত্রিচিনোপলী গুহালিপি-সমূহ এবং অপরাপর কয়েকটি লেখমালা থেকে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়।

মহেন্দ্রবর্মার পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মা (৬৩০-৬৮ খৃঃ) দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন, এবং চালুক্যদের রাজধানী বাতাপি বা বাদামি শহরটি লুণ্ঠন করে বাতাপিকোণ্ড আখ্যা নেন। তিনি সিংহলে একটি নৌ অভিযান প্রেরণ করেন এবং নিজের মনোমত ব্যক্তি মানবর্মাকে সিংহলের সিংহাসনে বসান। মহাবলিপুরমের সপ্তপ্যাগোডার মধ্যে কয়েকটি তাঁর নির্দেশে রচিত হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ তাঁর আমলেই পল্লব রাজ্য পরিভ্রমণ করেন।

নরসিংহবর্মার পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মা দু বছর রাজত্ব করেন (৬৬৮-৭০ খৃঃ) এবং তারপর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র প্রথম পরমেশ্বরবর্মা (৬৭০-৯৫ খৃঃ)। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য যাঁর ৬৭৪ খৃষ্টাব্দে রচিত গদবাল-লিপিতে কাঞ্চী অধিকারের উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে পল্লব লেখমালাসমূহে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বরবর্মা বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করেছিলেন।

পরমেশ্বরবর্মার পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মা (৬৯৫-৭২২ খৃঃ) মোটামুটি শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে চীনের সঙ্গে পল্লব রাজত্বের যে ভাল বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ চীনে তাঁর দূত প্রেরণ। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মা (৭২২-৩০ খৃঃ) যিনি তাঁর রাজ্যকালের শেষের দিকে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের আক্রমণের সম্মুখীন হন।

শেষ উল্লেখযোগ্য পল্লব রাজা দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লবমল্ল (৭৩০-৮০০খৃঃ) যাঁর সম্পর্কে বহু তথ্য পল্লব, চালুক্য ও পাণ্ড্য লেখমালাসমূহ থেকে পাওয়া যায়। তাঁর আমলে, ৭৪০ খৃষ্টাব্দে, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কাঞ্চী অধিকার করেন। অবশ্য নন্দিবর্মা কাঞ্চী পুনরাধিকার

করেন। পল্লবদের সঙ্গে পাণ্ড্যদের যুদ্ধের সুযোগে সম্ভবত দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী দখল করতে পেরেছিলেন। পাণ্ড্যরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম রাজসিংহের নেতৃত্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু নন্দিবর্মার সেনাপতি উদয়চন্দ্রের তৎপরতায় পাণ্ড্য আক্রমণ সফল হয়নি। নন্দিবর্মা পূর্বী চালুক্যদেরও কিছু এলাকা দখল করেছিলেন। এরপর নন্দিবর্মাকে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। দন্তিদুর্গ কাঞ্চী দখল করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি নন্দিবর্মার সঙ্গে সন্ধি করেন এবং নিজকন্যা রেবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। এই রেবার গর্ভজাত ছিলেন দন্তিবর্মা যিনি ৭৯৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হন। তাঁর বংশ আরও কিছুকাল রাজত্ব করেছিল, যা আমরা পরে দেখব।

উরাইউর ও রেনাণ্ডুর চোলগণ : উরাইউর বা ত্রিচিনোপলী অঞ্চলে খৃষ্টীয় চতুর্থ থেকে নবম শতক পর্যন্ত চোলদের শাসন ছিল, কিন্তু ইতিহাসে তারা মোটেই প্রাধান্য পায়নি। এদের সম্পর্কে যতটুকু খবর পাওয়া গেছে তা হচ্ছে এই যে এরা কড়ভ্র, পল্লব ও পাণ্ড্যদের আক্রমণের শিকার বারবার হয়েছিল। আরও একটি চোল অধিকার ছিল রেনাণ্ডুদেশে যা ছিল কুড্ডাপা অনন্তপুর এবং কুর্নূল জেলাত্রয়ের অংশবিশেষ নিয়ে। সপ্তম শতকে এই চোলদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখমালাসমূহ থেকে এই বংশের রাজা নন্দিবর্মা, তাঁর তিন পুত্র সিংহবিষ্ণু, সুন্দরনন্দ এবং ধনঞ্জয়বর্মা, শেষোক্তের পুত্র মহেন্দ্রবিক্রমবর্মা ও তাঁর পুত্রদ্বয় গুণমুদিত ও পুণ্যকুমারের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা নিজেদের চোল-মহারাজ বলতেন এবং করিকাল-চোলের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন।

কড়ভ্রগণ : কড়ভ্রদের সম্পর্কে পাণ্ড্য, পল্লব ও চালুক্য লেখমালাসমূহে উল্লেখ আছে, যারা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে তামিল এলাকায় কিছুকালের জন্য একটি গণনীয় শক্তি হয়ে উঠেছিল। এদের উদ্ভব, আদি নিবাস, সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান কিছুই সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। অচ্যুতবিক্রান্ত নামক এদের এক রাজা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে চের, চোল ও পাণ্ড্যদের উপর কিছুটা কর্তৃত্ব করেছিলেন বলে জানা গেছে।

পাণ্ড্যগণ : পাণ্ড্যদের এলাকা ছিল সুদূর দক্ষিণে, সিংহলের মুখোমুখি, রাজধানী ছিল মাদুরা। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে কডুঙ্গোন (৫৯০-৬২০ খৃঃ) কড়ভ্রদের হাত থেকে পাণ্ড্য রাজ্যকে মুক্ত করার কাজ শুরু করেন, এবং তা শেষ করেন তাঁর পুত্র মারবর্মা (৬২০-৪৫ খৃঃ)। তৃতীয় রাজা শেন্দন (৬৪৫-

৭০ খৃঃ) চেরদের উপর বিজয়লাভ করেন, এবং চতুর্থ রাজা অরিকেসরি (৬৭০-৭১০ খৃঃ) পুনরায় তাদের পরাজিত করেন নেলবেলি বা টিনেভেলি অঞ্চলে। পঞ্চম রাজা কোচ্চড়ইয়ন রণধীর (৭১০-৪০ খৃঃ) আই নামক একটি ট্রাইবকে নির্মূল করেন। তাঁর কোঙ্গরকোমান উপাধি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি পাণ্ড্য এলাকার পশ্চিমে কঙ্গুদেশ জয় করেছিলেন। ষষ্ঠ রাজা মারবর্মা রাজসিংহ পল্লবদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন ও কাবেরী পর্যন্ত জয় করেছিলেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকেও তিনি সম্ভবত পরাজিত করেছিলেন। সপ্তম রাজা ছিলেন নেডুঞ্জড়ইয়ন, যাঁর বেঢ়বিকুডি-লিপি থেকে তাঁর পূর্বতন পল্লব রাজাদের সংবাদ জানা যায়। এঁর বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

পশ্চিমী গঙ্গগণ ঃ পশ্চিমী গঙ্গগণ মহীশূর অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কোঙ্গুনিবর্মা বা প্রথম মাধব (৩৫০-৪০০ খৃঃ) যাঁর রাজধানী ছিল কোলার-এ। এঁরা নিজেদের রাজত্বকে গঙ্গবাড়ি বলতেন। পরবর্তী রাজা ছিলেন দ্বিতীয় মাধব (৪০০-৩৫ খৃঃ)। রাজা হরিবর্মার (৪৫০-৬০ খৃঃ) সময়ে গঙ্গদের রাজধানী তড়কাড নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। সিংহবর্মা পল্লব কর্তৃক তিনি অভিষিক্ত হন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে এই গঙ্গগণ পল্লবদের সামন্ত রাজা হিসাবে বর্তমান ছিল। পরবর্তী রাজারা ছিলেন তৃতীয় মাধব (৪৬০-৫০০ খৃঃ), অবিনীত (৫০০-৪০ খৃঃ) এবং দুর্বিনীত (৫৪০-৬০০ খৃঃ)। দুর্বিনীত পুন্নাড় বা দক্ষিণ মহীশূর এবং কঙ্গুদেশ জয় করেছিলেন। চালুক্যদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল, কিন্তু পল্লবদের সঙ্গে নয়। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন মুষ্কর, শ্রীবিক্রম, ভূবিক্রম ও প্রথম শিবমার। শেষোক্তজন রাজত্ব করেছিলেন ৬৭০ থেকে ৭১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরবর্তী রাজা শ্রীপুরুষ বাণদের রাজা জগদেকমল্লকে পরাস্ত করেন। নন্দিবর্মা পল্লবমল্লকেও তিনি পরাজিত করেছিলেন বলে প্রকাশ। শ্রীপুরুষ রাজত্ব করেছিলেন ৭২৫ থেকে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণ গঙ্গবাড়ি আক্রমণ করেন। শ্রীপুরুষ পরাজিত হয়ে তাঁর রাজধানী বাঙ্গালোর অঞ্চলে মান্যপুরে সরিয়ে নিয়ে যান। গঙ্গদের পরবর্তী ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা করব।

কদম্বগণ ঃ কদম্বরা রাজত্ব করত কুন্তল অঞ্চলে, অর্থাৎ পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে এবং তাদের রাজধানী ছিল বনবাসী। কাকুৎস্থবর্মার তালগুণ্ড স্তম্ভ-

লিপি থেকে কদম্বদের আদি ইতিহাস পাওয়া যায়। কদম্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ময়ূরশর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, যিনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র কঙ্গবর্মা (৩৭০-৯৫ খৃঃ) যিনি সম্ভবত বাকাটকরাজ বিন্ধ্যসেনের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন যথাক্রমে ভগীরথ (৩৫০-৪২০ খৃঃ), রঘু (৪২০-৩০খৃঃ) এবং কাকুৎস্থবর্মা (৪৩০-৫০ খৃঃ)। কাকুৎস্থবর্মার পর কদম্বরাজ্য তাঁর দুই পুত্র শান্তিবর্মা (৪৫০-৭৫ খৃঃ) ও কৃষ্ণবর্মার মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। শান্তিবর্মা পশ্চিমী গঙ্গ ও পল্লবদের পরাজিত করেছিলেন বলে প্রকাশ। তাঁর পরবর্তী রাজারা দুর্বল ও আত্মকলহে মগ্ন হওয়ায় বনবাসীর কদম্বদের পতন ঘটে। শেষ রাজা হরিবর্মার সময়ে (৫৩৭-৪৭ খৃঃ) তাঁদের৽ সামন্ত চালুক্য প্রথম পুলকেশী বাদামিতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। হরিবর্মা কদম্বদের অপর শাখাটির সঙ্গে যুদ্ধ করেই শেষ হয়ে যান, এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কদম্ব রাজবংশের বড় শরিক বিলুপ্ত হয়ে যায়। ছোট শরিক কৃষ্ণবর্মা (৪৭৫-৮৫ খৃঃ) ত্রিপর্বতে রাজধানী স্থাপন করেন, কিন্তু কয়েক পুরুষ পরে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্যের দ্বারা তাঁরাও উৎখাতপ্রাপ্ত হন। দশম শতকের শেষের দিকে কদম্বদের একটা পুনরুত্থান ঘটেছিল।

বাণগণঃ বাণদের উৎকীর্ণ লিপিসমূহ পাওয়া গেছে কোলার ও উত্তর আর্কট জেলা থেকে। পরে তাদের এলাকার পরিবর্তন ঘটে। তারা পল্লবদের সামন্তশক্তি ছিল, এবং দক্ষিণ ভারতের রাজবংশাবলীর পারস্পরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের উদয়েন্দিরম এবং গুডিমল্লম লিপিদ্বয় থেকে বাণদের একটা বংশতালিকা পাওয়া যায়।

আঢ়ুপগণঃ আঢ়ুপগণ রাজত্ব করত তুঢ়ুব দেশে অর্থাৎ দক্ষিণ কানারা অঞ্চলে, তাদের রাজধানী ছিল উড়িপি। চালুক্যরাজ প্রথম কীর্তিবর্মা ও দ্বিতীয় পুলকেশী তাদের পরাস্ত করেছিলেন। আঢ়ুপদের মধ্যে গুণসাগর ছিলেন চালুক্যদের অধীনে বনবাসীর শাসনকর্তা। তিনি আনুমানিক ৬৫০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রথম চিত্রবাহন (৬৭৫-৭০০ খৃঃ) শক্তিমান শাসক ছিলেন।

কঙ্গুদেশঃ প্রাচীন কঙ্গুদেশ ছিল কোয়েম্বাটোর ও সালেম জেলাদ্বয় নিয়ে। এই রাজ্যের আদি ইতিহাস পাওয়া যায় না, শুধু এটুকু জানা যায় যে এখানে পশ্চিমীগঙ্গ, পল্লব ও পাণ্ড্যরা বারবার আক্রমণ চালিয়েছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাল-প্রতীহার-রাষ্ট্রকূট

১ ॥ পূর্বাভাষ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখলাম যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক শক্তিগুলির বিন্যাস নূতনভাবে হয়েছে যদিও পূর্বের কাঠামোর—অর্থাৎ দেশ জুড়ে হাজার হাজার ছোট ছোট সামন্তরাজ্যের অবস্থিতির—কোন পরিবর্তন হয়নি। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজা শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন তাঁরা অন্য রাজাদের সামন্তদের আনুগত্য আদায়ের জন্যই মূলত যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন। উত্তরের রাজারা মূলত উত্তর কেন্দ্রিক ছিলেন এবং দক্ষিণের রাজারা ছিলেন দক্ষিণ কেন্দ্রিক। পুলকেশীর সঙ্গে হর্ষের যুদ্ধের পিছনে হর্ষের দক্ষিণাপথ অভিযানের কোন মতলব ছিল না, এই সংঘাত ছিল মূলত গুজরাত-সৌরাষ্ট্র-মালব অঞ্চলের সামন্তদের উপর অধিকার নিয়ে। দক্ষিণাপথ ও সুদূর দক্ষিণের রাজ্যগুলি ওই একই উদ্দেশ্য নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করেছে। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূটেরা যখন এককভাবে প্রাধান্য অর্জন করেছে এবং আরও পরে যখন অপরাপর শক্তিও একক প্রাধান্য স্থাপন করতে পেরেছে, তখন দক্ষিণ থেকে সোজা আক্রমণ গেছে উত্তরে। খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের রাজনৈতিক সংযোগ মূলত পশ্চিমদিক দিয়েই হয়েছে—দক্ষিণ রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র দিয়ে এবং এই হিসাবে এই অঞ্চলটাই রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ধুতে আরব অধিকার নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, এবং আরব আক্রমণ শুধু ওই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা সৌরাষ্ট্র, গুর্জরদেশ, রাজস্থান ও মালব অঞ্চলেও ব্যাপ্ত হয়েছিল। এই আরব আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতেই গুর্জর-প্রতীহারদের শক্তি গড়ে উঠেছিল এবং একদা অখ্যাত নাগভট বিভিন্ন প্রতীহার গোষ্ঠীকে, তৎসহ চাহমান, গুহিলপুত্র, চালুক্য ও পরমারদের এক পতাকার তলায় নিয়ে এসে শুধু যে আরবদেরই প্রতিহত

করেছিলেন তা নয়, শক্তিশালী গুর্জর-প্রতীহার রাজ্যের ভিত্তিরও পত্তন করেছিলেন! দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটরা ৭৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র মহারাষ্ট্রের ও ৭৬৮র মধ্যে সমগ্র মহীশূরের মালিকানা নিয়ে দক্ষিণ ভারতে মুখ্য শক্তিরূপে নিজেদের প্রকাশ করেছিল। যে সময়ে প্রতীহাররা আরবশক্তিকে প্রতিহত করে পশ্চিমের সামন্ত রাজ্যগুলিকে নিজেদের তাঁবে আনছিল, রাষ্ট্রকূটরা প্রাক্তন চালুক্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর নিজেদের গড়ে তুলছিল, অপেক্ষাকৃত অপরিচিত পূর্বভারতে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে আরও একটি পরাক্রান্ত রাজনৈতিক শক্তি গড়ে উঠেছিল। সেই শক্তি হচ্ছে পাল শক্তি। কিভাবে এই শক্তির বিকাশ ঘটল তা দিয়েই আমরা বর্তমান অধ্যায় শুরু করছি।

২ ॥ বাংলা ও বিহারের পালবংশ

শশাংকের মৃত্যুর পর প্রায় শতবর্ষ সমগ্র বাংলাদেশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির রাজত্ব চলেছিল। এদের পূর্বপুরুষেরা হয়ত আগে শশাংকের সামন্ত ছিল, কিন্তু তারপর তারা পুরোদস্তুরই স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। অনুমান করা যায় যে, এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলির মধ্যে অনেকেরই সার্বভৌম শক্তি হিসাবে দাঁড়াবার শখ হয়েছিল, ফলে তারা পরস্পরের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ করেছিল, কিন্তু কারো পক্ষে বাঞ্ছিত ফললাভ করা সম্ভব হয়নি। যেখানে পার্টি অনেক, কেউ কাউকে মানতে রাজি নয়, প্রত্যেকেই সার্বভৌম হতে চায়, সেখানে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা হীনবল হওয়া ছাড়া আর যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না, বিলম্বে হলেও এই বোধ অনেকের মধ্যেই এসেছিল, যার ফলে তারা গোপাল নামক তাদেরই মধ্যে একজনকে সার্বভৌম রাজা হিসাবে নির্বাচিত করে। এই গোপাল থেকেই পালবংশের প্রতিষ্ঠা, যা ঘটেছিল ৭৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ।

গোপালের পিতার নাম ছিল বপ্যট এবং তাঁর পিতার নাম ছিল দয়িতবিষ্ণু। গোপাল এবং তাঁর বংশধরেরা বৌদ্ধ ছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে বলা হয়েছে যে গোপালের আদি দেশ ছিল বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ। লামা তারনাথ লিখেছেন যে গোপালের জন্মস্থান পুণ্ড্রবর্ধন (বগুড়া জেলা) এবং তিনি বঙ্গাল বা বঙ্গের রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। গোপাল মারা যান আনুমানিক ৭৭০ খৃষ্টাব্দে।

ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ)ঃ গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল রাজা

হবার কিছুকাল পরেই বৃহত্তর ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়েন। হর্ষবর্ধনের সময় থেকে কনৌজের প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বেড়ে যায় এবং কনৌজকে তাঁবে রাখা যে কোন রাজশক্তির কাছে একটা গৌরবের ব্যাপার বলে পরিগণিত হয়। কনৌজের উপর কর্তৃত্ব ছিল গুর্জর-প্রতীহারদের, এবং কনৌজের শাসক ইন্দ্রায়ুধ ছিলেন প্রতীহাররাজ বৎসরাজের নিজের লোক। ধর্মপাল এই ইন্দ্রায়ুধকে উচ্ছেদ করে তাঁর জায়গায় তাঁরই জ্ঞাতি চক্রায়ুধকে বসান, যার ফলে প্রতীহাররাজ বৎসরাজের সঙ্গে ধর্মপালের যুদ্ধ হয় গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী কোন স্থানে। এই যুদ্ধে ধর্মপাল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন, কিন্তু বৎসরাজ তাঁর বিজয়লাভের ফল ভোগ করার আগেই দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব আকস্মিকভাবে (অথবা কোন পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী) তাঁকে আক্রমণ করেন এবং বৎসরাজ পরাজিত হয়ে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে পালিয়ে যান। ধর্মপাল পরাজিত হয়ে ধ্রুবের বশ্যতা স্বীকার করেন। ধ্রুব কিছুকাল গঙ্গাস্নান ও পুণ্যার্জনের পর বাহিনীসহ স্বদেশে ফিরে যান, আর সমগ্র ঘটনাটি থেকে ধর্মপালই একমাত্র লাভবান হন। ধ্রুব কর্তৃক প্রতীহারদের শক্তিক্ষয়ের সুযোগ নিয়ে ধর্মপাল গোটা উত্তর ভারতেই নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন, এবং কনৌজে একটি দরবার আহ্বান করে চক্রায়ুধকে তার সিংহাসনে বসিয়ে অধীনস্থ সামন্তদের দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নেন।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কিরগণ ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তবে এটা আনুষ্ঠানিক দাবি, ওই নামগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তখনকার দিনে বাস্তবে অনুপস্থিত ছিল। কার্যত ধর্মপাল বাংলা ও বিহারের রাজা ছিলেন, উত্তরপ্রদেশের অনেকটা অংশ তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ছিল, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিছু সামন্তরাজা হয়ত আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। স্বয়ম্ভুপুরাণে বলা হয়েছে যে নেপালও ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করত।

কিন্তু ধর্মপালকে পুনরায় পুরাতন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রতীহার-রাজ বৎসরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট কনৌজ আক্রমণ করে চক্রায়ুধকে হটিয়ে নিজের লোক ইন্দ্রায়ুধকে আবার কনৌজের রাজা করে দেন, এবং ধর্মপাল তার প্রতিকার করতে গিয়ে মুঙ্গের-নিকটবর্তী স্থানে নাগভটের সম্মুখীন হন। কিন্তু এখানেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের

পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ নাটকীয়ভাবে এক্ষেত্রেও আবির্ভূত হন, এবং নাগভটকে পরাস্ত করেন। ধর্মপাল আনুষ্ঠানিকভাবে গোবিন্দের অধীনতা স্বীকার করে নেন, এবং গোবিন্দ অত্যল্পকাল পরে স্বদেশে ফিরে গেলে প্রথমবারের মত এবারেও পরাভব মেনেও ধর্মপাল সকল বিষয়ে লাভবান হন। রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে ধর্মপালের কোন গোপন চুক্তি থাকাও অসম্ভব ছিল না, এবং দুটি ঘটনার সাদৃশ্য দেখে পাল-প্রতীহার সংগ্রামে রাষ্ট্রকূটদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ কোন কাক-তালীয় ব্যাপার বলে মনে হয়না।

ধর্মপাল পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন এবং বিক্রমশিলা ও সোমপুরী মহাবিহারদ্বয় স্থাপন করে-ছিলেন। কোন কোন তিব্বতী গ্রন্থের মতে ওদন্তপুরী বিহারও তিনি নির্মাণ করেছিলেন, যদিও কোন কোন গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে গোপাল ও দেবপালের নাম আছে। তিনি বৌদ্ধ দার্শনিক হরিভদ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

দেবপাল (৮১০-৮৫০ খৃঃ): ধর্মপালের পুত্র দেবপাল যে শুধু পিতৃ-পুরুষের অর্জিত রাজ্য বজায় রেখেছিলেন তাই নয়, সেই রাজ্যের আয়তনও বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর আমলের লেখমালাসমূহ তাঁকে হিমালয় থেকে বিন্ধ্য ও পশ্চিম থেকে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার অধিপতি বলে বর্ণনা করেছে। পাল লেখমালাসমূহ থেকে এও জানা যায় যে তিনি পশ্চিমে কাম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য অঞ্চল অধিকার করেছিলেন, উৎকলদের উৎখাত করেছিলেন, প্রাগজ্যোতিষ জয় করেছিলেন, হূণদের দর্পচূর্ণ করেছিলেন এবং দ্রবিড় ও গুর্জররাজদের গৌরব খর্ব করেছিলেন।

দেবপালের সময় পৃথক হূণজাতির অস্তিত্ব ছিল না। এটা হতে পারে যে, কাম্বোজ অঞ্চলকে তিনি হূণ এলাকা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আসাম ও উড়িষ্যা দখল করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। তাঁর গুর্জর প্রতিপক্ষ ছিলেন দ্বিতীয় নাগভট, রামভদ্র ও ভোজ, যাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন বলে মনে করা যায়। তাঁর দ্রবিড় প্রতিদ্বন্দ্বী বোধহয় রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষ ছিলেন না। ধর্মপালের আমলে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে পালদের একটা কূটনৈতিক বোঝাপড়া ছিল, রাজা অমোঘবর্ষ শান্তিবাদী হলেও দুর্বল ছিলেন না এবং স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রকূট শক্তি ঘাঁটিয়ে পালদের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। তাছাড়া দ্রবিড় বলতে মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের পরিবর্তে তামিলভাষী এলাকাকেই বোঝায় এবং সম্ভবত এক্ষেত্রে দেবপালের

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পাণ্ড্যরাজা শ্রীমার শ্রীবল্লভ যাঁর লিপিতে বলা হয়েছে যে তাঁর বিরুদ্ধে একটি শক্তিজোটের যুদ্ধ হয়েছিল, যেখানে ছিল চোল, পল্লব ও গঙ্গেরা এবং ছিল মগধ ও উৎকল। ওই মগধ ও উৎকল বলতে সমসাময়িক দেবপালের রাজ্য সম্ভবত বুঝিয়েছে।

দেবপালও তাঁর পিতা ধর্মপালের মত বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর খ্যাতি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। মালয়েশিয়ার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের নিকট নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন এবং দেবপাল ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।

তিব্বতী কিছু রচনা থেকে জানা যায় যে, ধর্মপাল ও দেবপাল তাঁদের উপর তিব্বতের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু এই বক্তব্যের সমর্থনে আভ্যন্তরীণ তথ্য নেই। তবে পরবর্তীকালে পালদের অবক্ষয়ের যুগে উত্তরাঞ্চলে তিব্বতের কিছুটা রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব ছিল না।

অবক্ষয়ের যুগ : দেবপালের উত্তরাধিকারীগণ ঃ ৮৫০ খৃষ্টাব্দে দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল তিন-চার বছর রাজত্ব করে সন্ন্যাসী হয়ে যান, এবং তারপর তাঁর পুত্র নারায়ণপাল অর্ধশতাব্দীর অধিককাল রাজত্ব করেন, যাঁর দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রকূটেরা ৮৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ পালদের পরাস্ত করে। প্রতীহারেরা ভোজ ও মহেন্দ্রপালের নেতৃত্ব পূর্বদিকে যায়। মগধ বা দক্ষিণ বিহার পালদের হাতছাড়া হয়। আসামে রাজা হর্জর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উড়িষ্যায় শৈলোদ্ভবরা নিজেদের শক্তি গড়ে তোলে। এমন কি পালদের পিতৃভূমি, খোদ উত্তরবঙ্গও কিছুকালের জন্য প্রতীহার মহেন্দ্রপালের অধীনে আসে। অবশ্য ৯০৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ প্রতীহারদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের সংঘর্ষের সুযোগে নারায়ণপাল উত্তরবঙ্গ ও মগধ প্রতীহারদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন। সম্ভবত তিনি এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকূটদের সাহায্য পেয়েছিলেন, কেননা রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পৌত্রী তুঙ্গ বা জগত্তুঙ্গদেবের কন্যার সঙ্গে নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের বিবাহ হয়েছিল, এবং এই বিবাহের রাজনৈতিক তাৎপর্যটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

পরবর্তী রাজা রাজ্যপাল এবং তাঁর দুই উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল সর্বসমেত প্রায় আশী বছর রাজত্ব করেছিলেন। ওদিকে পশ্চিম ভারতেও তখন প্রতীহারদের পতন হয়েছে। চন্দেল্ল এবং কলচুরিদের লেখমালাসমূহ থেকে জানা যায় তারা গৌড়, রাঢ়, অঙ্গ ও বঙ্গালের

শাসকদের পরাজিত করেছিল যা থেকে মনে হয় যে খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষের দিকে পালদের নিজস্ব এলাকাগুলিই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পৃথক পৃথক ভৌগোলিক সত্বায় পরিণত হয়েছিল। এই সকল অঞ্চলের শাসকরা সম্ভবত কার্যত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন, হয়ত পালদের একটা আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করতেন, এইমাত্র।

বাস্তবিকই উত্তরবঙ্গে খৃষ্টীয় দশম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি কাম্বোজ রাজবংশ যে প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করত তার প্রমাণ আছে। এই বংশের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গেছে, রাজ্যপাল এবং তাঁর দুই পুত্র নারায়ণপাল ও নয়পাল। সম্ভবত এঁরা আসল পালদেরই কোন জ্ঞাতিবংশের লোক ছিলেন। এঁদের রাজধানী ছিল প্রিয়াঙ্গু যার স্থান নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয়নি।

অনুরূপভাবে, চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে হরিকেল (শ্রীহট্টসহ পূর্ববঙ্গের অনেকটা অংশ) রাজ্যের রাজা কান্তিদেব ও তাঁর রাজধানী বর্ধমান-পুরের উল্লেখ পাওয়া গেছে। দশম ও একাদশ শতকে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছেন চন্দ্র উপাধিধারী এমন রাজাদেরও খবর লেখমালা থেকে পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে জনৈক লয়হচন্দ্রের লিপি পাওয়া গেছে কুমিল্লা থেকে। লেখমালা থেকে আরও দুজনের নাম পাওয়া যায়, ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র, যাঁরা হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপে (বাখরগঞ্জ জেলা) রাজত্ব করতেন।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। বংশের লুপ্ত গৌরব তিনি বহুলাংশে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন যে কাহিনী আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করব।

৩॥ প্রতীহার রাজবংশ

প্রথম নাগভট ঃ বিভিন্ন প্রতীহার গোষ্ঠীর কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, বিশেষ করে আরব আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রথম নাগভট যে গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই কথা। নাগভটের পিতৃপুরুষ পূর্ব রাজস্থান ও মালবের কিয়দংশে একটি রাজ্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং নাগভট সেই রাজত্বের সীমানাকে আরও পশ্চিম দিকে ব্রোচ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে আরব আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি যে সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, তারই রাজনৈতিক ফল হচ্ছে পরবর্তীকালের বৃহৎ প্রতীহার রাজ্যের ভিত্তিপত্তন। নাগভট ৭৩০ খৃষ্টাব্দের

কাছাকাছি সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, এবং আনুমানিক ৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

নাগভটের আরব প্রতিদ্বন্দ্বী জুনাইদ অথবা তাঁর উত্তরাধিকারী তামিন ছিলেন সে কথা বলা শক্ত। তাঁর অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজ দন্তিদুর্গ। রাষ্ট্রকূট লেখমালাসমূহ থেকে গুর্জর-প্রতীহারদের উপর দন্তিদুর্গের বিজয়লাভের সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু এ বিজয় সম্ভবত কোন গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের সৃষ্টি করেনি।

বৎসরাজঃ প্রথম নাগভটের পর তাঁর ভাই-এর দুই পুত্র কক্কুক এবং দেবরাজ রাজা হয়েছিলেন, এবং তারপর দেবরাজের পুত্র বৎসরাজ প্রতীহারদের সম্রাট হন। লেখমালা ছাড়াও বিভিন্ন জৈন গ্রন্থ থেকে বৎসরাজের সংবাদ পাওয়া যায়। বৎসরাজের রাজ্যকাল নিয়ে কিছু সংশয় আছে, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া সাক্ষ্যে জানা যায় যে অবন্তীর রাজা হিসাবে তাঁর পরিচিতি ৭৮৩ খৃষ্টাব্দেই ঘটেছিল এবং তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। রাজস্থান ও মালবে তাঁর অধিকার যে প্রতিষ্ঠিত ছিল সে সংবাদও পাওয়া গেছে।

বৎসরাজ উত্তর ভারতে তাঁর প্রভাব বাড়িয়েছিলেন। কনৌজের সিংহাসনে তাঁর মনোনীত ইন্দ্রায়ুধকে সরিয়ে যখন পাল-রাজ ধর্মপাল চক্রায়ুধকে বসান, বৎসরাজ সোজাসুজি ধর্মপালের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, এবং গঙ্গাযমুনার দোয়াব অঞ্চলের যুদ্ধে ধর্মপালকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের আকস্মিক আক্রমণে তাঁকে প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করে রাজস্থানের মরুঅঞ্চলে পালিয়ে যেতে হয় (দ্রষ্টব্য ৬।২)।

দ্বিতীয় নাগভটঃ বৎসরাজের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট, যাঁর পৌত্রের গোয়ালিয়র লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি অন্ধ্র, সৈন্ধব, বিদর্ভ এবং কলিঙ্গের বশ্যতা আদায় করেছিলেন, চক্রায়ুধ এবং বঙ্গের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন এবং আনর্ত, মালব, কিরাত, তুরস্ক, বৎস ও মৎস্যদের পার্বত্য দুর্গগুলি জয় করেছিলেন। বেশির ভাগ দাবিই প্রথাগত হলেও, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নাগভট রীতিমত শক্তিসঞ্চয় করেছিলেন, প্রাক্তন প্রতীহার এলাকাগুলি দখলে এনেছিলেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ রাজত্বের বাইরেরও কিছু কিছু সামন্তশক্তি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

যাই হোক নিজের শক্তিকে সংহত করে দ্বিতীয় নাগভট প্রথমেই কনৌজ দখল করে ধর্মপালের মনোনীত ব্যক্তি চক্রায়ুধকে সরিয়ে নিজের লোক ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসনে বসান। শুধু তাই নয় তাঁর বাহিনী নিয়ে তিনি মুঙ্গের পর্যন্ত এগিয়ে যান। বাধা দিতে এসে ধর্মপাল তাঁর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন, কিন্তু এবারেও সেই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ আকস্মিকভাবে এসে প্রতীহার বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। নাগভট বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে যান। এদিকে গোবিন্দ চলে যাবার পর ধর্মপাল ও তৎপুত্র দেবপাল প্রতীহাদের বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে উত্তর ভারতে পাল আধিপত্যের পুনরুদ্ধার ঘটান। দ্বিতীয় নাগভটের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের যুদ্ধ হয়েছিল ৮০৯ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে।

ভোজঃ বৎসরাজের মত দ্বিতীয় নাগভটের শেষ পর্যায়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও, নিজস্ব এলাকায় প্রতীহারদের বিশেষ শক্তিহানি হয়েছিল বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় নাগভটের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামভদ্র তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন ভোজ, যিনি প্রতীহার শক্তিকে আবার নূতনভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন।

৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রচিত ভোজের বারা-তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি ওই সময় নাগাদ মহোদয় বা কনৌজেরও অধিপতি ছিলেন এবং কনৌজ তার রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। যে কনৌজ নিয়ে প্রতীহারদের সঙ্গে পালদের দীর্ঘকালীন সংগ্রাম, ভোজের আমলে তা প্রতীহারদের অধীনেই এসেছিল। ভোজের সিংহাসন লাভের সময় প্রতীহারদেরই আর একটি শাখা যারা যোধপুর অঞ্চলে বাস করত রাজা কক্কের নেতৃত্বে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। ভোজের দৌলতপুর-তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ৮৪৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তিনি যোধপুর-প্রতীহাদের পুনর্মূষিক করেন এবং গুর্জরত্রা অর্থাৎ মধ্য ও পূর্ব রাজস্থানে নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু ভোজকে কয়েকটি বড় ক্ষেত্রে পরাজিত হতেও হয়েছিল। তাঁর প্রথম পরাজয় হয়েছিল পালবংশীয় রাজা দেবপালের হাতে। অতঃপর তিনি পূর্বের পরিবর্তে দক্ষিণের দিকে নজর দেন, কিন্তু রাষ্ট্রকূটদের হাতে পরাজিত হন। এটা ঘটেছিল ৮৪৫ থেকে ৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে। কলচুরিরাজ কোক্কলের কাছেও ভোজ পরাজিত হন।

এইসব পরাজয়ে ভোজ ভেঙে পড়েননি। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ পররাজ্য বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন এবং দেবপালের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের পালবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ভোজ বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালান এবং নারায়ণ পালকে পরাজিত করে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছুটা অংশ দখল করেন। একটি প্রতীহার লিপি থেকে জানা যায় যে ভোজ রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কৃষ্ণকে পরাজিত করেছিলেন। ভোজের রাজ্যসীমা ছিল উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত। গোরখপুর অঞ্চলের কলচুরিরা তাঁর সামন্ত ছিল, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করত। মালব অঞ্চল অধীনে ছিল। ভোজের রাজ্যকাল মোটামুটি ৮৩৬ থেকে ৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

মহেন্দ্রপালঃ ভোজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহেন্দ্রপাল রাজা হন যিনি আনুমানিক ৮৮৫ থেকে ৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার অধিকৃত অঞ্চলগুলি শুধু বজায়ই রাখেন নি, তা আরও বর্ধিত করেছিলেন। তাঁর লেখমালাসমূহ পাওয়া গেছে কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে, পূর্ব পাঞ্জাবে, ঝাঁসি জেলায়, অযোধ্যায়, দক্ষিণ বিহারে এবং উত্তরবঙ্গে। এই দিক থেকে বিচার করলে মহেন্দ্রপালের মত বিস্তৃত রাজত্ব খুব কম রাজাই ভোগ করেছেন।

পরবর্তী প্রতীহারগণঃ মহেন্দ্রপালের পরবর্তী রাজারা ছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত দ্বিতীয় ভোজ এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত বিনায়কপাল বা মহীপাল। শেষোক্তের জানা তারিখ ৯১৪, ৯১৭ ও ৯৩১ খৃষ্টাব্দ। মহীপাল যে কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন তা তার ৯১৪ খৃষ্টাব্দের লিপি থেকে জানা যায়। আরব লেখক অল-মাসুদি তার শক্তি ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন করেছেন তার সভাকবি রাজশেখর। কিন্তু তাঁর আমলে রাষ্ট্রকূটদের হাতে প্রতীহারদের ব্যাপক পরাজয় ঘটে এবং মহীপাল পলায়ন করতে বাধ্য হন। পরে অবশ্য মহীপাল তার হৃতরাজ্যের অনেকখানি পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। ৯৩১ খৃষ্টাব্দের তাঁর একটি লিপি শেষ জানা যায় যে মহীপাল পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, পূর্বে বারানসী এবং দক্ষিণে চান্দেরি পর্যন্ত রাজত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

মহীপাল ৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পরবর্তী রাজা ছিলেন দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাল (৯৪৫-৪৬ খৃঃ), দেবপাল (৯৪৮-৪৯ খৃঃ), দ্বিতীয়

বিনায়কপাল (৯৫৩-৫৪ খৃঃ), দ্বিতীয় মহীপাল (৯৫৪ খৃঃ), বিজয়পাল (৯৬০ খৃঃ), রাজ্যপাল, ত্রিলোচনপাল ও যশঃপাল। এঁদের আমলে ধীরে ধীরে প্রতীহার রাজত্ব একেবারেই ভেঙে পড়ে। মূলত রাষ্ট্রকূট ও চন্দেল্ল আক্রমণ, সামন্তদের স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রতীহার রাজাদের অযোগ্যতা ও সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বই তাদের ধ্বংসের কারণ। প্রতীহার রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে তিনটি শক্তির জাগরণ পরে হয়েছিল। এরা ছিল রাজস্থানের চাহমান (চৌহান), গুজরাতের চৌলুক্য (শোলাংকি) এবং মালয়ের পরমার (পবার)।

৪ ॥ রাষ্ট্রকূটগণ

দন্তিদুর্গ : দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূটদের শক্তি গড়ে ওঠার ইঙ্গিত আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দিয়েছি। প্রথম ইন্দ্রের পুত্র দন্তিদুর্গের হাতেই রাষ্ট্রকূটেরা দক্ষিণ ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হয়ে ওঠে। দন্তিদুর্গ ৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁর দুটি লিপি থেকে—৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত সমনগড় শাসনাবলী এবং তারিখবিহীন এলোরার দশাবতার গুহালিপি থেকে—জানা যায় যে, তিনি মহী, মহানদী ও রেবার তীরে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং কাঞ্চী, কলিঙ্গ, কোসল, শ্রীশৈল, মালব, লাট ও টঙ্কদের উপর বিজয়লাভ করেছিলেন। অপরাপর সূত্র-সমূহ থেকে অনুমিত হয়েছে দন্তিদুর্গ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সামন্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রভুর হয়েই আরবদের বিরুদ্ধে এবং পল্লব ও দক্ষিণ ভারতের অপরাপর শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর নিজ দায়িত্বেই তিনি নন্দিপুরীর গুর্জরদের পরাজিত করে সেখানে নিজের ভাইপো কর্ককে শাসক নিযুক্ত করেন। এছাড়া তিনি মালবে অভিযান করে উজ্জয়িনী দখল করেন এবং আনুমানিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি দক্ষিণ গুজরাত এবং মধ্যপ্রদেশের মালিক হয়ে বসেন। তাঁর এতটা বাড়াবাড়ি তাঁর চালুক্য প্রভু দ্বিতীয় কীর্তিবর্মা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে আক্রমণ করে বসেন, কিন্তু দন্তিদুর্গ তাঁকে পরাস্ত করে প্রায় সমগ্র মহারাষ্ট্রকেই কুক্ষিগত করেন। এটা ঘটেছিল ৭৫৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ।

প্রথম কৃষ্ণ : ৭৫৮ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে দন্তিদুর্গের মৃত্যু ঘটলে তাঁর কাকা প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে বসেন। দন্তিদুর্গ কর্তৃক পরাজিত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মা কর্ণাটক অঞ্চলে শক্তিসঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু প্রথম কৃষ্ণ তাঁকে

শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যার ফলে চালুক্যশক্তি ৭৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই অবলুপ্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি মহীশূরের গঙ্গদের হারিয়ে দিয়ে তাঁদের রাজধানী মান্নপুর জয় করে নেন। পুত্র গোবিন্দকে পাঠান বেঙ্গীর চালুক্যদের বিরুদ্ধে এবং সেখানেও রাষ্ট্রকূটরা জয়ী হয়, যার ফলে মহীশূরের অনেকটা অংশই তাদের অধিকারে আসে। তিনি রাহপ্প নামে এক রাজাকেও পরাজিত করেন, যাঁর পরিচয় আমরা জানি না। কোংকন প্রদেশেও তিনি অধিকার বিস্তৃত করেন, এবং সেখানকার শাসক নিযুক্ত হন সণফুল্ল যাঁর থেকে শীলাহার বংশের উদ্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় গোবিন্দ ও ধ্রুবঃ ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম কৃষ্ণের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ রাজা হন। তিনি বিলাসী ও অকর্মণ্য হওয়ায় শাসন-ক্ষমতা চলে যায় তাঁর ছোট ভাই ধ্রুবের হাতে যিনি সুযোগ বুঝে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সিংহাসন দখল করে নেন। দ্বিতীয় গোবিন্দ কাঞ্চী, গঙ্গবাড়ি, বেঙ্গী ও মালবের সামন্ত রাজাদের সাহায্যে সিংহাসন বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে-ছিলেন। ধ্রুব ক্ষমতা পেয়ে তাঁর দাদার সাহায্যকারী শক্তিগুলিকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গঙ্গরাজ শ্রীপুরুষ মুত্তরসকে পরাজিত করে তাঁর পুত্র শিবমারকে তিনি বন্দী করেন এবং গঙ্গবাড়িকে নিজ রাজ্যের অঙ্গীভূত করে নেন। তারপর তিনি পল্লবরাজ দন্তিবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু দন্তিবর্মা বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর দেখাদেখি বেঙ্গীর শাসক চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধনও ধ্রুবের বশ্যতা স্বীকার করেন।

অতঃপর ধ্রুব উত্তর ভারতে অভিযান করেন যেখানে কনৌজের অধিকার নিয়ে পালরাজ ধর্মপাল ও প্রতীহাররাজ বৎসরাজ যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৎসরাজ জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু ধ্রুবের বাহিনী বৎসরাজকে বিজয়ের ফল ভোগ করতে দেয়নি। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে ধ্রুব বৎসরাজকে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যে বৎসরাজ রাজস্থানের মরুভূমিতে পলায়ন করতে বাধ্য হন। এরপর ধর্মপাল তাঁকে বাধা দিতে আসেন কিন্তু পরাজিত হয়ে তিনি শ্বেতচ্ছত্র ফেলে দিয়ে রণস্থল ত্যাগ করেন। ধর্মপাল অবশ্য বুদ্ধিমানের মত ধ্রুবের অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে উত্তরভারতে নিজ প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ করে নেন। কিছুকাল গঙ্গাতীরে বাস ও পুণ্যার্জন করে ধ্রুব লুণ্ঠিত ও উপঢৌকন-প্রাপ্ত প্রভূত সম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। ৭৯৩ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে ধ্রুবের মৃত্যু হয়।

তৃতীয় গোবিন্দ : ধ্রুব তাঁর তৃতীয় পুত্র গোবিন্দকে উপযুক্ত বিবেচনা করে পরবর্তী রাজা মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু গোবিন্দের বড় ভাই স্তম্ভ বা কম্ভ তা মেনে না নিয়ে কয়েকজন সামন্তের সাহায্যে বিদ্রোহ করেন। গোবিন্দ এই বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু স্তম্ভের সঙ্গে তিনি উদার ব্যবহার করেন। তাঁকে তিনি গঙ্গরাজ্যে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তৃতীয় গোবিন্দ ৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন।

স্তম্ভের বিদ্রোহের কিছু আগে গোবিন্দ বন্দী গঙ্গ রাজকুমার শিবমারকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু শিবমার স্তম্ভকেই সাহায্য করেছিলেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে গোবিন্দ গঙ্গবাড়ি আক্রমণ করেন এবং শিবমারকে পুনরায় বন্দী করেন। এরপর তিনি পল্লবরাজ দন্তিদুর্গকেও তাঁর অধীনতা মানতে বলপূর্বক বাধ্য করেন। এইভাবে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই গোবিন্দ সারা দক্ষিণাপথে একচ্ছত্র প্রাধান্য অর্জন করেন। অতঃপর তিনি উত্তরাপথ অভিযানে প্রবৃত্ত হন।

উত্তরাপথে তখন প্রতীহার বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট কনৌজের সিংহাসন থেকে ধর্মপালের মনোনীত ব্যক্তি চক্রায়ুধকে উচ্ছেদ করে নিজেদের লোক ইন্দ্রায়ুধকে বসিয়েছেন, এবং ধর্মপালকে মুঙ্গেরের নিকটবর্তী স্থানে পরাজিত করেছেন। ভূপাল ও ঝাঁসির মধ্য দিয়ে গোবিন্দ তাঁর বাহিনী নিয়ে নাগভটের সম্মুখীন হন, এবং বুন্দেলখণ্ডের নিকটবর্তী স্থানে নাগভটকে শোচনীয়-ভাবে পরাজিত করেন। পরাজিত নাগভট রাজস্থানে পালিয়ে যান। ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ যুদ্ধ না করেই গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর পুত্রের সন্‌জান-শাসনাবলী থেকে জানা যায় যে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ বশ্যতা স্বীকার করার পর গোবিন্দ নর্মদার তীর ধরে ফিরে আসেন। পথে তিনি মালব জয় করেন এবং কোসল, কলিঙ্গ, বঙ্গ (বেঙ্গী ?) ডাহল এবং ওড্রক রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। গোবিন্দের উত্তরভারত অভিযানের কাল সম্ভবত ৮০০ খৃষ্টাব্দ।

বেঙ্গীর রাজা চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধন, যিনি সম্পর্কে গোবিন্দের মাতুল ছিলেন, ৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য গোবিন্দের অধীনতা অস্বীকার করেন। গোবিন্দ তাঁকে পরাজিত করে তাঁর ভাই ভীম সলুক্কিকে বেঙ্গীর সিংহাসনে বসান। এটা ঘটেছিল ৮০২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ।

গোবিন্দের উত্তর ভারত অভিযানকালীন অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দক্ষিণের পল্লব, পাণ্ড্য, কেরল এবং গঙ্গরা একজোট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান

ঘটিয়েছিল। কিন্তু গোবিন্দ ৮০২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাদের সহজেই পরাস্ত করেছিলেন এবং কাঞ্চী দখল করেছিলেন। গোবিন্দের শক্তির নিদর্শন দেখে সিংহল-রাজ তাঁর আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। নিঃসন্দেহে গোবিন্দ ছিলেন রাষ্ট্রকূটদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে শক্তিমান রাজা।

অমোঘবর্ষঃ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শর্ব বা অমোঘবর্ষ ৮১৪ খৃষ্টাব্দে নাবালক অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর অভিভাবক ছিলেন গুজরাতের রাষ্ট্রকূট শাসক কর্ক, যিনি সম্পর্কে তাঁর পিতৃব্য ছিলেন। অমোঘবর্ষের নাবালকত্বের সুযোগে রাষ্ট্রকূটদের বহু সামন্ত বিদ্রোহী হয়। বেঙ্গীর শাসক দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য, যিনি গোবিন্দ কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিলেন, তাঁর হারানো ক্ষমতা পুনর্দখল করেন। কিন্তু কর্কের প্রচেষ্টায় অবস্থা আয়ত্তে আসে, এবং৮২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিপদ-মুক্ত হন। ৮৩০ খৃষ্টাব্দে অমোঘবর্ষ বেঙ্গীর দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যকে পরাজিত করেন। গঙ্গদের সঙ্গেও অমোঘবর্ষের দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলে, এবং পরিশেষে অমোঘবর্ষের কন্যার সঙ্গে ভূতগ নামক জনৈক গঙ্গ রাজপুত্রের বিবাহ মারফৎ উভয় তরফের মধ্যে সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিরুর লেখমালা অনুযায়ী অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব এবং বেঙ্গীর রাজারা অমোঘবর্ষের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। বেঙ্গীর বিষয়টি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ বলতে পালদের বোঝায়, কিন্তু পালদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের কোন যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না। দেবপালের লিপিতে তিনি জনৈক দ্রবিড় রাজাকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন এই দ্রবিড় রাজা অমোঘবর্ষই। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে তা নাও হতে পারে। মালব নিয়ে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে প্রতীহারদের দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলেছে, কিন্তু পাকাপাকিভাবে কোন শক্তিই সেখানে জেঁকে বসতে পারেনি।

অমোঘবর্ষ মান্যখেট নামক স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। মান্যখেট হচ্ছে বর্তমান মালখেদ, শোলাপুরের ৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে যা অবস্থিত।

তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে কয়েকটি বিদ্রোহ হয়েছিল যেগুলির মধ্যে একটিতে তাঁর পুত্র কৃষ্ণ জড়িত ছিলেন। কিন্তু সেনাপতি বংকেয়-র তৎপরতায় বিদ্রোহসমূহ দমিত হয়। অমোঘবর্ষের নাবালক-অবস্থালীন অভিভাবক কর্ক ছিলেন গুজরাতের শাসক। ৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম ধ্রুব

গুজরাতের শাসক হন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে অমোঘবর্ষের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। অমোঘবর্ষের সঙ্গে যুদ্ধে ৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ধ্রুব নিহত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র অকালবর্ষ। অকালবর্ষের পুত্র দ্বিতীয় ধ্রুবের আমলে উভয় পরিবারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অমোঘবর্ষ বিদ্রোহ দমন ভিন্ন কোন আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হননি। জীবনের শেষ আঠারো বছর তিনি ধর্মকর্ম নিয়েই থাকতেন। তিনি নিষ্ঠাবান জৈন ছিলেন। লেখক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। কন্নড় ভাষায় কাব্যতত্ত্বের উপর লিখিত তাঁর গ্রন্থ কবিরাজমার্গ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় কৃষ্ণ : ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অমোঘবর্ষের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতীহার ও পূর্বী-চালুক্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। প্রতীহারাজ ভোজ ছিলেন এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিপক্ষ। রাষ্ট্রকূটদের লাট বা গুজরাত শাখার লেখমালাসমূহ থেকে জানা যায় যে প্রতীহারদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে দ্বিতীয় কৃষ্ণের সামিল হয়েছিল, এবং তাদের শাসক কৃষ্ণরাজ ৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতীহারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধের দ্বারা ভোজের অগ্রগতি হয়ত বন্ধ করা গিয়েছিল।

পূর্বী-চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধেও রাষ্ট্রকূটদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে গিয়েছিল। বেঙ্গীর সিংহাসনে দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক ছিলেন তৃতীয় বিজয়াদিত্য যিনি রাষ্ট্রকূটদের অধীনতাই শুধু অস্বীকার করেননি, তাদের আশ্রিত রাজ্যগুলির উপরও, যেমন দক্ষিণের নোঢ়ম্ব এবং গঙ্গদের উপরে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণ গোড়ার দিকে সুবিধা করতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত বেঙ্গীর শাসককে পরাজিত করেন এবং রাজা ভীমকে, যিনি তৃতীয় বিজয়াদিত্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, বন্দী করেন। পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হলে দ্বিতীয় কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

দ্বিতীয় কৃষ্ণ চোল রাজা প্রথম আদিত্যের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে ছিলেন এবং তার গর্ভে কন্নর নামে একটি পুত্র জন্মায়। আদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পরন্তক চোল সিংহাসনে বসলে দৌহিত্র কন্নরের স্বার্থে তিনি চোলরাজ্য আক্রমণ করেন। বল্লাল নামক স্থানে (উত্তর আর্কট জেলার তিরুবল্লম) অনুষ্ঠিত যুদ্ধে দ্বিতীয় কৃষ্ণ পরাজিত হন।

তৃতীয় ইন্দ্র : ৩৬ বছর রাজত্ব করার পর ৯১৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কৃষ্ণ মারা গেলে তাঁর পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র রাজা হন। দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গ তাঁর

জীবদ্দশাতেই মারা গিয়েছিলেন। তৃতীয় ইন্দ্র সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এবং সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি প্রতীহাররাজ মহীপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ভূপাল, ঝাঁসি ও কাল্পির মধ্য দিয়ে তাঁর বাহিনী যমুনা অতিক্রম করে, এবং কনৌজ দখল করে। মহীপাল পলায়ন করেন, এবং ইন্দ্র তাঁর অধীনস্থ সামন্ত বেমুলবাড়ের দ্বিতীয় নরসিংহকে নির্দেশ দেন যেন তিনি মহীপালকে তাড়া করে বেড়ান।

৯২২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় ইন্দ্র মারা গেলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তাঁর ভাই চতুর্থ গোবিন্দের চক্রান্তে প্রাণ হারান। তাঁর বিধবা স্ত্রী পলায়ন করে বেঙ্গীর শাসক প্রথম অম্মের আশ্রয় নেন। অম্ম যতদিন বেঁচে ছিলেন চতুর্থ গোবিন্দ তাঁর কিছুই করতে পারেননি, কিন্তু ৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটলে বেঙ্গীর সিংহাসন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বাধে তাতে তিনি নাক গলান এবং নিজের মনোনীত ব্যক্তি তাড়পকে সেখানে বসাতে সক্ষম হন।

তৃতীয় অমোঘবর্ষঃ শাসক হিসাবে চতুর্থ গোবিন্দ উচ্ছৃংখল ও অত্যাচারী ছিলেন ফলে তাঁর মন্ত্রীরা এবং সামন্তবর্গ তাঁর খুল্লতাত তৃতীয় অমোঘবর্ষকে রাষ্ট্রকূট সিংহাসন দখল করতে উৎসাহিত করেন, এবং খুব সহজেই অমোঘবর্ষ গোবিন্দকে পরাজিত করে ৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন। তাঁর তিন বছর রাজত্বকালে তাঁর পুত্র তৃতীয় কৃষ্ণই সর্বেসর্বা ছিলেন। কৃষ্ণ গঙ্গবাড়িতে একটি আক্রমণ প্রেরণ করেন এবং সেখানকার রাজা রাজমল্লকে সরিয়ে তাঁর ছোট ভাই নিজ ভগ্নীপতি ভূতুগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যুবরাজ অবস্থায় কৃষ্ণ বুন্দেলখণ্ডে অভিযান চালান এবং কালঞ্জর ও চিত্রকূট জয় করেন।

তৃতীয় কৃষ্ণঃ ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় অমোঘবর্ষের মৃত্যু হলে তৃতীয় কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেই চোল রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁর ভগ্নীপতি গঙ্গবাড়ির শাসক ভূতুগের সহায়তায় তিনি বিদ্যুৎগতিতে কাঞ্চী ও তাঞ্জোর শহরদ্বয় দখল করেন ৯৪৩ খৃষ্টাব্দে। চোল রাজা পরন্তক আক্রমণকারীদের বিতাড়ন করার জন্য প্রবল চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ৯৪৯ খৃষ্টাব্দের তক্কোলমের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং তাঁর পুত্র রাজাদিত্য নিহত হন। অতঃপর কৃষ্ণ রামেশ্বর পর্যন্ত যাত্রা কল্লেন এবং সেখানে একটি জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই যুদ্ধের ফলে তোণ্ডমণ্ডল অঞ্চলটি, অর্থাৎ আর্কট, চিঙ্গলেপুত এবং ভেলোর জেলার অংশবিশেষ কৃষ্ণের অধিকারে আসে। সাহায্যকারী ভূতুগকে তিনি বনবাসী ১২০০০, বেলভোল-৩০০, পুরিগেরে-৩০০, কিনসুকাড়-৭০ এবং বাগেনাড়-৭০

এর শাসক করে দেন। অতঃপর কৃষ্ণ উত্তর ভারতে অভিযান করেন। তিনি মালবেও একটি অভিযান প্রেরণ করেন এবং উজ্জয়িনী দখল করেন। তৃতীয় কৃষ্ণই শেষ পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূট রাজা যিনি ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় ইন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং প্রকৃত অর্থেই যিনি 'সকল-দক্ষিণ-দিগ্-অধিপতি' ছিলেন।

খোট্টিগ এবং দ্বিতীয় কর্ক : ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় কৃষ্ণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর বৃদ্ধ ভাই খোট্টিগ সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথমেই পরমার-রাজ সীয়কের (যাঁর কাছ থেকে তৃতীয় কৃষ্ণ উজ্জয়িনী দখল করেছিলেন) আক্রমণের মুখোমুখি হন। সীয়ক নর্মদা পার হয়ে সোজা মালখেদ আক্রমণ করেন এবং রাজকীয় কোষাগার লুণ্ঠন করেন। এটা ঘটেছিল ৯৭২ খৃষ্টাব্দে এবং এর ফলে ভগ্ন হৃদয়ে খোট্টিগ মারা যান।

অতঃপর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাইপো দ্বিতীয় কর্ক, কিন্তু তাঁর অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রকূটদের চালুক্য বংশীয় জনৈক সামন্ত, বিজাপুরের তরদ্দাবাড়ির শাসক, দ্বিতীয় তৈল ৯৭৩ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। কর্ক কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করেন, এবং মহীশূরের সোরব তালুকে একটি ছোট রাজ্যের পত্তন করেন। রাষ্ট্রকূট প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার আশা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু গঙ্গরাজা মারসিংহ তাঁর রাষ্ট্রকূটবংশীয় ভাগ্নে ইন্দ্রের জন্য সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে তৈলের হাতে পরাজিত হন। মারসিংহ এবং ইন্দ্র অতঃপর জৈন সন্ন্যাসী হয়ে যান, আর ৯৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈল দক্ষিণাপথের একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হন।

৫ ॥ পূর্ব ভারত (৮০০-১০০০ খৃঃ)

নেপাল : দ্বিতীয় জয়দেবের পরবর্তী নেপালের দুশো বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস কার্যত আমাদের অজ্ঞাত। তিব্বতী সূত্র অনুযায়ী অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নবম শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নেপাল তিব্বতের রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে ছিল। বিভিন্ন সূত্র থেকে রাঘবদেব নামক একজন রাজার নাম পাওয়া গেছে যিনি আনুমানিক ৮৭৯-৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর তিনজন উত্তরাধিকারী অতঃপর কুড়ি বছর নাগাদ রাজত্ব করেন, এবং তারপর সিংহাসনে বসেন প্রথম গুণকামদেব, যিনি আনুমানিক

১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, এবং তাঁর নির্মিত কাঠমাণ্ডু শহরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী একজন সাড়ে পাঁচ বছর রাজত্ব করেন; এবং তারপর রাজা হন নির্ভয় যিনি রুদ্র নামক আর একজনের সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজত্ব করেছিলেন, এবং তঁাদের জানা তারিখ ১০০৭ খৃষ্টাব্দ। এঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

কামরূপঃ আসাম সম্পর্কেও আমাদের তথ্য খুব কম। ৮০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন, তঁাদের মধ্যে সালস্ত ও তঁার পুত্র হর্জরবর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তজন পালদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তঁার পুত্র বনমালবর্মার একটি লিপিতে ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদীর পশ্চিমাঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায় যা থেকে অনুমিত হয় যে উত্তর-বঙ্গের কিয়দংশও কামরূপের প্রভাবাধীন ছিল। বনমালের পরবর্তী রাজারা ছিলেন জয়মাল ও বলবর্মা। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন ত্যাগসিংহ, যিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে প্রজারা তঁার আত্মীয় ব্রহ্মপালকে সিংহাসনে বসান।

উড়িষ্যাঃ শৈলোদ্ভবরা অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে রাজত্ব করে-ছিলেন তা আমরা আগেই দেখেছি। পরবর্তী আড়াই শো বছরে উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রাজবংশের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু এই বংশগুলির সাল, তারিখ, রাজাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শাসিত এলাকাগুলি সম্পর্কে খুব কম কথাই জানা যায়।

এই রাজবংশগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ভৌম-কর বা করবংশ যারা বালাসোর, কটক এবং পুরী জেলায় রাজত্ব করত, যাদের রাজত্বকাল মোটামুটি ৮০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফেলা যায়। এই বংশের সতেরটি লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি থেকে কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়ঃ ক্ষেমংকর প্রথম শিবকর, প্রথম শুভাকর, দ্বিতীয় শিবকর, প্রথম শান্তিকর, দ্বিতীয় শুভাকর, তৃতীয় শুভাকর, দ্বিতীয় শান্তিকর, চতুর্থ শুভাকর, তৃতীয় শিবকর, তৃতীয় শান্তিকর, পঞ্চম শুভাকর, দণ্ডী মহাদেবী।

কয়েকটি ভঞ্জবংশ, যাদের তিরিশটির বেশি লেখমালা পাওয়া গেছে, উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করেছিল। এদের দুটি শাখার মোটামুটি খবরাখবর পাওয়া গেছে। একটি শাখা রাজত্ব করত খিঞ্জলিতে (বৌধ, সোনপুর ও গঞ্জামের একাংশ) অপরটি খিজিঙ্গে (ময়ুরভঞ্জের খিচিং)। খিঞ্জলির

ভঞ্জবংশের দশজন রাজার নাম যথাক্রমে যথাসুখ, মল্লগম্ভীর, প্রথম শিলাভঞ্জ, শত্রুভঞ্জ, রণভঞ্জ, প্রথম নেট্টভঞ্জ দিগভঞ্জ, দ্বিতীয় শিলাভঞ্জ, বিদ্যাধর ভঞ্জ এবং দ্বিতীয় নেট্টভঞ্জ। খিজিঙ্গের ভঞ্জবংশের রাজারা হচ্ছেন বীরভদ্র, কোট্টভঞ্জ, দিকভঞ্জ, তাঁর দুই পুত্র রণভঞ্জ ও নরেন্দ্রভঞ্জ, রণভঞ্জের পুত্র রাজভঞ্জ, বিভ্রমতুঙ্গ ও শত্রুভঞ্জ, বিভ্রমতুঙ্গের পুত্র দুর্জয়ভঞ্জ ও পৌত্র কোট্টভঞ্জ, শত্রুভঞ্জের পুত্র দ্বিতীয় নরেন্দ্রভঞ্জ।

কর ও ভঞ্জবংশ ছাড়া আরও চারটি বংশের সন্ধান পাওয়া যায়—তুঙ্গবংশ, ময়ুরবংশ শূল্কিবংশ ও নন্দবংশ। তুঙ্গবংশের দুজনকার নাম পাওয়া গেছে সলাণতুঙ্গ ও গয়াড়তুঙ্গ। এঁরা আগে সম্ভবত করদের সামন্ত ছিলেন। এঁদের এলাকাকে বলা হয়েছে যমগর্ত মণ্ডল। মোটামুটি তালচের, পাল লহর ও কেওনঝরের অংশবিশেষে এঁদের প্রাধান্য ছিল। ময়ূরবংশ রাজত্ব করত বণাই-মণ্ডলে, অর্থাৎ বর্তমান বোনাই অঞ্চলে যেখান থেকে তাদের লিপি পাওয়া গেছে। শূল্কিরা তালচের ও ঢেনকানলের অংশ বিশেষে রাজত্ব করত।

দশম শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ দক্ষিণ কোসলের সোমবংশীরা উড়িষ্যা জয় করে নেয়।

৬॥ মধ্য ও পশ্চিম ভারত (৮০০-১০০০ খৃঃ)

বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লগণ ঃ প্রতীহার সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর চন্দেল্লরা বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে রাজত্ব গড়ে তোলে নবম শতকের প্রথম দিকে। এরা খর্জুর-বাহকের (খজুরাহ) চন্দেল্ল নামে পরিচিত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নন্নুক। পরবর্তী রাজারা ছিলেন বাক্‌পতি, জয়শক্তি, বিন্ধ্যশক্তি, রাহিল, হর্ষ, যশোবর্মা, ধঙ্গ এবং গণ্ড। এঁরা আগে প্রতীহারদের সামন্ত ছিলেন। ষষ্ঠ রাজা হর্ষ (৯০০-৯২৫ খৃঃ) প্রতীহাররাজ মহীপালকে কনৌজ জয় করতে সাহায্য করেছিলেন। সপ্তম রাজা যশোবর্মা প্রতীহারদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কালঞ্জর দখল করেন এবং যমুনাতীর পর্যন্ত রাজ্য প্রসারিত করেন। তিনি কলচুরিদের ও পরমারদের সঙ্গেও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ সীমা চেদি ও মালবের উপকণ্ঠ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তিনি দক্ষিণ কোসলের সোমবংশীদেরও পরাস্ত করেছিলেন। তাঁর পুত্র ধঙ্গ পিতার রাজত্ব বহুলাংশে বজায় রেখেছিলেন। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যদিও তিনি প্রতীহারদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, তথাপি তাদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি উত্তর প্রদেশের

কিছু অঞ্চল জয় করেন। কাশীতে তিনি একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখান থেকে তিনি পালদের অধিকৃত অঙ্গ বা ভাগলপুর আক্রমণ করেন এবং তা দখল করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রতীহারদের আনুগত্য অস্বীকার করেন। ফিরিস্তার বিবরণ থেকে জানা যায় পাঞ্জাবের রাজা জয়পাল সবুক্তগীনের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যে সব ভারতীয় রাজাদের সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ধঙ্গ অন্যতম। স্বাধীনভাবে ধঙ্গ রাজত্ব করেছিলেন ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ১০০২ পর্যন্ত। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র গণ্ড।

ত্রিপুরীর কলচুরিগণ: ত্রিপুরী মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। কলচুরি বংশীয় যে রাজারা এখানে ৮০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন কোক্কল, শংকরগণ, বালহর্ষ, প্রথম যুবরাজ, লক্ষণরাজ, দ্বিতীয় শংকরগণ, দ্বিতীয় যুবরাজ ও দ্বিতীয় কোক্কল। কনৌজের প্রতীহার ও তাদের সামন্তদের পরাজিত করে প্রথম কোক্কল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তারপর একটি পরিকল্পিত দিগ্বিজয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করে পশ্চিমে সিন্ধুর আরবদের পরাজিত করেন, এবং পূর্বেও বঙ্গদেশ পর্যন্ত অভিযান চালান। এছাড়া উত্তর কোংকনে রাষ্ট্রকূটদের সামন্তশক্তির উপরেও তিনি আক্রমণ চালান। কোক্কল রাজত্ব করেছিলেন আনুমানিক ৮৪৫ থেকে ৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শংকরগণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। শংকরগণ দক্ষিণ কোসলের সোমবংশীদের পরাজিত করে তাদের কাছ থেকে পালি নামক একটি অঞ্চল অধিকার করেন! কিন্তু পূর্বী-চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি এবং তাঁর রাষ্ট্রকূট মিত্রপক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পরবর্তী রাজা বালহর্ষ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তবে তাঁর ভাই প্রথম যুবরাজ গৌড় ও কলিঙ্গের রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু চন্দেল্লরাজ যশোবর্মার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি সুবিধা করতে পারেননি, এবং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের হাতেও তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং রাষ্ট্রকূটদের সাময়িক অধীনতা স্বীকার করেন। পরে অবশ্য শক্তি সঞ্চয় করে তিনি স্বাধীন হন। পরবর্তী রাজা লক্ষ্মণরাজও সামরিক শক্তির উপর আস্থাশীল ছিলেন। তিনি বঙ্গাল বা পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেন এবং চন্দ্রবংশীয় রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে পরাজিত করেন। কোসলের মৌর্যবংশী রাজা মহাভবগুপ্তও তাঁর হাতে পরাজিত হন। অতঃপর তিনি পশ্চিমাঞ্চলে মনোযোগ দেন, লাটের রাষ্ট্রকূটদের সামন্তকে পরাজিত করেন এবং উত্তর গুজরাতের চৌলুক্যদেরও পরাজিত করেন। লক্ষ্মণরাজের

উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শংকরগণ এবং তারপর শংকরগণের ভাই দ্বিতীয় যুবরাজ, যিনি দশম শতকের শেষ দিকে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি চালুক্য দ্বিতীয় তৈল এবং মালবের পরমার রাজা মুঞ্জের নিকট পরাজিত হন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কোক্কল গুর্জরদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে অভিযান চালিয়ে বংশগৌরব অনেকটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সরযুপারের কলচুরিগণ ঃ কলচুরিদের আর একটি শাখা রাজত্ব করত সরযুপারে, বর্তমান গোগরা নদীর তীরে। এই বংশের প্রথম রাজার নাম রাজপুত্র যিনি অষ্টম শতকের শেষের দিকে আবিভূত হয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন শিবরাজ ও শংকরগণ। শেষোক্তজন নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বড়-কলচুরিরাজ প্রথম কোক্কলের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী রাজা প্রথম গুণসাগর প্রতীহার ভোজকে পালরাজ্য আক্রমণকালে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই কলচুরিরা গোরখপুর অঞ্চলেও অধিকার বিস্তৃত করে যেখানে পূর্বে মলয়কেতু বংশ রাজত্ব করত, এবং যে বংশের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গেছে—জয়াদিত্য, ধর্মাদিত্য ও দ্বিতীয় জয়াদিত্য। গুণসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র উল্লভ এবং ভামানদেব যথাক্রমে রাজত্ব করেন। শেষোক্তজন প্রতীহার প্রথম মহীপালকে পরমারদের কাছ থেকে মালব উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। এই বংশের পরবর্তী রাজারা ছিলেন দ্বিতীয় শংকরগণ, দ্বিতীয় গুণসাগর, দ্বিতীয় শিবরাজ, তৃতীয় শংকরগণ ও ভীম। শেষোক্তজন একাদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে একটি গৃহযুদ্ধ হয় এবং দ্বিতীয় গুণসাগরের পুত্র ব্যাস ১০৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন। ব্যাসের পুত্র সোঢ়দেব ১০৭৯ সালেও রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্ব গোগরা থেকে গণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী সংবাদ জানা যায় না।

পরমারগণ ঃ পরমারদের এলাকা ছিল মালব অঞ্চল, এবং তাদের প্রধান রাজধানী ছিল ধারা, বর্তমান ধার। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উপেন্দ্র যিনি নবম শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উপেন্দ্রের দুই পুত্র বৈরিসিংহ এবং ডম্বরসিংহ, শেষোক্তজন বাগড় নামক স্থানে (বনসওয়ারা ও ডুঙ্গরপুর অঞ্চল) মূল বংশের সামন্ত হিসাবে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর বংশ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। বৈরিসিংহের উত্তরাধিকারী ছিলেন যথাক্রমে সীয়ক ও বাক্‌পতি এবং এঁরা তিনজনেই রাষ্ট্রকূট অমোঘবর্ষের সমকালীন

এবং তাঁর অধীনস্থ সামন্ত ছিলেন। বাক্‌পতির পুত্র দ্বিতীয় বৈরিসিংহের সময়ে, যিনি বজ্রট নামেও পরিচিত ছিলেন, মালব প্রতীহারদের পদানত হয়। পরে অবশ্য রাষ্ট্রকূটেরা প্রতীহারদের মালব থেকে উৎখাত করে এবং দ্বিতীয় বৈরিসিংহ পুনরায় সামন্ত পদে আসীন হন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় সীয়ক রাষ্ট্রকূট তৃতীয় কৃষ্ণের সামন্ত ছিলেন, এবং প্রতীহারদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাবরমতী পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তৃত করেন। উত্তরপূর্বেও তাঁর অগ্রসর হবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু চন্দেল্ল যশোবর্মার হাতে তিনি পরাস্ত হন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে দ্বিতীয় সীয়ক রাষ্ট্রকূটদের অধীনতা অস্বীকার করেন, এবং রাষ্ট্রকূটদের রাজধানী মালখেদে হানা দিয়ে রাষ্ট্রকূটরাজ খোট্টিগকে পরাস্ত করেন। দ্বিতীয় সীয়কের দুই পুত্র, মুঞ্জ এবং সিন্ধুরাজ। ৯৭২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে মুঞ্জ পূর্বদিকে কলচুরিবংশীয় দ্বিতীয় যুবরাজকে পরাজিত করেন এবং ত্রিপুরী লুণ্ঠন করেন। তাঁর দ্বিতীয় আক্রমণ ছিল মেদপাটের গুহিলদের বিরুদ্ধে, এবং এই সূত্রে তিনি রাজস্থানের বহু এলাকা জয় করেন। পশ্চিমে লাটের রাজা বারপ্প, যিনি চালুক্য দ্বিতীয় তৈলের সামন্ত ছিলেন, তাঁর আক্রমণের শিকার হন। তিনি শুধু বারপ্পকেই পরাজিত করেননি, ছবার তৈলের আক্রমণও প্রতিহত করেছিলেন। মুঞ্জ তৈলকে ধ্বংস করার জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন এবং ভ্রান্ত রণনীতির জন্য তিনি তৈলের হাতে বন্দী ও নিহত হন। এটা ঘটেছিল ৯৯৩ থেকে ৯৯৮ এর মধ্যে। এর ফলে পরমারদের অনেকখানি এলাকা হস্তচ্যুত হয়। পরবর্তী রাজা মুঞ্জের ভাই সিন্ধুরাজ চালুক্য সত্যাশ্রয়কে পরাজিত করেন এবং হৃত এলাকার কিছুটা উদ্ধার করেন। এছাড়া তিনি দক্ষিণ কোসলের সোমবংশীদের এবং লাট ও অণহিল পাটকের চৌলুক্যদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করেন। আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে ভোজ পরমার রাজ্যের রাজা হন।

গুজরাত ও কাথিয়াবাড়ের ক্ষুদ্র রাজবংশসমূহ ঃ পশ্চিম সৌরাষ্ট্রে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে সৈন্ধবগণ রাজত্ব করত যাদের রাজধানী ছিল পোরবন্দরের পঁচিশ মাইল উত্তর পূর্বে ভূমিলি নামক স্থানে। এই বংশের পুষ্যদেবের রাজত্বকালে ৭৩৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আরব আক্রমণ হয়েছিল। পরবর্তী রাজারা ছিলেন কৃষ্ণরাজ ও মহাসামন্ত অগ্‌গুক। এঁদের সময়ে (৭৫৬-৭৭৬ খৃঃ) জলপথে কয়েকবার আরব আক্রমণ ঘটেছিল, কিন্তু এই দুই রাজা সাফল্যের সঙ্গেই তা প্রতিহত করেন। অগ্‌গুকের পরবর্তী রাজা রাণকের সময় প্রতীহার দ্বিতীয় নাগভট সৈন্ধবদের উপর বিজয়লাভ করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজের

সময়ে বর্ধমানের চাপদের সঙ্গে সৈন্ধবদের যুদ্ধ হয় যাতে চাপগণ পরাজিত হয়। কম বয়সে কৃষ্ণরাজের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই জাইক তাঁর নাবালক পুত্র দ্বিতীয় অগ্‌গুকের হয়ে শাসন শুরু করেন, এবং পরে নিজেই রাজা হয়ে বসেন এবং আরও একবার চাপদের পরাস্ত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন যথাক্রমে তাঁর দুই পুত্র চামুণ্ডরাজ ও তৃতীয় অগ্‌গুক। শেষোক্তের পুত্র দ্বিতীয় রণকের সঙ্গে প্রথমোক্তের পুত্র চতুর্থ অগ্‌গুকের সংঘর্ষ হয় সিংহাসন নিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত চতুর্থ অগ্‌গুকই জয়ী হন যাঁর জানা তারিখ ৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় জাইকই (৯০৪-১৫) এই বংশের শেষ রাজা, যাঁর উত্তরাধিকারীরা আভীরদের হাতে উৎখাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

একটি চালুক্যবংশ ৮০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জুনাগড় অঞ্চলে রাজত্ব করত যাদের নিম্নলিখিত রাজাদের নাম পাওয়া যায়ঃ কল্ল, মহল্ল, বাহুকধবল, অবনীবর্মা, বলবর্মা, দ্বিতীয় অবনীবর্মা। এঁরা বরাবরই প্রতীহারদের সামন্ত ছিলেন। দ্বিতীয় অবনীবর্মা বর্ধমানপুরের চাপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এই চালুক্যবংশও আভীরদের হাতে উৎখাত প্রাপ্ত হয়।

গ্রহরিপু নামক জনৈক আভীর নেতা সৌরাষ্ট্রের সৈন্ধব ও চালুক্যদের উৎখাত করে দশম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বামনস্থলী, জুনাগড়ের নিকটবর্তী বর্তমান বনথলি। কিন্তু অনহিল পাঠকের চৌলুক্য মূলরাজের আক্রমণে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন।

অষ্টম শতকের তৃতীয় পাদে মহাবরাহ নামক একজন রাজা সৌরাষ্ট্রের কোন স্থানে রাজত্ব করতেন যিনি দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যার ফলাফল আমাদের অজ্ঞাত। জয়বরাহ নামক তাঁর এক উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বরাহ বংশ সম্পর্কে আমাদের আর কিছু জানা নেই।

চাপদের কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। তাদের দুটি-শাখা— একটি রাজত্ব করত বর্ধমানপুরে অপরটি অণহিলপাটকে। বর্ধমানপুর (বর্তমান বাধবান অঞ্চল) শাখার প্রথম রাজা বিক্রমার্ক, যিনি নবম শতকের প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, প্রতীহার দ্বিতীয় নাগভটের আক্রমণ সহ্য করেন এবং তারপর এই বংশ প্রতীহারদেরই সামন্তবংশে পরিণত হয়। পরবর্তী রাজারা ছিলেন অড্‌ডক, পুলকেশী, ধ্রুবভট (যিনি সৈন্ধবদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে-

ছিলেন) এবং ধরণীবরাহ। শেষোক্তের রাজত্বকালে চৌলুক্য মূলরাজ তাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

অণহিল পাটকের (উত্তর গুজরাতের অন্তর্গত বর্তমান পাতন) চাপ রাজারা ছিলেন যথাক্রমে বনরাজ, যোগরাজ, রত্নাদিত্য, ক্ষেমরাজ, অকাড়দেব ও ভূয়ড়দেব। এই বংশও চৌলুক্য মূলরাজের হাতে উৎখাত প্রাপ্ত হয় ৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে।

চৌলুক্যগণ: দশম শতকে চৌলুক্যবংশীয় মূলরাজ অণহিল পাটকে রাজধানী স্থাপন করে সরস্বতীমণ্ডলে অর্থাৎ সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং তার বিস্তৃতি ঘটানোর জন্য সৌরাষ্ট্র অঞ্চলকে বেছে নেন এবং চাপ ও আভীরদের পরাজিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে চাহমানদের এবং লাটের বারপ্পের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। চাহমানদের রাজা বিগ্রহরাজের সঙ্গে তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর পুত্র চামুণ্ডরাজ বারপ্পকে সোজাসুজি পরাজিত ও নিহত করেন। মূলরাজের রাজ্যের উত্তরসীমা ছিল যোধপুরের মানচোর এবং পূর্বে ও দক্ষিণে সাবরমতী নদী। লেখমালা সমূহের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁর রাজ্যকাল মোটামুটি ৯৪২ থেকে ৯৯৪ এর মধ্যে ধরা হয়েছে। পরবর্তী রাজা, মূলরাজের পুত্র চামুণ্ডরাজ, পরমার সিন্ধুরাজের আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করেন। কিন্তু তিনি কলচুরি দ্বিতীয় কোক্কলের নিকট পরাজিত হন। তাঁর রাজত্ব শেষ হয় ১০০৮ খৃষ্টাব্দে। এর পর তাঁর দুই পুত্র বল্লভরাজ এবং দুর্লভরাজ যথাক্রমে রাজা হন।

চৌলুক্যদের আর একটি বংশ বারপ্পের নেতৃত্বে লাট অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। এই বারপ্প ছিলেন চালুক্য দ্বিতীয় তৈলের একজন সেনাপতি। তিনি শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। প্রথমেই তাঁকে পরমার মুঞ্জের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরে তিনি চৌলুক্য মূলরাজকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর পুত্র চামুণ্ডরাজের হাতে নিহত হন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র গোঙ্গিরাজ যিনি তাঁর রাজত্বের হারানো এলাকাগুলি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন। বারপ্প ও তাঁর পুত্র উভয়েই দশম শতকের লোক ছিলেন।

চাহমানগণ: চাহমানদের কয়েকটি শাখার মধ্যে একটি রাজ্য স্থাপন করেছিল শাকম্ভরী অঞ্চলে, অর্থাৎ জয়পুরের সম্ভর অঞ্চলে। এই বংশের দুর্লভ-রাজ ও তাঁর পুত্র গোবিন্দরাজ বা প্রথম গূবক প্রতীহারদের সামন্ত হিসাবে

বৎসরাজ ও দ্বিতীয় নাগভটের যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্ররাজ, দ্বিতীয় গুবক, চন্দন, বাক্‌পতিরাজ, সিংহরাজ, দ্বিতীয় বিগ্রহরাজ ও দুর্লভরাজ। সিংহরাজ নিজেকে প্রতীহারদের অধীনতা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেন, এবং তাঁর পুত্র বিগ্রহরাজ গুজরাত আক্রমণ করে চৌলুক্য মূলরাজকে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। বিগ্রহরাজের জানা তারিখ ৯৭৪ খৃষ্টাব্দ। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর ভাই, যাঁর জানা তারিখ ৯৯৯ খৃষ্টাব্দ, পশ্চিমের যোধপুরের পর্বতসর, দক্ষিণে আজমীরের নিকটবর্তী পুষ্কর, পূর্বে জয়পুর এবং উত্তরে শিকর পর্যন্ত এলকার অধিকারী ছিলেন।

চাহমানদের আর একটি শাখা নড্‌ডুলে (যোধপুরের অন্তর্গত বর্তমান নাদোল) একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এখানকার রাজারা ছিলেন যথাক্রমে লক্ষ্মণ, শোভিত, বলিরাজ, মহেন্দ্র ও অশ্বপাল। চাহমানদের একটি তৃতীয় শাখা রাজত্ব করেছিল নবম শতকে ধবলপুরীতে (বর্তমান ধোলপুর) যাদের তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায় : ঈশুক, মহিষরাম ও চণ্ডমহাসেন। চতুর্থ আর একটি শাখা নবম-দশম শতকে রাজত্ব করত পরতাবগড়ে যাদেরও তিনজন রাজার নাম পাওয়া গেছে : গোবিন্দরাজ, দুর্লভরাজ এবং মহাসামন্ত ইন্দ্ররাজ। এই সব কটি চাহমানবংশই প্রতীহারদের সামন্ত ছিল।

গুহিলগণ : অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে গুহিলদের দুটি শাখার সংবাদ পাওয়া যায়। মূল শাখাটি রাজত্ব করত মেদপাট বা মেবারে, দ্বিতীয় শাখাটির রাজধানী ছিল ধবগর্তা, অর্থাৎ উদয়পুরের জহাজপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান ধোড়। আমরা আগে দেখেছি যে মেবারের গুহিলদের মধ্যে বপ্প বা বা প্রথম খোম্মাণের রাজত্ব শেষ হয়েছিল ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তী রাজারা ছিলেন মত্তট, ভর্তৃপট্ট ও সিংহ যাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক জানা যায় না। পরবর্তী রাজারা ছিলেন যথাক্রমে পিতাপুত্র যাঁদের নাম : সিংহ, দ্বিতীয় খোম্মাণ, মহাযক, তৃতীয় খোম্মাণ, দ্বিতীয় ভর্তৃপট্ট, অল্লট, নরবাহন, শালিবাহন ও শক্তিকুমার। ধোড়ের গুহিলদের আটজন রাজার নাম পাওয়া গেছে : ধনিক, আউক, কৃষ্ণ, শংকরগণ, হর্ষ, দ্বিতীর গুহিল, ভট্ট ও বালাদিত্য। এঁদের দু'তরফই গোড়ার দিকে প্রতীহারদের অধীনস্থ সামন্ত ছিলেন।

তোমরগণ : তোমরদের রাজ্য ছিল বর্তমান হরিয়ানার কিয়দংশ এবং তাদের রাজধানী ছিল ঢিল্লিকা, বর্তমান দিল্লী। এই তোমর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক জাউল, এবং পরবর্তী রাজারা ছিলেন বজ্রট, জজ্জুক

এবং গোগ্‌গ। বজ্রটের রাজ্যকাল নবম শতকের মাঝামাঝি এবং তোমরদের সকলেই ছিলেন প্রতীহারদের সামন্ত। দশম শতকে তোমরদের সঙ্গে শাকম্ভরীর চাহমানদের যুদ্ধ হয়েছিল বলে সংবাদ আছে। রুদ্রেন নামক গোগ্‌গের এক বংশধর চাহমান চন্দনের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তবে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তোমরদের অস্তিত্ব ছিল, এবং তারপর তারা চাহমান তৃতীয় বিগ্রহরাজের হস্তে উৎখাত প্রাপ্ত হয়।

৭॥ উত্তর-পশ্চিম ভারত (৮০০-১০০০ খৃঃ)

উদভাণ্ডের শাহি বংশ : কাবুল উপত্যকা ও গান্ধারে একটি তুর্কীশাহি বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে। এদের রাজা লগতুর্মানের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কল্লর প্রভুকে উৎখাত করে নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু শাহি বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং রাওলপিণ্ডি জেলার আটকের নিকটে উদভাণ্ড বা উন্দ-এ রাজধানী স্থাপন করেন। এই কল্লর হচ্ছেন কলহন উল্লিখিত লল্লিয় যাঁর এলাকা ছিল তুরস্কদের অঞ্চল (কাবুল উপত্যকা) এবং দর্দদের অঞ্চলের (কাশ্মীরের কিষণগঙ্গা উপত্যকা) মধ্যবর্তী। এছাড়া আশেপাশের সামন্তদের উপরেও তাঁর প্রভাব ছিল। কাশ্মীরের রাজারা কল্লরের এলাকায় মাঝে মাঝে হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি। কল্লরের পুত্র তোরমান বা কমলুকের সময়ে শ্রীসামন্ত নামে ওই শাহিবংশেরই একজন তোরমানকে উচ্ছেদ করে সিংহাসন দখল করেন, কিন্তু কাশ্মীরের মন্ত্রী প্রভাকরের সাহায্যে তোরমান হৃত রাজ্য ফিরে পান। তোরমাণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভীম সিংহাসনে বসেন, যিনি দশম শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করেছিলেন এবং যাঁর মেয়ের মেয়ে ছিলেন কাশ্মীরের রাণী দিদ্দা।

মুসলিম বৃত্তান্তসমূহ অনুযায়ী, বিশেষ করে ফিরিস্তার মতে, পরবর্তী রাজা ছিলেন ইষ্টপালের পুত্র জয়পাল, যাঁর সঙ্গে ভীমের কি রকম সম্পর্ক ছিল জানা যায় না। কলহণ থক্কণ নামক আরও একজন শাহি রাজার নাম করেছেন। জয়পাল দশম শতকের শেষের দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্ব সিরহিন্দ থেকে লমঘন এবং কাশ্মীর সীমান্ত থেকে মূলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জয়পাল ও তাঁর পুত্র আনন্দপালের রাজ্যকালের ইতিহাস গজনীর সুলতানদের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষের ইতিহাস, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

আরবশক্তি ঃ আমরা আগে দেখেছি যে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে আরবেরা কায়ক্লেশে সিন্ধুতে নিজেদের অধিকার বজায় রেখেছিল। তাদের এই দুরবস্থার কারণ ছিল তাদের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা, উম্মীয়বংশের খলিফাদের অযোগ্যতা। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আব্বাসীয় বংশের খিলাফৎ আরবে প্রতিষ্ঠিত হলে, তাদের অবস্থার আবার পরিবর্তন হয়। ৭৬৯ ও ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কাবুলে দুবার আরব আক্রমণ হয়, কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরও প্রায় শতাব্দী পরে ৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইয়াকুব ইব্‌ন লায়থ কাবুল ও জাবুল দখল করেন। কিন্তু কাবুল আবার স্বাধীন হয়ে যায় এবং হিন্দু শাহি রাজত্বের এলাকাভুক্ত হয়।

সিন্ধুর শাসক হিসাম অষ্টম শতকের মাঝামাঝি মূলতান ও কান্দাহার অধিকার করেছিলেন, এবং কাশ্মীরেও কয়েকবার হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য আরবদের হটিয়ে দেন। খলিফা অল্‌মহ্‌দির সময় (৭৭৫-৮৫) ভারতের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ নৌ-অভিযান প্রেরিত হয়। স্থলপথেও কয়েকবার অভিযান চলে। কিন্তু গুর্জর-প্রতীহারদের প্রবল বাধার সামনে আরবশক্তি দাঁড়াতে পারেনি। দ্বিতীয় নাগভট খলিফা হারুণ-অল-রসিদ ও অল মামুনের সমকালীন ছিলেন এবং তিনি 'তুরস্কদের' অর্থাৎ আরবদের ঘাঁটি-সমূহ অধিকার করেছিলেন বলে প্রতীহার সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

নবম শতকের মাঝামাঝি বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর সিন্ধুর আরব শাসকেরা স্বাধীন হয়ে যান, এবং ওই অঞ্চলে দুটি রাজ্য গড়ে ওঠে মনসুরা এবং মূলতান। মনসুরা রাজ্যটি সমুদ্রতীর থেকে উত্তরে আলোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং মূলতান রাজ্যটির এলাকা ছিল উত্তর সিন্ধু উপত্যকা। দুটি রাজ্যের কোনটিই বিশেষ শক্তিশালী ছিল না। মূলতান সর্বদাই প্রতীহারদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। আরবেরা আক্রান্ত হলে তারা মূলতানের বিখ্যাত সূর্যমন্দিরকে ধ্বংস করে দেবে এই কারণেই প্রতীহাররা ওদিকে আক্রমণ চালাতে বিরত থেকেছিল।

কাশ্মীর ঃ কার্কোট বংশীয় রাজা ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র কুবলয়াপীড় ও বজ্রাদিত্য পর পর রাজত্ব করেন। শেষোক্তজন রাজত্ব শুরু করে-ছিলেন আনুমানিক ৭৬২ খৃষ্টাব্দ থেকে, এবং সম্ভবত তাঁর আমলে কাশ্মীরে একটি আরব আক্রমণ হয়েছিল। বজ্রাদিত্যের তিন পুত্র—পৃথিব্যাপীড়, সংগ্রামাপীড় এবং জয়াপীড়। প্রথমজন পিতার মৃত্যুর পর রাজা হবার অত্যল্পকাল

পরেই দ্বিতীয়জন কর্তৃক উৎখাতপ্রাপ্ত, এবং দ্বিতীয়জনও সাত দিনের মধ্যে নিহত হলে কাশ্মীরের সিংহাসন জয়াপীড়ের উপর বর্তায়।

জয়াপীড় রাজা হয়েই পূর্বদিকে একটি অভিযানে বার হন, এবং সেই ফাঁকে তাঁর শ্যালক জজ্জ কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করে নেন। জয়াপীড় তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে সিংহাসন পুনর্দখল করেন। কলহণের বর্ণনা অনুযায়ী প্রবাসে জয়াপীড় পুণ্ড্রবর্ধনরাজ জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গৌড়ের পাঁচজন শাসককে পরাজিত করে তাঁদের তাঁর শ্বশুরের অধীন করে দেন। এ ছাড়া কল্‌হনের বর্ণনানুযায়ী তিনি পূর্বদিকের রাজা ভীমসেন এবং নেপালের রাজা অরমুড়িকে পরাস্ত করেন। উভয় রাজারই সংবাদ অন্য কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া জয়াপীড় একটি স্ত্রীরাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। এই রাজ্যটির পরিচয় না পেলেও এখানে সম্ভবত মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছিল বলে মনে করা চলতে পারে। জয়াপীড় রাজত্ব করেছিলেন ৭৭০ থেকে ৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি পর্যন্ত। ব্রাহ্মণদের একটি চক্রান্তে তিনি নিহত হন।

জয়াপীড়ের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র ললিতাপীড় ও দ্বিতীয় সংগ্রামাপীড় পর পর রাজত্ব করেন। শেষোক্তের মৃত্যুর পর প্রথমোক্তের উপপত্নী জয়াদেবীর গর্ভজাত পুত্র চিপ্পটজয়াপীড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মাতুলদের চক্রান্তে তিনি নিহত হন, এবং এই চক্রান্তকারীরাই চল্লিশ বছর ধরে রাজস্রষ্টার ভূমিকায় অভিনয় করে। ৮১৩ খৃষ্টাব্দে চিপ্পট জয়াপীড় নিহত হবার পর তারা যথাক্রমে ওই কার্কোট বংশের অজিতাপীড়, অনঙ্গাপীড়, উৎপলাপীড় প্রভৃতিকে সিংহাসনে বসায়। এই সময় ওই রাজস্রষ্টা গোষ্ঠীর মুখবর্মা কার্যত কাশ্মীরের সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। কিন্তু তিনি তাঁর এক আত্মীয় কর্তৃক নিহত হন। অতঃপর শূর নামক একজন মন্ত্রী ওই মুখবর্মার পুত্র অবন্তিবর্মাকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। এটা ঘটেছিল ৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে।

অবন্তিবর্মার সিংহাসনলাভের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কার্কোট বংশের অবসান হয়। অবন্তিবর্মার বংশ উৎপল বংশ বলে খ্যাত। অবন্তিবর্মা সুশাসক ছিলেন যিনি মহাপদ্ম নামক একটি হ্রদ (বর্তমান বুলুর) থেকে খাল কেটে কাশ্মীরের সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। বিতস্তা নদীতেও তাঁর নির্দেশে বাঁধ দেওয়া হয়। ৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অবন্তিবর্মার মৃত্যু ঘটলে সিংহাসন নিয়ে আবার বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং গৃহযুদ্ধে বিজয়লাভ করে অবন্তিবর্মার পুত্র শংকরবর্মা কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

সিংহাসন লাভ করেই শংকরবর্মা প্রথমেই বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী দার্বাভিসার অঞ্চলটিতে নিজের অধিকার কায়েম করেন। ওখানকার খশগোষ্ঠীর রাজা নরবাহন বশ্যতা স্বীকার করে সামন্ত হিসাবে থাকলেও পরে বিশ্বাস-ঘাতকতার অভিযোগে শংকরবর্মা তাঁকে হত্যা করেন। এরপর ত্রিগর্ত, অর্থাৎ কাংরা অঞ্চলের রাজা পৃথিবীচন্দ্র তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। পাঞ্জাব অঞ্চলে যে গুজরাত বলে একটি জায়গা আছে সেখানকার গুর্জর বংশীয় রাজা অলখান তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে চন্দ্রভাগার দক্ষিণস্থ তক্ক দেশের অধিকার ছেড়ে দেন। প্রতীহার মহেন্দ্রপালকেও শংকরবর্মার হাতে পরাজিত হয়ে কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে হয়। যোদ্ধা হিসাবে শংকরবর্মা সার্থক হলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি খুব সার্থক হননি, বরং উৎপীড়ক রাজা বলে তাঁর অখ্যাতি ছিল। শংকরবর্মার এক সেনাপতি বীরাণক নামক স্থানে খশদের হাতে নিহত হন। ক্রুদ্ধ শংকরবর্মা এর প্রতিশোধ নেন, এবং তারপর উরশা, বর্তমান হজারা অঞ্চল, অতিক্রম কালে স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধে আকস্মিকভাবে তিনি নিহত হন।

শংকরবর্মার মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র গোপালবর্মা ৯০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ রাজা হন, এবং তাঁর মা সুগন্ধা তাঁর অভিভাবিকা হয়ে রাজ্য চালাতে থাকেন। এই সুগন্ধা প্রভাকর নামক এক মন্ত্রীর প্রেমে পড়েন। প্রভাকর উদভাণ্ডের শ্রীসামন্তকে পরাজিত করে শাহিবংশের তোরমান কমলুককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সে যাই হোক, গোপালবর্মাকে প্রভাকর হত্যা করান, এবং শংকর বর্মার পুত্র বলে কথিত সংকটকে সিংহাসনে বসান। এই নূতন রাজা দশদিন পরেই মারা যান। তখন রানী সুগন্ধা প্রজাদের ইচ্ছায় নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় তন্ত্রী নামক একটি সামরিক-সামন্তচক্র রাজস্রষ্টার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সুগন্ধা অবন্তীবর্মার সম্পর্কিত ভ্রাতা নির্জিতবর্মা ওরফে পঙ্গুকে তাঁর উত্তরাধিকারী করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তন্ত্রীরা রানী সুগন্ধাকে সিংহাসন থেকে হটিয়ে দিয়ে ৯০৬ খৃষ্টাব্দে ওই পঙ্গুর দশমবর্ষীয় পুত্র পার্থকে সিংহাসনে বসায়। সুগন্ধা হুস্কপুরে পালিয়ে যান এবং ৯১৪ খৃষ্টাব্দে তন্ত্রীদের বিরোধী একাঙ্গ নামক আর একটি সামরিক-সামন্তচক্রের সহায়তায় সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু তন্ত্রীরা একাঙ্গদের পরাজিত করে এবং সুগন্ধাকে হত্যা করে।

অতঃপর পার্থই রাজা হন এবং তাঁর পিতা পঙ্গু তন্ত্রীদের উৎকোচে

বশীভূত করে তাঁর অভিভাবক হয়ে বসেন। অর্থের জন্য পঙ্গু প্রজাদের উপর দারুণ করভার চাপিয়েছিলেন। ৯১৭ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। ৯২১ খৃষ্টাব্দে পঙ্গু পুত্রকে উৎখাত করে নিজেই সিংহাসনে বসেন তন্ত্রীদের বহু অর্থ দিয়ে। ৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর অপর পুত্র চক্রবর্মাকে সিংহাসনে বসিয়ে মারা যান। তন্ত্রীরা আরও টাকার লোভে চক্রবর্মাকে সরিয়ে তাঁর সম্পর্কিত ভাই স্থরবর্মাকে সিংহাসনে বসায়। একবছর পরে স্থরবর্মার গদি চলে যায়, আবার পূর্বোক্ত পার্থ সিংহাসন লাভ করেন। চক্রবর্মা তন্ত্রীদের আরো বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে একবছর পরে ৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আবার সিংহাসনে ফিরে আসেন। কিন্তু তন্ত্রীদের আরো দাবি মেটাতে না পেরে চক্রবর্মা পলাতক হন। তখন শম্ভুবর্ধন নামক জনৈক মন্ত্রী অর্থের বিনিময়ে রাজা হন। এদিকে চক্রবর্মা ডামর নামক কথিত তন্ত্রীদের বিরোধী আর একটি সামন্তচক্রের আশ্রয় নেন, এবং ডামর সংগ্রাম তাঁর পক্ষ নিয়ে তন্ত্রীদের পরাজিত করেন ও শম্ভুবর্ধনকে নিহত করেন। চক্রবর্মা পুনরায় রাজা হয়ে ভোগসুখে লিপ্ত হন, এবং ৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। এরপর পার্থের পুত্র উন্মত্তাবন্তিকে সিংহাসনে বসানো হয়, যিনি অত্যাচারী ছিলেন এবং নিজ পিতাকেও হত্যা করিয়েছিলেন। ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রী কমলবর্ধন ডামর, একাঙ্গ, তন্ত্রী প্রভৃতি সামন্তগোষ্ঠীকে একের পর এক পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সিংহাসন দখল করতে পারতেন কিন্তু তা না করে একটি ব্রাহ্মণসভার হস্তে রাজা নির্বাচনের দায়িত্ব দেন। কিন্তু ব্রাহ্মণসভা তাঁকে রাজা নির্বাচিত না করে যশস্কর নামে এক ব্রাহ্মণকে রাজা বলে ঘোষণা করে।

যশস্কর মোটামুটি দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন, কিন্তু ৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী সংগ্রামদেবকে হত্যা করে তাঁর মন্ত্রী পর্বগুপ্ত নিজে রাজা হন। ৯৫০ খৃষ্টাব্দে পর্বগুপ্তের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ক্ষেমগুপ্ত রাজা হন। ক্ষেমগুপ্তের স্ত্রী দিদ্দা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। ৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যু হলে তাঁর নাবালক পুত্র অভিমন্যুর হয়ে রাণী দিদ্দা সর্বক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ক্ষমতার পথে প্রত্যেকটি কাঁটাকে নির্মমভাবে অপসারিত করেন। ৯৭২ খৃষ্টাব্দে অভিমন্যুর মৃত্যু হয়, এবং ক্ষমতালোভী রাণী দিদ্দার চক্রান্তে অভিমন্যুর তিন পুত্র—নন্দিগুপ্ত, ত্রিভুবন ও ভীমগুপ্ত—পরপর নিহত হন। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে দিদ্দা নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেন। ১০০৩ খৃষ্টাব্দে দিদ্দা মারা যান কিন্তু তার আগে তিনি তাঁর ভাগ্নে

লোহর বংশীয় সংগ্রামরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। সংগ্রামরাজ থেকে কাশ্মীরে লোহর বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

৮॥ দক্ষিণ ভারত (৮০০-১০০০ খৃঃ)

পূর্বী চালুক্যগণ : বেঙ্গীর পূর্বী চালুক্য রাজা প্রথম বিজয়াদিত্য ৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁর পুত্র চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধন ৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ৭৬৯-৭০ এর কিছু আগে বেঙ্গীর পূর্বী চালুক্যরা রাষ্ট্রকূটদের দ্বারা পরাজিত হয়, এবং কার্যত রাষ্ট্রকূটশক্তির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ তারা বারবার নিতে চেষ্টা করেছিল।

চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য ৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ তাঁকে পরাজিত করে তাঁর ভাই ভীম সালুক্কিকে বেঙ্গীর সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য শুধু তাঁর হৃত সিংহাসন দখলই করেননি রাষ্ট্রকূটদের বহু অঞ্চলও জয় করে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রের সঙ্গে জনৈকা রাষ্ট্রকূট রাজকন্যার বিবাহের পর সন্ধি হয়েছিল বলে পরবর্তী রাষ্ট্রকূট লিপি সমূহে বলা হয়েছে। মনে হয় যে এই সন্ধির দ্বারা রাষ্ট্রকূটরা বিজয়াদিত্যকে বেঙ্গীর রাজা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং বিজয়াদিত্যও রাষ্ট্রকূটদের আনুষ্ঠানিক আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। বিজয়াদিত্য বস্তার অঞ্চলে জনৈক নাগবংশীয় রাজার সঙ্গে এবং প্রতীহারদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে সংবাদ আছে।

পরবর্তী রাজা বিজয়াদিত্যের পুত্র পঞ্চম বিষ্ণুবর্ধন সামান্য কিছুকাল রাজত্বের পর ৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মারা যান। অতঃপর তাঁর পুত্র তৃতীয় বিজয়াদিত্য ৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পল্লবদের পরাজিত করে নেল্লুর বা নেল্লোর শহরটি দখল করেন। তিনি পাণ্ড্যদেরও পরাজিত করেন, মহীশূরের নোড়ম্ব রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রিকে হত্যা করেন এবং পশ্চিমে গঙ্গদেরও পরাস্ত করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং কলচুরিরাজ শংকরগণের যুগ্মবাহিনীকেও তিনি কিরণপুরের (বালাঘাট জেলা, মধ্যপ্রদেশ) যুদ্ধে পরাজিত করেন। এছাড়া তিনি দক্ষিণ কোসলেও তাঁর বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন।

তৃতীয় বিজয়াদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো চালুক্য প্রথম ভীম ৯২২ খৃঃ

পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বিশাখপতনম জেলার এল্লামাঞ্চিনি অঞ্চলটি জয় করেন, এবং রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘকালীন যুদ্ধে—গোড়ার দিকে পরাজিত ও বন্দী হওয়া সত্ত্বেও—অবশেষে সাফল্যলাভ করেন। চালুক্য ভীমের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র চতুর্থ বিজয়াদিত্য যিনি মাত্র ছয় মাস রাজত্ব করার পর রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র প্রথম অম্ম যিনি ৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় অমোঘবর্ষের বিধবা পত্নীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিলেন যাতে তৎকালীন রাষ্ট্রকূট সিংহাসনের জবরদখলকারী চতুর্থ গোবিন্দ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অম্মের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পঞ্চম বিজয়াদিত্য সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তাল বা তাড়প নামক ওই বংশেরই একজন রাষ্ট্রকূট চতুর্থ গোবিন্দের সহায়তায় বেঙ্গীর সিংহাসন দখল করেন নেন।

কিন্তু এই নূতন রাজা তাল একমাসের মধ্যে চালুক্য প্রথম ভীমের পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কর্তৃক উৎখাত প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি এক বছর রাজত্ব করার পরই প্রথম অম্মের পুত্র দ্বিতীয় ভীম কর্তৃক উৎখাত প্রাপ্ত হন। এই দ্বিতীয় ভীম আবার ছমাস রাজত্ব করার পর পূর্বোক্ত তালের পুত্র মল্ল কর্তৃক নিহত হন, এবং এই মল্ল রাজত্ব করেন সাত বছর (৯৩০-৯৩৬ খৃঃ)। এই মল্ল বা যুদ্ধ মল্ল অবশেষে মূল বংশের চালুক্য দ্বিতীয় ভীম কর্তৃক (যিনি ছিলেন প্রথম অম্মের ভাই) উৎখাত প্রাপ্ত হন এবং চালুক্য দ্বিতীয় ভীম ৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় অম্ম ৯৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁকে বিতাড়িত করেন তালের পৌত্র এবং মল্ল বা যুদ্ধমল্লের পুত্র বাদপ যিনি রাষ্ট্রকূটদের সহায় ৯৬৭ খৃষ্টাব্দ রাজ্য চালান। বাদপের পুত্র দ্বিতীয় তালকে পদচ্যুত রাজা দ্বিতীয় অম্ম পুনরায় পরাজিত ও নিহত করে সিংহাসন দখল করেন, কিন্তু ৯৭০ খৃঃ তিনি তাঁর বড় ভাই দানার্ণব কর্তৃক নিহত হন। তখন দ্বিতীয় অম্মের শ্যালক জটা চোড়-ভীম ৯৭৩ খৃঃ দানার্ণবকে যুদ্ধে নিহত করে নিজেকে বেঙ্গীর রাজা বলে ঘোষণা করেন। দানার্ণবের পুত্ররা চোল রাজসভায় রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়, এবং রাজরাজ চোল ৯৯৯ খৃঃ জটা-চোড়-ভীমের কাছ থেকে বেঙ্গী দখল করে দানার্ণবের পুত্র শক্তিবর্মাকে বেঙ্গীর রাজা করে দেন।

পূর্বী গঙ্গগণঃ কলিঙ্গ নগরের আদি পূর্বী গঙ্গগণ শ্রীকাকুলম অঞ্চলে রাজত্ব করত কিন্তু পরে তাদের একটি শাখা যারা 'পরবর্তী পূর্বী গঙ্গ' বা 'বৃহত্তর

গঙ্গ' বলে পরিচিত উত্তরপুর্বে ভাগীরথীর নিম্নাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মালিক হয়।

আমরা অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্বী গঙ্গদের রাজবৃত্ত আগে উল্লেখ করেছি। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে নবম শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত যে সব গঙ্গরাজাদের নাম জানা গেছে তাঁরা হচ্ছেন দ্বিতীয় দেবেন্দ্রবর্মা, রাজেন্দ্রবর্মা ও তাঁর দুই পুত্র দ্বিতীয় অনন্তবর্মা ও তৃতীয় দেবেন্দ্রবর্মা, অনন্তবর্মার পুত্র দ্বিতীয় রাজেন্দ্রবর্মা, তৃতীয় দেবেন্দ্রবর্মার দুই পুত্র সত্যবর্মা ও তৃতীয় অনন্তবর্মা এবং এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপিত হয়নি ভূপেন্দ্রবর্মা ও তৎপুত্র চতুর্থ দেবেন্দ্রবর্মা। বৃহত্তর গঙ্গদের উদ্ভব হয় ১০৩৮ খৃঃ থেকে, এবং এই বংশের কার্যত সূচনা করেন বজ্রহস্ত অনন্তবর্মা, যিনি রাজরাজের পিতা এবং বিখ্যাত অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের পিতামহ। অনুমান করা যায় যে দক্ষিণের চোলদের অভ্যুত্থানের পর থেকেই তাদেরই সামন্তশক্তি হিসাবে এই বংশের বিকাশ ঘটে, এবং পরে এই গঙ্গবংশ একটি রীতিমত উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত হয় যা আমরা পরে দেখব।

কলিঙ্গ নগরের গঙ্গদের আর একটি শাখা ছিল শ্বেতকের গঙ্গবংশ, যে বংশের মহীন্দ্রবর্মা, পৃথিবীবর্মা, ইন্দ্রবর্মা, দানার্ণব, কৈলাশ ভূপেন্দ্রবর্মা ও দেবেন্দ্রবর্মার নাম পাওয়া গেছে। শ্বেতকের গঙ্গগণ একাদশ শতকের শেষের দিকে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের হাতে উৎখাত প্রাপ্ত হয়েছিল।

সোমবংশীগণঃ সোমবংশীরা রাজত্ব করত দক্ষিণ কোসলে যাদের রাজধানী ছিল শ্রীপুর, অর্থাৎ বর্তমান রায়পুর জেলায় সিরপুর অঞ্চল। আনুমানিক ৯১৫ থেকে ৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই বংশের রাজা শিবগুপ্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র জনমেজয় মহাভবগুপ্ত যিনি রাজত্ব করেছিলেন আনুমানিক ৯৩৫ থেকে ৯৭০ পর্যন্ত এবং যাঁর কিছু লেখমালা স্বুবর্ণপুর বা শোণপুর, মুরসীম বা মুরসিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। উদ্দোতকেশরীর ভুবনেশ্বর লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি ওড্রদেশ জয় করেছিলেন। পরবর্তী রাজা ছিলেন তাঁর পুত্র যযাতি মহাশিবগুপ্ত যিনি আনুমানিক ৯৭০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেছিলেন। মহানদীর তীরে তিনি যযাতিনগর নামক একটি নগরীর পত্তন করেছিলেন। তাঁর কন্যা ছিলেন কর-বংশীয় রাণী পৃথিবী মহাদেবী যিনি সম্ভবত তাঁর পিতার সাহায্যেই সিংহাসন দখল করেছিলেন।

৯ ॥ সুদূর দক্ষিণ (৮০০-১০০০)

পশ্চিমী গঙ্গগণ ঃ পশ্চিমী গঙ্গদের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, মহাশূরের কতকাংশ নিয়ে যাদের এলাকা ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে গঙ্গদের রাজা ছিলেন শ্রীপুরুষ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শিবমার। রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় গোবিন্দের সঙ্গে তাঁর ভাই ধ্রুবের বিরোধ বাধলে শিবমার দ্বিতীয় গোবিন্দের পক্ষ অবলম্বন করেন। ধ্রুব বিজয়ী হয়ে গঙ্গবাড়ি আক্রমণ করেন এবং শিবমারকে বন্দী করেন এবং নিজের বড় ছেলে স্তম্ভকে গঙ্গবাড়ির শাসক করে দেন। ধ্রুবের মৃত্যুর পর স্তম্ভের সঙ্গে তৃতীয় গোবিন্দের বিরোধ বাধলে তৃতীয় গোবিন্দ শিবমারকে মুক্ত করে দেন, কিন্তু শিবমার স্তম্ভের পক্ষ নিলে গোবিন্দ তাঁকে আবার পরাজিত ও বন্দী করেন। পরে অবশ্য গোবিন্দ তাঁকে মুক্তি দেন। এরপর ঘটনাচক্রে গঙ্গ রাজত্ব দুভাগ হয়ে যায়, একটি ভাগের মালিক হন শিবমারের পুত্র মারসিংহ, এবং অপর ভাগের মালিক হন শিবমারের ভাই বিজয়াদিত্যের প্রথম পুত্র প্রথম রাজমল্ল। দ্বিতীয় শাখাটাই পরে প্রধান হয়ে ওঠে। প্রথম শাখাটিতে মারসিংহ এবং পরে তাঁর ভাই প্রথম পৃথিবীপতি রাজত্ব করেন ৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় শাখাটিতে প্রথম রাজমল্ল রাজত্ব করেন ৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি নোঢ়ম্বদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে নিজেকে শক্তিমান করেন। তাঁর পুত্র প্রথম নীতিমার্গ (৮৫৩-৮৭০ খৃঃ) বাণ ও রাষ্ট্রকূটদের উপর বিজয়লাভ করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রাজমল্ল (৮৭০-৯০৭ খৃঃ) পূর্বী চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় নীতিমার্গ ৯০৭-৯৩৫ খৃঃ), এবং তাঁর তিন পুত্র নরসিংহ, তৃতীয় রাজমল্ল এবং দ্বিতীয় ভূতুগ। প্রথম দুজনের রাজত্বকাল মোট দুবছর, দ্বিতীয় ভূতুক রাজত্ব করেছিলেন ৯৩৭ থেকে ৯৫৯ পর্যন্ত। এই ভূতুগ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণকে চোলদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে-ছিলেন এবং তক্কোলমের যুদ্ধে চোল রাজকুমার রাজাদিত্যকে পরাজিত করে-ছিলেন। সম্পর্কে তিনি আবার ছিলেন রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের ভগ্নিপতি। তাঁর বীরত্বের জন্য তৃতীয় কৃষ্ণ তাঁকে বনবাসী অঞ্চলটি দান করেন।

দ্বিতীয় ভূতুগের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মরুলদেব স্বল্পকাল রাজত্ব করেছিলেন। এরপর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাই তৃতীয় মারসিংহ যিনি (৯৬০-৯৭৪) রাষ্ট্র-কূটদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখেন। তাঁর সেনাপতি চামুণ্ড রায় নোঢ়ম্বদের ঘাঁটি উচ্চঙ্গি জয় করেন। কিন্তু মারসিংহ পশ্চিমী চালুক্য দ্বিতীয় তৈলকে পরাজিত করে রাষ্ট্র-

কূটরাজ চতুর্থ ইন্দ্রকে তাঁর হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হন, এবং শেষ পর্যন্ত জৈন সন্ন্যাসী হয়ে যান। পরবর্তী রাজা চতুর্থ রাজমল্লের (৯৭৪-৯৮৫) সময় তাঁকে অপসারিত করার একটি চক্রান্ত হয়, কিন্তু তা তাঁর মন্ত্রী চামুণ্ড রায়ের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়। এই চামুণ্ড রায় ছিলেন সুবিখ্যাত জৈন পণ্ডিত ও লেখক এবং শ্রবণবেলগোলায় বিখ্যাত গোম্মট মূর্তির পরিকল্পনাকার। পরবর্তী রাজা রক্কস গঙ্গের সময়ে (৯৮৫-১০২৪) পশ্চিমী গঙ্গগণ চোলদের অধীন হয়ে যায়।

ক্ষুদ্র শক্তিসমূহ : দক্ষিণের ক্ষুদ্র শক্তিসমূহের মধ্যে প্রথমেই আসে বাণদের কথা যারা পল্লবদের সামন্ত ছিল এবং যাদের এলাকা ছিল পশ্চিম গঙ্গ ও পল্লবদের রাজ্যের মাঝামাঝি, বর্তমান কোলারের সামান্য উত্তরে। তাদের যে কজন নেতার নাম পাওয়া যায় তাঁরা হচ্ছেন প্রথম বিক্রমাদিত্য, বিজয়াদিত্য দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ও তৃতীয় বিক্রমাদিত্য। শেষোক্তজন চোলদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকূট তৃতীয় কৃষ্ণকে সাহায্য করেছিলেন ৯৪৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। পরে চোল পরন্তকের কাছে তারা পরাজিত হলেও তাদের গোটা ট্রাইব অন্যত্র সরে গিয়ে দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল।

নোঢ়ম্বগণ বাস করত নোঢ়ম্ববড়ি বা মহীশূরের চিতলদ্রুগ জেলায়। তাদের নেতাদের মধ্যে আমরা সিঙ্গপোত, পোলচোর প্রথম মহেন্দ্র, দ্বিতীয় নীতিমার্গ ও নন্নি-নোঢ়ম্বরের নাম পাই। পার্শ্ববর্তী বৈদুম্ব এবং গঙ্গদের সঙ্গে তাদের বার-বার যুদ্ধ হয়েছিল, এবং শেষপর্যন্ত তারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল।

বৈদুম্বরা রাজত্ব করত রেনাণ্ডু অঞ্চলে, উত্তর পেন্নার নদী উপত্যকায়। প্রাপ্ত নেতাদের নাম ইরিগয়, গণ্ড ত্রিনেত্র, শন্দয়ন তিরুবয়ন ও শ্রীকণ্ঠ। চোলদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের যুদ্ধে তারা রাষ্ট্রকূট তৃতীয় কৃষ্ণের সামন্ত হিসাবে তাঁকে সাহায্য করেছিল। পরে তারা চোলদের অধীনতা মেনে নেয়।

কঙ্গুদেশ দিল নীলগিরি পাহাড় অঞ্চল থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত, এবং পশ্চিমী গঙ্গ, পল্লব ও পাণ্ড্যদের রাজনীতিক আগ্রাসনের উন্মুক্ত ক্ষেত্র। এই অঞ্চলের তগদূরের অড়িগমানদের পরাজিত করে পাণ্ড্য নেডুঞ্জড়ইয়ন কোয়েম্বাটোর ও সালেম জেলাদ্বয়ে অধিকার বিস্তৃত করেন। পশ্চিমী গঙ্গ ও পাণ্ড্যদের পরাজিত করে প্রথম আদিত্য চোল কঙ্গুদেশ দখল করে নেন।

কেরলে নবম শতকের গোড়ার দিকে পেরুমাঢ় বংশীয় চেরমন রাজত্ব

করতেন। আরবরা এই অঞ্চলে এই সময় বসতি স্থাপন করেছিল এবং স্থানীয় ট্রাইবদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ফলে মোপলাদের উদ্ভব হয়। কথিত আছে চেরমন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খৃষ্টান ও মুসলমান ছাড়াও দশম শতকে কেরলে একটি ইহুদিদের কলোনীও গড়ে উঠেছিল। চোলরাজ প্রথম আদিত্যের (৮৭১-৯০৭) সমসাময়িক ছিলেন কেরলের রাজা স্থাণু রবি। কেরলে ভাস্কর রবিবর্মা রাজত্ব করেছিলেন ৯৭৮ থেকে ১০৩৬ পর্যন্ত। তারপর কেরল অঞ্চলটি চোলদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

পল্লবগণ : ৮০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমরা মোটামুটি চারজন পল্লব রাজার নাম পাই যাঁরা হচ্ছেন দন্তিবর্মা, তৃতীয় নন্দিবর্মা, নৃপতুঙ্গবর্মা ও অপরাজিত। দন্তিবর্মার পূর্বপুরুষদের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর সময় পল্লবরাজ্যে রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ ও পাণ্ড্য প্রথম বরগুণের আক্রমণ ঘটে। দন্তিবর্মার পুত্র তৃতীয় নন্দিবর্মা রাষ্ট্রকূট প্রথম অমোঘবর্ষের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি তেল্লারু নামক স্থানে (উত্তর আর্কট জেলায়) পাণ্ড্যদের পরাজিত করেছিলেন। কাবেরী অঞ্চল, কঙ্গুদেশের একাংশ ও তামিলনাড়ুর মাইলাপুর অঞ্চল তাঁর অধিকারে ছিল। তাঁর পুত্র নৃপতুঙ্গবর্মা বাণদের পরাজিত করেছিলেন এবং পাণ্ড্যদের বিরুদ্ধেও সাফল্যলাভ করেছিলেন। শেষ রাজা অপরাজিত ৮৮০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কুম্ভকোণমের নিকট শ্রীপুরম্বিয়ম নামক স্থানে পাণ্ড্যদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অপরাজিত আদিত্য চোলের নিকট ভয়ানকভাবে পরাজিত হন এবং তাতেই সুপ্রাচীন পল্লববংশের রাজত্বের কার্যত অবসান ঘটে।

পাণ্ড্যগণ : পাণ্ড্যরাজ নেডুঞ্জড়ইয়নের (৭৬৫-৮১৫) সিংহাসনলাভ পর্যন্ত ঘটনার উল্লেখ পূর্বে করেছি। নেডুঞ্জড়ইয়ন, যিনি জটিলবর্মা ও প্রথম বরগুণ নামেও পরিচিত ছিলেন, তগদূরের (সালেম জেলার ধর্মপুরী অঞ্চল) অড়িগমানদের পরাজিত করেন, কঙ্গুদেশ জয় করেন, বেণাদ বা দক্ষিণ ত্রিবাংকুর অঞ্চল অধিকার করেন, পল্লবদের তাঞ্জোরের নিকটে পেন্নাগড়ম নামক স্থানে পরাজিত করেন, ত্রিবাংকুর ও তিরুনেলবেলির মধ্যবর্তী পার্বত্য জাতিদের দমন করেন এবং এইভাবে তিনি তাঞ্জোর, তিরুচিরপল্লি, সালেম, কোয়েম্বাটোর এবং ত্রিবাংকুর অঞ্চলসমূহের উপর নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী পাওয়া যায় তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে উৎকীর্ণ বেড়বিকুড়ি লিপিতে এবং মাদ্রাজ জাদুঘরে রক্ষিত কয়েকটি তাম্রশাসনে। তাঁর পুত্র শ্রীমার শ্রীবল্লভ

(৮১৫-৬২) কেরলের রাজার উপর বিজয়লাভ করেন। তিনি গঙ্গ, পল্লব, চোল, কলিঙ্গ ও মগধদের পরাজিত করেছিলেন বলে তাঁর লেখমালায় দাবি করা হয়েছে। কিন্তু তিনি তেল্লারুর যুদ্ধে পল্লব তৃতীয় নন্দিবর্মার কাছে এবং অরিচিত নামক একটি স্থানে পল্লব নৃপতুঙ্গবর্মার হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বরগুণবর্মা পল্লব অপরাজিতের নিকট আর একদফা পরাজিত হয়েছিলেন ৮৮০ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তী রাজা পরন্তক বীরনারায়ণ (৮৮০-৯০০) পেন্নাগড়ম, ঘরগিরি, কঙ্গুদেশ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধে সাফল্যলাভ করেন। অবশ্য এগুলি ছোট ছোট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রাজসিংহের (৯০০-৯২০) সময় প্রথম পরন্তক চোল তাঁকে পরাস্ত করে মাদুরা দখল করেন, এবং রাজসিংহ সিংহলে পালিয়ে যান। কিন্তু ৯৪৯ খৃঃ তক্কোলমের যুদ্ধে রাষ্ট্রকূটদের হাতে চোলদের পরাজয় ঘটলে সেই সুযোগে জনৈক বীর পাণ্ড্য ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু বীর পাণ্ড্য পরে চোলদের হাতে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেন। চোল প্রথম রাজরাজের আমলে পাণ্ড্য রাজ্য চোলদের হাতে চলে যায়।

চোল শক্তির উত্থান: তাঞ্জোরের চোলবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ালয় আদিতে পল্লবদের সামন্ত ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রথম আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খৃঃ) পল্লবদের সঙ্গে পাণ্ড্যদের মধ্যে অনুষ্ঠিত শ্রীপুরম্বিয়মের যুদ্ধে পল্লবদের পক্ষ নেন এবং পল্লব অপরাজিত এই যুদ্ধে বিজয়ী হলে পুরস্কার স্বরূপ আদিত্য বেশ কিছু এলাকার অধিপতি হিসাবে ঘোষিত হন। কিন্তু পল্লবদের দুর্বলতার আঁচ পেয়ে ৮৯৩ খৃষ্টাব্দের এক যুদ্ধে তিনি নিজের প্রভু পল্লব অপরাজিতকে পরাজিত করে তোণ্ডমণ্ডলম, অর্থাৎ পল্লবদের এলাকাসমূহ অধিকার করেন। এরপর তিনি পাণ্ড্যদের কাছ থেকে কঙ্গুদেশ (সালেম ও কোয়েম্বাটোর জেলা) জয় করেন। তিনি পশ্চিমী গঙ্গদের রাজধানী তড়কাড অবরোধ করেন, ফলে রাজা দ্বিতীয় পৃথিবীপতি তাঁর আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করে নেন।

আদিত্যের পর তাঁর পুত্র পরন্তক (৯০৭-৯৫৩ খৃঃ) রাজা হন এবং মাদুরা লুণ্ঠন করেন। মাদুরার পাণ্ড্যরাজ দ্বিতীয় রাজসিংহ পরাজিত হয়ে সিংহলে পালিয়ে যান। ৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভেল্লূরের যুদ্ধে পাণ্ড্য ও সিংহলের যুগ্মবাহিনী তাঁর হাতে পরাজিত হয়। ওই বছরেই তিনি পশ্চিমী গঙ্গশাসক দ্বিতীয় পৃথিবীপতির সহায়তায় বাণ ও বৈদুম্বদের পরাজিত করেন, এবং রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণের একটি সম্মিলিত বাহিনীকে বল্লাল (উত্তর আর্কট জেলার তিরুবল্লম) নামক

১৩০০ এই তিনশো বছর এই পরিবর্তনের সূচনাকালরূপে তাই গণ্য হবে।

ইসলাম যে আদর্শ এখানে নিয়ে এসেছিল, এবং তা কার্যকর করার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল, তারা একান্তভাবেই বৈদেশিক হওয়াতে, ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে তার প্রতিক্রিয়া সাংঘাতিক হয়েছিল। এতাবৎকাল ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম পাশাপাশি বাস করেছিল, শুধু তাই নয়, এখানে স্থানে স্থানে ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানদের কলোনি গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তাতে চিরা-চরিত সামাজিক মূল্যবোধ সমূহের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ইসলামের নেতৃত্ব আরবদের হাতে থাকলে ইসলামের সঙ্গে স্থানীয় ধর্মব্যবস্থাগুলির একটা সমঝোতা হয়ে যেত সন্দেহ নেই, কেননা আরবীয় পণ্ডিতগণ এদেশের ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে রীতিমত আগ্রহী ছিলেন, অল বিরুনী যার বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আরবের পতন হওয়ায় এবং ইসলামের নেতৃত্ব অমার্জিত তুর্কীদের হাতে চলে যাওয়ায় ইসলামের নূতন আদর্শ যেভাবে ভারতের সামনে হাজির হল, তার প্রতিক্রিয়াটা স্বাভাবিক হয়নি, বরং রীতিমত অস্বাভাবিক হয়েছে।

অতুলনীয় সামাজিক ন্যায়বোধই ইসলাম ধর্মের ভিত্তি, এবং মুহম্মদ একমাত্র ধর্মগুরু যিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। এই আদর্শ তৎকালীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় একটা সার্থক গুণগত পরিবর্তন আনতে পারত, বর্ণভিত্তিক এবং চূড়ান্তরকম বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজ-জীবনকে নূতন এবং উৎকৃষ্টতর মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ইসলামের কল্যাণকর এবং প্রগতিশীল দিকগুলিকে উপলব্ধি করার অবসর ভারতবাসীদের দেওয়া হয়নি, তলোয়ারের সামনে তাদের ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। এবং এই কারণেই ইসলাম এখানে সাফল্যলাভ করেনি। যাকে ইংরেজীতে বলে Culturel Conquest, ইসলামের সেই বিজয় ছ'শো বছর মুসলমান শাসনেও হয়নি।

দ্বিতীয়ত, তুর্কীরা নিজেরাই ইসলামের বিশুদ্ধি বহুলাংশে নষ্ট করে দিয়েছিল। তাদের এখানে আগমন হয়েছিল শাসক হিসাবে, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল একান্তভাবেই গৌণ। বৈষম্যমূলক সমাজের অস্তিত্ব শাসকদের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে সর্বদাই অনুকূল থাকে, কাজেই প্রচলিত ভারতীয় ব্যবস্থা তাদের খুব খারাপ লাগেনি, এবং একধরনের জাতিপ্রথা স্বধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে তারা

গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালেও দেখা গেছে ইংরাজরাও নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে জাতিপ্রথাকে উৎসাহিত করেছে, চাকরির দরখাস্তে High Caste Brahmin লেখা পেলে তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছে। যে সব নিম্নবর্ণের লোকেরা—হয়ত সামাজিক ন্যায়বিচারের আশাতেই—ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা তা পায়নি। ধর্ম বদল করলেও পেশার বদল হয়নি, মর্যাদারও বৃদ্ধি হয়নি, শাসকদের চোখেও নয়। এমনকি উচ্চদের ক্ষেত্রেও ভারতে দীক্ষিত মুসলমান এবং বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। তুর্কী ওমরাহ ও ভারতীয় মুসলমান ওমরাহদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য ছিল, প্রথমোক্তরা শেষোক্তদের আমল দিতনা, এবং দুতরফে সংঘর্ষও বড় কম হয়নি।

তৃতীয় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার দরকার যা এখানে ইসলামের ব্যর্থতার একটি বৃহৎ কারণ। তা হচ্ছে ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন মুসলমান গোষ্ঠীর পারস্পরিক লড়াই যাতে বিবদমান পক্ষগুলিকে হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারদের উপরেই নির্ভর করতে হত। এর ফলে এইসব সামন্ত হিন্দুরাজাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজনটা তাদের ছিল না, নিয়মিত কর ও সৈন্যের জোগান পেয়েই তারা তৃপ্ত থাকত। মাঝে মাঝে ধর্মীয় কর্তব্যবোধ চাড়া দিয়ে উঠলে অবশ্য অন্য কথা। তখন হয়ত কিছু কিছু বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটানো হত, কিন্তু এই বিশাল দেশে তার প্রভাব নগণ্য। এই কারণেই ছ'শো বছর এখানে মুসলমান রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় অধিবাসীদের বারো আনা অংশই হিন্দু থেকে গেছে আজও পর্যন্ত।

এদেশে ইসলাম আসার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে বাঁচতে চেষ্টা করেছিল, কচ্ছপ যেভাবে আত্মরক্ষার জন্য নিজ খোলার মধ্যে আশ্রয় নেয়। জাতিপ্রথার বন্ধনকে আরও কঠিন করা হয়েছিল। এ যুগের স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতারা কঠিনতম সামাজিক আইনকানুনের প্রবর্তন করেছিলেন, যাতে লোকে স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ না করে সেইজন্য। বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যেই ভারত থেকে লোপ হয়ে গিয়েছিল। পালরাজারা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম এদেশ থেকে লোপ পেয়ে যায়। জৈনরা মুসলমান শাসকদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, কিন্তু তারা মূলতঃ বণিকশ্রেণীর লোক ও আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হবার জন্য, ওই একটি স্বার্থেই মুসলমান শাসকদের সঙ্গে তাদের সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের প্রভাবে এদেশে কিছু সমাজ-সচেতন মানব-প্রেমিকের আবির্ভাব হয়েছিল, যেমন নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি, যাঁরা

রাজনীতির মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা চোখ খোলা রেখেছিলেন বলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বৈষম্যমূলক ও বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন। তাঁরা জাতিভেদ প্রথার বিকল্প হিসাবে সরল আদর্শভিত্তিক সম্প্রদায়সমূহের প্রবর্তন করেছিলেন, এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দরজা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই খুলে দিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য জাতিভেদ প্রথাকে রোখা যায়নি, সম্প্রদায়গুলি পরে আবার তারই শিকার হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা আগেও বলেছি যে, এই প্রথা কাগজে কলমে না হলেও বাস্তবে ইসলামধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর একমাত্র কারণ, যে উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদনপদ্ধতি ওই সামাজিক শ্রেণীভেদের জন্ম দিয়েছিল, যুগের পর যুগ ধরে তা মূলত অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছিল, যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করেছি।

২ ॥ গজনবীদের আক্রমণ

খোরাসানের সামানীয় শাসকদের আলপ্‌তিগিন নামক এক মন্ত্রী ছিলেন যিনি তাঁর ক্রীতদাস ও পরে জামাতা সবুক্তিগিনের সহায়তায় ৯৬৩ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে রাজধানী গজনীসহ সমগ্র জাবুলিস্তান এলাকাটি আমীর আবু বকর লাউইকের কাছ থেকে দখল করে নেন। আল্‌পতিগিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসহাক এবং তাঁর জ্ঞাতি বলকাতিগিন ৯৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তারপর সিংহাসন দখল করেন পিরাই নামক আল্‌পতিগিনের একজন ক্রীতদাস, যার কুশাসনের কারণে সামন্তরা প্রাক্তন আমীরের পুত্র আবু আলি লাউইককে গজনী আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। লাউইকের এই আক্রমণকালে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন শাহি-বংশীয় রাজা জয়পাল, কেননা গজনী ছিল তাঁর পার্শ্ববর্তী রাজ্য এবং সেখানকার রাজনীতির ভাঙাগড়ার সঙ্গে তাঁর স্বার্থ স্বাভাবিকভাবেই জড়িত ছিল। কিন্তু লাউইক ও জয়পালের সম্মিলিত বাহিনী চার্‌ক নামক স্থানে লোহ্‌গর নদীর পূর্বতীরে, আকস্মিকভাবে সবুক্তিগিনের হাতে পরাজিত হয়। অতঃপর উচ্চাকাংখী সবুক্তিগিন ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী পিরাইকে অপসারিত করে নিজেই রাজা হয়ে বসেন।

সিংহাসন লাভের পর সবুক্তিগিন বুস্ত, দাবর, কুশদার, বামিয়ান, তুখারিস্তান এবং ঘুর জয় করেন, ও উদভাণ্ডের শাহি-রাজত্বের উপর ক্রমাগত হামলা চালাতে থাকেন, যে রাজত্বের পশ্চিম সীমানা কাবুল উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

শাহী রাজা জয়পাল একটি বিপুল বাহিনী নিয়ে সবুক্তিগিনের মুখোমুখি হন গজনী ও লমঘানের মধ্যবর্তী একটি স্থানে এবং কয়েকদিনের একটানা যুদ্ধের পর পরাজিত হয়ে তাঁর সঙ্গে অপমানজনক শর্তে একটি সন্ধি করেন। ফিরিস্তার মতে অল্পদিনের মধ্যেই জয়পাল ওই সন্ধির শর্তকে অস্বীকার করেন, কিন্তু এবারেও তিনি সবুক্তিগিনের হাতে পরাজিত হন, যিনি লমঘান পর্যন্ত স্থান দখল করে নেন। ওই অঞ্চল মুক্ত করার জন্য জয়পাল দিল্লী, আজমীর, কালঞ্জর প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের সহায়তায় আর একবার ব্যর্থ সামরিক চেষ্টা করেন।

৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সবুক্তিগিনের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ইসমাইল গজনীর সিংহাসন দখল করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ভাই মাহমুদ তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে ৯৯৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষমতায় আসেন। মাহমুদ কমপক্ষে বারো বার ভারতবর্ষে অভিযান করেছিলেন।

প্রথম অভিযানটি হয় ১০০০ খৃষ্টাব্দে। মাহ্‌মুদ পেশোয়ারকে তাঁর আক্রমণ-স্থল হিসাবে বেছে নেন। এই সংবাদ পেয়ে জয়পাল বিপুল সৈন্য নিয়ে তাঁকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু মাহ্‌মুদ অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং ওয়াইহিন্দ বা উদভাণ্ড লুণ্ঠন করেন। শেষ পর্যন্ত জয়পালের পুত্র আনন্দপাল ২৫০,০০০ দীনার ও ২৫টি হাতির বিনিময়ে তাঁর পিতাকে মুক্ত করেন। পর পর তিনবার বিধর্মীদের হাতে পরাজিত হবার গ্লানিতে জয়পাল অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দেন, এবং ১০০১ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র আনন্দপাল উদভাণ্ডের সিংহাসনে বসেন।

১০০৪ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ দ্বিতীয়বার ভারত অভিযান করেন। এবার তিনি বালুচিস্তানের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেন এবং মূলতানের নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে সিন্ধু অতিক্রম করে ভাতিয়া নামক একটি শহর লুণ্ঠন করেন। সেখানকার শাসক বজী রায় সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেন। কিন্তু তা নিস্ফল হয়। প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করার পর এবং অধিবাসীদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার পর মাহমুদ ১০০৫ খৃষ্টাব্দে গজনীতে ফিরে যান, কিন্তু প্রবল বর্ষণে, সিন্ধুর প্রচণ্ড বন্যায় এবং পার্বত্য জাতিসমূহের আক্রমণে তাঁকে প্রায় খালি হাতেই ফিরে যেতে হয়।

১০০৬ খৃষ্টাব্দে মূলতানের শাসক আবুল ফত দাউদ ইসমাইলী মত গ্রহণ করায় তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য মাহমুদ মূলতানে অভিযান করেন। তিনি

আনন্দপালকে অনুরোধ করেন তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর পথ করে দেবার জন্য, কিন্তু আনন্দপাল দাউদের মিত্র হওয়ায় তাতে রাজি হননা, ফলে মাহমুদের সঙ্গে আনন্দপালের যুদ্ধ হয়। আনন্দপাল পরাজিত হয়ে কাশ্মীরে পালিয়ে যান, এবং দাউদ মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই সময় তুর্কী ঈলকখান তাঁর রাজত্বের উত্তর সীমা আক্রমণ করায় তাঁকে ফিরে যেতে হয়, হিন্দুস্তানের বিষয় সমূহের দায়িত্ব নওয়াস শাহের উপর অর্পণ করে। এই নওয়াস ছিলেন জয়পালের পৌত্র সুখপাল, যিনি পূর্বে মাহমুদ কর্তৃক ধৃত ও ইসলোমে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু নওয়াস বিদ্রোহী হন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১০০৭ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ ফিরে এসে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করেন, এবং ৪০০,০০০ দিরহ্ম মূল্যের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন।

১০০৮ খৃষ্টাব্দে মাহামুদ আবার আনন্দপালকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ মাহমুদের প্রতিকূলেই ছিল কিন্তু আনন্দপাল আকস্মিকভাবেই আহত হতে চাকা ঘুরে যায়। পরাজিত বাহিনীকে অনুসরণ করে মাহমুদ কোট কাংরা পর্যন্ত অগ্রসর হন, এবং অকল্পনীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেন। সিন্ধুর পশ্চিমাঞ্চল, এমন কি শাহিদের রাজধানী উদভাণ্ডও তাঁর অধিকারে আসে।

১০০৯ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ রাজস্থানের আলোয়ার অঞ্চলের রাজা নারায়ণের রাজধানী লুণ্ঠন করেন। পরবৎসর তিনি মুলতান অভিযান করেন ও সেখানকার শাসক দাউদকে বন্দী করেন। ১০১১ খৃষ্টাব্দে তিনি থানেশ্বর লুণ্ঠন করেন। থানেশ্বরের পথে দের নামক স্থানের শাসক রাম তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে পরাস্ত হন।

বারবার পরাজিত হয়ে আনন্দপাল বুঝেছিলেন যে যুদ্ধে তিনি পারবেন না, কাজেই মাহমুদের সঙ্গে তিনি পাকাপাকি একটি সন্ধি করেছিলেন এবং ১০১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা পালন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আবার শাহিদের সঙ্গে মাহমুদের সম্পর্ক খারাপ হয়। রাজধানী উদভাণ্ড শাহিদের হস্তচ্যুত হবার পর, তাঁরা রাজধানী সরিয়ে নিয়েছিলেন সল্ট রেঞ্জের নিকটবর্তী নন্দন নামক স্থানে। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ অতর্কিতে আনন্দপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ত্রিলোচনপালকে আক্রমণ করেন। ত্রিলোচনপালের পুত্র ভীমপাল মাহমুদকে প্রবলভাবে বাধা দেন, কাশ্মীরের লোহরবংশীয় সংগ্রাম-রাজের সেনাপতি তুঙ্গ ত্রিলোচনপালের আমন্ত্রণে একটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন কিন্তু পথে পরাজিত হন। এদিকে ভীমপালের বাহিনীও পরাজিত হয়।

তখন ত্রিলোচনপাল ও ভীমপাল কাশ্মীরে আশ্রয় নেন। তাঁদের নগররক্ষী বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ চূর্ণ করে মাহমুদ রাজধানী নন্দন লুণ্ঠন করেন, এবং কাশ্মীরে হানা দেন। তিনি কাশ্মীরের নিম্ন উপত্যকা লুণ্ঠন করেন এবং বহু ব্যক্তিকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেন। ১০১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার কাশ্মীর অভিযান করেন, কিন্তু পির-পনসলে অবস্থিত লোহ্‌কোট দুর্গটি দখল করতে ব্যর্থ হন।

১০১৮ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ পুনর্বার ভারত অভিযান করেন এবং একের পর এক সিন্ধুর শাখানদীগুলি অতিক্রম করেন পাঞ্জাবের ভিতর দিয়ে। শাহি রাজা ত্রিলোচনপাল মালবে পলায়ন করেন, এবং স্থানীয় রাজারা মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করেন। ২রা ডিসেম্বর তারিখে মাহমুদ যমুনা অতিক্রম করেন। প্রথমে তিনি হাজির হন বরণ বা বুলন্দশহরে। সেখানকার শাসক প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে ও ইসলামধর্ম গ্রহণ করে নিষ্কৃতি পান। অতঃপর মাহমুদ মথুরা জেলার মহাবন অঞ্চলটিতে আক্রমণ চালান। সেখানকার শাসক কুলচন্দ্র প্রবল যুদ্ধের পর নিহত হন। এরপর মাহমুদ মথুরা শহর লুণ্ঠন করেন। মথুরা থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের পরিমাণ ছিল দশ কোটি টাকা। অসংখ্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত দেবমূর্তিও তিনি লুণ্ঠন করেছিলেন। কুড়ি দিন ধরে এই লুণ্ঠন কার্য চলেছিল। মথুরা থেকে মাহমুদ কনৌজ যাত্রা করেন। কনৌজের প্রতীহার রাজা রাজ্যপাল পলায়ন করেন এবং মাহমুদ নির্বিবাদে কনৌজ লুণ্ঠন করেন। কনৌজের পর তিনি মুঞ্জ নামক একটি স্থানে ধ্বংসলীলা চালান, এবং তারপর তিনি ফতেপুরের নিকটবর্তী অস্‌নি নামক স্থানে সেখানকার শাসক চন্দ্রপাল ভুরকে পরাজিত করেন। এরপর তাঁর লুণ্ঠনের স্থান ছিল শর্‌ব, শাহরণপুরের নিকটবর্তী শিরসওয়া, সেখানকার শাসক চাঁদ রায়কে পরাজিত করে মাহমুদ প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হন।

১০২০-২১ সালে মাহমুদ চন্দেল্ল বিদ্যাধরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। শাহি রাজা ত্রিলোচন পাল বিদ্যাধরকে সাহায্য করেন, কিন্তু এবারেও গজনীর সুলতান বিজয়ী হন। এই যুদ্ধে অবশিষ্ট শাহি রাজ্য খতম হয়ে যায়, পঁচিশ বছর একটানা প্রতিরোধ করার পর। অল-বিরুণী লিখেছেন: "হিন্দু শাহী বংশ এখন উৎখাতপ্রাপ্ত হয়েছে, এবং গোটা পরিবারের সামান্যতম অবশিষ্ট বর্তমান নেই। কিন্তু আমরা অবশ্যই বলব যে, তাদের সকল জাঁকজমকের মধ্যেও তারা যা ভাল এবং ন্যায়সম্মত তা করার ঐকান্তিক ইচ্ছায় কোন

শৈথিল্য দেখায়নি, এবং তারা মহৎ মনোভাব ও মহৎ সম্পর্কের মানুষ ছিল।" এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন কল্হণ।

ত্রিলোচন পালকে পরাস্ত করে মাহমুদ বারি নামক স্থানে যাত্রা করেন যেখানে প্রতীহাররা কনৌজের পতনের পর রাজধানী পরিবর্তন করেছিল। কিন্তু প্রতীহারাজ মাহ্মুদের মুখোমুখি না হয়ে পলায়ন করেন। বারি অধিকারের পর মাহমুদ পুনরায় চন্দেল্ল বিদ্যাধরকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন। ১৯২১-২২এ তিনি আবার চন্দেল্ল বিদ্যাধরকে আক্রমণ করেন এবং কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করেন। পরে উভয় তরফের একটা সন্ধি হয়। তিনি কচ্ছপঘাত বংশীয় কীর্তিরাজকে পরাজিত করে গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করেন।

১০২৫ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ কাথিয়াবাড়ের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। এখানে তিনি প্রবলতম প্রতিরোধের সম্মুখীন হন, এবং ৫০,০০০ হিন্দু ওই মন্দির রক্ষার্থে জীবন দেয়। ওই মন্দির থেকে তিনি ২০,০০০,০০০ দিরহম মূল্যের সম্পদ লুণ্ঠন করেন, এবং ওই মন্দিরের শিবলিঙ্গ গজনীর একটি মসজিদের সিঁড়ির ধাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তিনি কচ্ছ ও সিন্ধুর মধ্য দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। পথপ্রদর্শক সোমনাথেরই একজন ছদ্মবেশী পূজারী তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বিপথচালিত করে মরুপ্রান্তরে হাজির করে, এবং শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে তিনি গজনীতে ফিরে আসেন। তাঁর সোমনাথ লুণ্ঠন মুসলমান দেশগুলি কর্তৃক প্রশংসিত হয়, স্বয়ং বাগদাদের খলিফা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লেখেন।

মাহ্মুদ শেষ অভিযান করেন ১০২৭ খৃষ্টাব্দে জাঠদের বিরুদ্ধে, এবং এক্ষেত্রেও তিনি সফল হন। ১০৩০ খৃঃ তিনি মারা যান।

৩॥ ভারতীয়দের ব্যর্থতার কারণ

সিন্ধুতে আরব অধিকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুব বড় ঘটনা নয়। তার দ্বারা বহিরাগতদের শক্তিরও কোন সঠিক পরিমাপ হয়নি। কিন্তু সুলতান মাহ্মুদের আক্রমণ একেবারেই ভিন্ন ধরণের। তা ভারতের সামরিক শক্তি ও রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরীণ দেউলিয়াপনাকে বিশেষভাবে প্রকটিত করে দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বহিরাগতদের ভারতে অভিযান চালাতে ও রাজ্য স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ওই বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে

জনগণকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। জনগণের যে প্রতিরোধ ছিলনা তা নয়, কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এবং সর্বোপরি স্থানীয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এখানে কোন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করতে পারেনি, যেটুকু ঐক্যের ভিত্তি ছিল তা ছিল তা ছিল একেবারেই ধর্মীয়, এবং শুধু ওইটুকুকেই ভিত্তি করে সাফল্যলাভ করা যায় না। তা হলে ক্রুসেডগুলিতে ইউরোপীয়রা নিশ্চয়ই সফল হত। শ্রেণীবিভক্ত হিন্দু সমাজের যারা ছিল নিম্নস্তরের মানুষ, রাজনৈতিক ভাঙাগড়ায় তাদের কোন আগ্রহই ছিল না। আর এরাই ছিল সংখ্যায় সর্বাধিক। নিম্নবর্ণের মানুষগুলি সর্বদাই উচ্চবর্ণের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের রীতি অনুযায়ী লুণ্ঠন ও শোষণ এদেরই সর্বাধিক করা হয়েছে। রাজা, অভিজাত, জমিদার বা পার্শ্ববর্তী শক্তিদের লুণ্ঠন তাদের উপর বরাবরই হয়েছে, এক্ষেত্রে মাহমুদের আক্রমণ তাদের কাছে গুণগতভাবে কিছু পৃথক ছিল না। ভারতের রাষ্ট্রশক্তিগুলি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি, আর সেটাই ছিল বাইরের আক্রমণের সামনে ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির ব্যর্থতার কারণ। ভিতরের অবস্থা যে কি ছিল তা আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে দেখব।

৪ ॥ কাশ্মীর ও উত্তর-ভারত (১০০০-১৩০০ খৃঃ)

কাশ্মীর ঃ আমরা আগে দেখেছি যে, একাদশ শতকে কাশ্মীরের সিংহাসন লোহর বংশের সংগ্রামরাজের হাতে চলে গিয়েছিল। তাঁর মন্ত্রী তুঙ্গ সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে শাহি-ত্রিলোচন পালকে সাহায্য করেছিলেন। সংগ্রামরাজের মৃত্যুর পর (১০২৮ খৃঃ) তাঁর পুত্র হরিরাজ মাত্র ২১ দিন শাসন করেন। তারপর সিংহাসন পান তাঁর ভাই অনন্ত, যিনি ডামর নামক সামন্ত গোষ্ঠীকে দমন করেন, দর্দদের আক্রমণ প্রতিহত করেন চম্বার শাসক সালবাহনকে উচ্ছেদ করেন, দর্বাভিসার, ত্রিগর্ত এবং ভর্তুল অঞ্চলগুলির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন, কিন্তু উরশা ও বল্লাপুরের পার্বত্য অঞ্চলগুলি দখল করতে ব্যর্থ হন। ১০৬৩ খৃঃ তাঁর লম্পট পুত্র কলশ রাজা হন যাঁর সময় কাশ্মীর বাইরের বহু শক্তির উপর প্রাধান্যলাভ করে। কিন্তু পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সফল হলেও কলশ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিলেন, এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র হর্ষ বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে কলশ মারা গেলে তাঁর পুত্র উৎকর্ষ রাজা হন, কিন্তু তাঁকে হটিয়ে হর্ষ ক্ষমতায় আসেন।

হর্ষ ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাবান, বহু গুণে গুণী, এবং তাঁর রাজসভা কবি-সাহিত্যিক ও বিদ্বানদের কাছে কল্পবৃক্ষের ন্যায় ছিল। সিংহাসন লাভ করেই হর্ষ বিদ্রোহী সামন্তদের দমন করেন, কিন্তু রাজপুরীর শাসক ও তুঙ্গঘাতের দর্দদের বিরুদ্ধে তিনি ব্যর্থ হন। ব্যক্তিগত বহু গুণ সত্ত্বেও হর্ষ ছিলেন লম্পট শিরোমণি ও অত্যাচারী। অর্থের জন্য তিনি দেবমন্দির কলুষিত করতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তাঁর অনুসৃত করনীতির ফলে দিকে দিকে বিদ্রোহ দেখা যায় এবং সেই সুযোগে উচ্চল ও সুস্‌সল নামক দুই ভাই, যাঁরা লোহরবংশেরই ভিন্ন শাখার অন্তর্গত ছিলেন, জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১১০১ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে হর্ষ নিহত হন।

অতঃপর উচ্চল রাজা হন। কিন্তু ১১১১ খৃষ্টাব্দে উচ্চল নিহত হন। ডামর-সামন্ত গর্গচন্দ্র অতঃপর সলহণ নামক এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসান, কিন্তু পরে ১১১২ খৃষ্টাব্দে ক্ষমতায় আসেন উচ্চলের ভাই সুস্‌সল। ১১১৮ খৃষ্টাব্দে সুস্‌সল গর্গচন্দ্র ও তাঁর তিন পুত্রকে নিহত করেন। তিনি রাজপুরীর শাসক সোমপালকে পদচ্যুত করে নাগপালকে সেখানকার শাসক করেন। কিন্তু ডামরদের চক্রান্ত ও নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ গোলমালের জন্য তিনি তাঁর পুত্র জয়সিংহের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন ১১২৩ খৃষ্টাব্দে, এবং রহস্যজনকভাবে নিহত হন ১১২৮ খৃষ্টাব্দে। জয়সিংহ বিদ্রোহী সামন্তবর্গকে নির্মম হস্তে দমন করেন এবং ১১৫৫ পর্যন্ত শান্তিতে রাজত্ব করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র পরমানুক (১১৫৫-৬৫) এবং তাঁর পুত্র ওই বংশের শেষ রাজা, বন্তিদেব (১১৬৫-৭২)।

বন্তিদেবের মৃত্যুর পর সামন্তরা বুপ্পদেব নামক ভিন্নবংশীয় একজনকে সিংহাসনে বসায়। ১১৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জস্‌সক ১১৯৯ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পরবর্তী রাজা, তাঁর পুত্র জপদেব, ১২১৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। পরবর্তী রাজারা রাজদেব (১২৩৬ পর্যন্ত), সংগ্রামদেব (১২৫২ পর্যন্ত) রামদেব (১২৭৩ পর্যন্ত), এবং তাঁর পালিত পুত্র ব্রাহ্মণজাতীয় লক্ষ্মদেব যিনি ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে এক মুসলমানের হাতে নিহত হন। এরপর সিংহাসনের জন্য ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সাফল্যলাভ করেন জনৈক সিংহদেব, এবং তারপর সূহদেব যিনি ১৩২০ খৃষ্টাব্দে কজ্জল নামক নিহত হন। তাঁর রাজত্বকালে জনৈক কর্ণসেন নামক রাজার সেনাপতি জুলুচ কাশ্মীর লুণ্ঠন করেন, এবং তারপর কাশ্মীর অধিকার করেন তিব্বতী রিঞ্চন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে রিঞ্চন নিহত হলে তাঁর এক মুসলমান সেনাপতি

শাহমের রিঞ্চনেরই এক আত্মীয় উদয়নদেবকে সিংহাসনে বসান। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে উদয়নের মৃত্যু ঘটলে শাহমের তাঁর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন এবং শংসদ্দীন বা সামসুদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

পাঞ্জাবের ইয়ামিনি বংশ ঃ ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহ্মুদের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র মাসুদ তাঁর ভাই মুহম্মদকে বন্দী ও অন্ধ করে পিতার সিংহাসন দখল করেন। তিনি মাহ্মুদ নিয়োজিত পাঞ্জাবের শাসক আরিয়ারুককে সরিয়ে নিয়ালতিগীন নামক তাঁর নিজের এক পোষ্যকে পাঞ্জাবের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি রাজস্ব নিয়ে গোলমাল করেন এবং মাসুদের বিরুদ্ধে চক্রান্তেও লিপ্ত হন। মাসুদ তিলক নামক এক হিন্দুকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠান এবং যুদ্ধে নিয়ালতিগীন পরাজিত হন, এবং পলায়ন কালে জাঠরা তাঁকে নিহত করে। ১০৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মজদূদকে পাঞ্জাবের শাসক নিযুক্ত করেন, এবং নিজে, মন্ত্রিবর্গের উপদেশ অগ্রাহ্য করেও, ভারতবর্ষে একটা অভিযান করেন। তাঁর অভিযানের ক্ষেত্র ছিল বর্তমান হরিয়ানা অঞ্চল। ভারতে অকারণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সুযোগ নিয়ে সলজুক তুর্কীরা পশ্চিম দিক থেকে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। ১০৪০ খৃষ্টাব্দে মাসুদের তুর্কী এবং হিন্দু ক্রীতদাসরা তাঁকে নিহত করে, এবং তাঁর অন্ধ ভাই মুহম্মদকে সিংহাসনে বসায়। তারপরেই সিংহাসন নিয়ে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত মাসুদের পুত্র মৌদুদ গজনী ও পাঞ্জাবে নিজ প্রভূত্ব স্থাপন করেন।

কিন্তু শান্তিতে রাজত্ব করা মৌদুদের কপালে ছিল না। সলজুক তুর্কীরা পশ্চিম দিক থেকে তাঁকে বিব্রত করছিল। অপরদিকে ভারতীয়রা পরমার ভোজ কলচুরি কর্ণ ও চাহমান অণহিলের নেতৃত্বে জোট বেঁধে নগরকোট ও হানসি থেকে মুসলমানদের উৎখাত করে। ১০৪৯ খৃষ্টাব্দে মৌদুদের মৃত্যু হয়। এরপর আবার সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ, যার ফলে ক্ষমতায় আসেন প্রথম মাসুদেরই এক পুত্র ইব্রাহিম ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে। ১০৭৫-এ তিনি তাঁর পুত্র মাহ্মুদকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, যিনি আগ্রা ও কনৌজ লুণ্ঠন করেন, কিন্তু উজ্জয়িনী আক্রমণ করতে গিয়ে পরমার লক্ষ্মদেবের নিকট পরাজিত হন। ইব্রাহিমের পর তৃতীয় মাসুদ গজনীর সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন উজদ্-উদ-দৌলা, যাঁর সেনাপতি হাজিব তুখাতিগীণ কনৌজের গাহড়বাল রাজা মদনচন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দী করেন, কিন্তু মদনচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র মুসলমানদের পরাজিত করে তাঁর পিতাকে উদ্ধার করেন।

তারপর আবার গজনীর সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব হয় এবং ১১১৮ খৃষ্টাব্দে বহরাম সুলতান হন। তাঁর আমলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বাহলীন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুলতানের যুদ্ধে বহরাম তাঁকে পরাস্ত করেন এবং পাঞ্জাবের ভার ন্যস্ত করেন সলর হুসেনের উপর। এরপর ঘটনাচক্রে বহরাম তাঁদেরই জ্ঞাতি ঘূরের শাসকদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, এবং ঘূরের আলাউদ্দীন গজনী ধ্বংস করেন। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে বহরামের পুত্র খুসরব শাহ গজনী হারিয়ে লাহোরে এসে রাজত্ব শুরু করেন। তাঁর পুত্র খুসরব মালিকের সময় ১১৮১ খৃষ্টাব্দে ঘূরের মুইজুদ্দীন মুহম্মদ, যিনি শিহাবুদ্দীন নামেও পরিচিত, লাহোর আক্রমণ করেন। খুসরব মালিক তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে রেহাই পান। মুইজুদ্দীন আরও দুবার লাহোর আক্রমণ করেছিলেন ১১৮৪ এবং ১১৮৬ সালে। তাঁর শেষ আক্রমণে ইয়ামিনি বংশ শেষ হয়ে যায়।

কনৌজ ঃ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে মাহমুদের আক্রমণ এড়াতে কনৌজের প্রতীহার রাজা রাজ্যপাল বারি নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু কয়েকটি লেখমালার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, তারপর একটি রাষ্ট্রকূটবংশ কনৌজে কিছুকাল রাজত্ব করেছিল। এই বংশের প্রথম তিনজন রাজা—চন্দ্র, বিগ্রহপাল ও ভুবনপাল—একাদশ শতক জুড়ে রাজত্ব করেছিলেন। তৃতীয় জনের রাজত্ব কালে চালুক্য প্রথম সোমেশ্বর ও চোল বীররাজেন্দ্র কনৌজ আক্রমণ করেছিলেন। পরবর্তী রাজা গোপালের সময় কনৌজ গজনীর ইয়ামিনিদের অধীনে আসে, এবং গোপাল বুদায়ুন অঞ্চলে সরে যান। তাঁর পুত্র ত্রিভুবনের আমলে এই রাষ্ট্রকূটদের রাজত্ব গোণ্ডা জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণপালের হাত থেকে কুতবুদ্দীন ১২০২ খৃষ্টাব্দে তাঁদের গোটা এলাকাটা দখল করে নেন।

একাদশ শতকের শেষদিকে কনৌজের সিংহাসনে গাহড়বাল বংশীয় রাজাদের দেখা যায়। আমরা আগেই দেখেছি যে রাষ্ট্রকূটবংশীয় গোপালের আমলে কনৌজ ইয়ামিনিদের অধীনে এসেছিল এবং এটা ঘটেছিল ১০৬৮ থেকে ১০৮০-র মধ্যে। ইয়ামিনি শাসক ইব্রাহিমের পুত্র মাহমুদ চাঁদ রায় নামক একজন হিন্দুকে কনৌজ অঞ্চল দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করেন। ইনিই সম্ভবত গাহড়বাল বংশীয় চন্দ্রদেব, যিনি পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর লেখমালাসমূহ থেকে জানা যায় যে কনৌজ, বারাণসী ও অযোধ্যা তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র মদনচন্দ্র। তাঁর সময় ইয়ামিনি বংশীয় তৃতীয়

মাসুদ কনৌজ আক্রমণ করেন ও তাঁকে বন্দী করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র গোবিন্দ-চন্দ্র ইয়ামিনিদের পরাস্ত করেন এবং মদনচন্দ্রকে মুক্তি দিতে তাদের বাধ্য করেন। এছাড়া গোবিন্দচন্দ্র গৌড়ের রামপালের আক্রমণ প্রতিহত করেন, কলিঙ্গ ও উৎকলের রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া ব্যাহত করেন, মিথিলার নান্যদেবের আক্রমণও প্রতিহত করেন। তাঁর লেখ-মালাসমূহ থেকে জানা যায় যে ১১১৪ থেকে ১১৫৪ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করে-ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র বিজয়চন্দ্র যিনি ইয়ামিনি খুসরব মালিকের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র জয়চন্দ্র রাজা হন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী তাঁকে এটাওয়া জেলার চন্দাবার নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু মুহম্মদ ঘুরীর সাফল্য পাকাপাকি ছিল না। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র যে জৌনপুর, মির্জাপুর ও কনৌজের উপর পুনরায় অধিকার স্থাপন করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ আছে। হরিশ্চন্দ্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন অড়ক্কমল্ল যাঁর হাত থেকে ইলতুৎমিশ কনৌজ দখল করেন ১২৩৬ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে।

গুজরাতের চৌলুক্যগণ ঃ একাদশ শতকের শুরুতে চৌলুক্যগণ গুজরাত অঞ্চলে বেশ শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। ১০১০ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্যরাজ চামুণ্ড তাঁর পুত্র দুর্লভকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১০২২ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভাইপো প্রথম ভীম রাজা হন। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ গুজরাত আক্রমণ করেন ও সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। তখন ভীম কচ্ছের কণ্ঠকোট অঞ্চলে পলায়ন করেন। ১০৬২ খৃষ্টাব্দের আবু পাহাড় লিপি থেকে জানা যায় যে প্রথম ভীম তাঁর হারানো রাজ্য পুনরধিকার করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ভিনমাল ও মারবার অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন, সিন্ধুর শাসক হম্মুককেও পরাজিত করেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পরমার ভোজ অণহিলপাঠক নগরটি লুণ্ঠন করেছিলেন। পরবর্তী রাজা, ভীমের পুত্র কর্ণ (১০৬৪-৯৪) মহারাষ্ট্রের নবসারি অঞ্চলটি জয় করেন এবং পরমার জয়সিংহকে পরাজিত করে কিছুকালের জন্য মালবে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন, কিন্তু পরে তিনি পরমার বংশীয় জগদ্দেবের হাতে পরাজিত হন। পরবর্তী রাজা জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৫) উত্তরে যোধপুরের বলি ও জয়পুরের সাম্ভর, পূর্বে ভিলসা এবং পশ্চিমে

কচ্ছ পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন। তিনি আভীর, চাহমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী, চন্দেল্ল, পরমার ও চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী রাজা কুমারপাল (১১৪৫-৭২) বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তারপর সিংহাসনের দ্বন্দ্বে অজয়পাল (১১৭২-৭৬) জয়ী হন এবং তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মূলরাজের আমলে ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘূরী গুজরাত আক্রমণ করেন, কিন্তু সেই আক্রমণ সাফল্যলাভ করেনি। ১১৭৮ এই মূলরাজ মারা গেলে তাঁর ভাই দ্বিতীয় ভীম রাজা হন এবং ১২৪২ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময় যাদব ভিল্লম গুজরাত আক্রমণ করেন। পরমার সুভটবর্মা লাট অঞ্চল জয় করেন, তবে সামন্ত বাঘেলবংশীয় রাজাদের সহায়তায় ভীম আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে ভীম কুতবউদ্দীনের আক্রমণ প্রতিহত করেন, কিন্তু ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে কুতবউদ্দীন পুনরায় গুজরাত আক্রমণ করেন ও অনহিল পাঠক লুণ্ঠন করেন। পরবর্তী রাজা ত্রিভুবনপাল যাদব সিংঘণ, পরমার জৈতুগি এবং গুহিল জৈত্রসিংহের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ত্রিভুবনপাল রাজত্ব করে-ছিলেন ১২৪২ থেকে ১২৫০ পর্যন্ত। পরবর্তী রাজারা ছিলেন বীরাম (১২৫১), বীসল (১২৫১-৬১), অর্জুন (১২৬১-৭৪) ও সারঙ্গদেব (১২৭৪-৯৬)। এঁরা ছিলেন চৌলুক্যদের সামন্ত বাঘেল বংশীয়। সারঙ্গদেবের সময়ে বলবনের নেতৃত্বে তুর্কো-আফগানরা বারবার আক্রমণ করে চৌলুক্যদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে, কিন্তু গুহিল সমরসিংহের সহায়তার তিনি তা প্রতিহত করেন। এছাড়া সারঙ্গদেব মালবের দ্বিতীয় অর্জুনবর্মাকে পরাস্ত করেন ও দেবগিরির যাদব রামচন্দ্রের একটি আক্রমণও প্রতিহত করেন। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভাইপো কর্ণ রাজা হন। ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজীর দুই সেনাপতি উলুঘ খান ও নুসরৎ খান কর্ণকে পরাস্ত করে গুজরাত দখল করেন এবং তাঁর পত্নী কমলা দেবীকে আলাউদ্দীনের হারেমে প্রেরণ করেন। কন্যা দেবলাদেবীকে নিয়ে তিনি নাসিকের অন্তর্গত বাগলান নামক স্থানে চলে যান এবং সেখানে কিছুকাল রাজত্ব করেন। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাতের শাসক অলফ খান বাগলান আক্রমণ করলে তিনি কন্যা দেবলাদেবীকে দেবগিরিতে পাঠান, কিন্তু পথিমধ্যে দেবলা দেবী ধৃত হয়ে দিল্লীতে আলাউদ্দীনের কাছে প্রেরিত হন। কর্ণ কিছুকাল অলফ খানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু কিছু করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দেবগিরিতে পলায়ন করেন।

রাজস্থান ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ ঃ রাজস্থান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা

সমূহে অনেক ক্ষুদ্র রাজবংশ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করে-করেছিল। এখানে আমরা সেগুলির কথা বলছি।

বয়ান-শ্রীপথ অঞ্চলে, অর্থাৎ ভরতপুরে, যদুবংশীয়দের শাসন ছিল। ১০০০ থেকে আনুমানিক ১১৯২-৯৩ পর্যন্ত এখানে যাঁরা রাজত্ব করেছেন তাঁদের নাম যথাক্রমে জৈতপাল, বিজয়পাল, তাহনপাল, ধর্মপাল, অজয়পাল, হরিপাল ও সোহপাল বা সহনপাল। সোহপালের পরবর্তী রাজা বংশতালিকা অনুযায়ী অনঙ্গপাল। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন কুনবার পাল, যাঁকে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘূরী ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে পরাজিত করেছিলেন বলে তাজ-উল-ম'আসির গ্রন্থে বলা হয়েছে। বংশতালিকায় অবশ্য এই কুনবারপালকে অজয়পালের আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। অনঙ্গপাল এঁদের পরবর্তী যাঁর উত্তরাধিকারীরা—পৃথ্বীপাল, রাজপাল ও ত্রিলোকপাল—ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

কচ্ছপঘাতরা ছিল রাজপুত ট্রাইব যাদের তিনটি শাখা একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল যথাক্রমে গোয়ালিয়র, ডুবকুণ্ড এবং নর-ওয়ারে। গোয়ালিয়রে কচ্ছপঘাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক লক্ষ্মণ যিনি চন্দেল্ল ধঙ্গের সামন্ত ছিলেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন তাঁর পুত্র বজ্রদামা (৯৭৭ খৃষ্টাব্দ), মঙ্গলরাজ ও কীর্তিরাজ। কীর্তিরাজের সময় সুলতান মাহমুদ গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন (১০২১ খৃঃ) এবং কীর্তিরাজ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন মূলদেব, দেবপাল, পদ্মপাল, মহীপাল ও রত্নপাল। রত্নপাল ১১০৪ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর বংশধরদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরা গোয়ালিয়র অধিকার করে। আরম শাহ যখন দিল্লীর সুলতান প্রতীহার বিগ্রহ মুসলমানদের পরাজিত করে গোয়ালিয়র দখল করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাত থেকে বলবন ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র জয় করেন।

কচ্ছপঘাতদের দ্বিতীয় শাখাটি রাজত্ব করত গোয়ালিয়রের ৭৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ডুবকুণ্ড নামক স্থানে। এই বংশের যাদের নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হচ্ছেন অর্জুন, অভিমন্যু, বিজয় পাল ও বিক্রম সিংহ। শেষোক্ত জনের জানা তারিখ ১০৮৮ খৃষ্টাব্দ। কচ্ছপঘাতদের তৃতীয় শাখাটি রাজত্ব করত নারওয়ারে যাদের রাজাদের নাম পাওয়া গেছে নলপুর দুর্গে ১১২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে। এঁরা ছিলেন গঙ্গাসিংহ, শরদসিংহ ও বীরসিংহ।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে নারওয়ারে যজ্বপাল নামক একটি বংশ ক্ষমতায়

আসে যাদের রাজা ছাহড়দেব ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে ইলতুৎমিসের সেনাপতি মালিক নসরতুদ্দীন তয়সাইকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে বলবন তাঁকে পরাজিত করলেও নারওয়ার দখল করতে পারেননি। ছাহড়দেবের প্রাপ্ত মুদ্রাসমূহের তারিখ ১২৩৭ থেকে ১২৫৪ মধ্যে। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন নৃবর্মা, আসল্লদেব, গোপাল এবং গণপতি যাঁরা ১২৯৮ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে প্রমাণ আছে।

আবুপাহাড়, বাগড়, জালোর ও ভিলমালে পরমারদের কয়েকটি শাখা বংশ রাজত্ব করত একাদশ ও দ্বাদশ ও শতকে। আবুপাহাড় অঞ্চলের পরমার শাসক ধন্ধুক ১০৩০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ চৌলুক্য প্রথম ভীম কর্তৃক পরাজিত হন, এবং চৌলুক্যদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহ করেন। রাজা ধারাবর্ষের সময় আবু পাহাড়ের পরমাররা চৌলুক্যদের হয়ে চাহমান তৃতীয় পৃথ্বীরাজের আক্রমণ প্রতিহত করেন, কিন্তু ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কুতবুদ্দীনের সেনাপতি খুসরবের হাতে পরাজিত হন। ইলতুৎমিশ যখন গুজরাত আক্রমণ করেন ধারাবর্ষ রাজা বীরধবলকে সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন প্রহ্লাদন, সোমসিংহ, কৃষ্ণরাজ ও প্রতাপসিংহ। শেষোক্তজনের সময় আবু-পাহাড় অঞ্চলটি গুহিল সমরসিংহ দখল করে নেন কিন্তু বাঘেল সারঙ্গদেবের সহায়তায় প্রতাপসিংহ তা উদ্ধার করেন, এবং বাঘেলদের সামন্ত হয়ে যান। তাঁর পুত্র অর্জুন ১২৯০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৩২০ সালের কিছু পূর্বে আবু-পাহাড় অঞ্চল দক্ষিণ মারবারের চাহমান লুন্টিগের অধীনে চলে যায়।

বাগড় অর্থাৎ বর্তমান ডুঙ্গরপুরের বাসনওয়ারা অঞ্চলে পরমারদের একটি শাখা রাজত্ব করত যে বংশের রাজাদের মধ্যে ধনিক, ছচ্ছ, চণ্ডপ, সত্যরাজ, লিম্বরাজ, মণ্ডলিক, চামুণ্ড ও বিজয়রাজের নাম পাওয়া গেছে যাঁরা দশম শতকের মাঝামাঝি থেকে রাজ্য শুরু করেছিলেন, এবং গুহিলগণ যাদের রাজ্য দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দখল করেছিল। ছচ্ছ দ্বিতীয় সীয়কের পক্ষে রাষ্ট্রকূট খোট্টিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। সত্যরাজ চৌলুক্যদের বিরুদ্ধে রাজা ভোজকে সাহায্য করেছিলেন।

জালোরে খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বাকপতি মুঞ্জের পুত্র চন্দন একটি পরমার বংশ স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন দেবরাজ, অপরাজিত, বিজ্জল, ধারাবর্ষ ও বীসল (১১১৭)। এই বংশের শেষ রাজা কুংতপাল দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে নাডোলের চাহমান কীর্তিপালের বশ্যতা স্বীকার করেন।

ভিনমালের পরমার বংশীয় রাজারা ছিলেন দূসল, কৃষ্ণরাজ, সোচ্ছরাজ, উদয়রাজ, সোমেশ্বর, জয়তসিংহ ও সলখ। এঁরা রাজ্য শুরু করেছিলেন একাদশ শতক থেকে এবং ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে দক্ষিণ মারবারের চাহমানদের অধীন হয়ে যান।

মেবারের গুহিলদের পূর্ব ইতিহাস আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দশম শতকের শেষের দিকে শক্তিকুমারের পর তাঁর পুত্র অম্বাপ্রসাদ রাজা হন যিনি শাকম্ভরীর চাহমানরাজ দ্বিতীয় বাকপতির সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর পরে অনেকে রাজত্ব করেন যাঁদের মধ্যে বিজয় সিংহের রাজত্বকাল জানা গেছে ১১০৮ থেকে ১১১৬ র মধ্যে। এরপর মেবারে বারবার চৌলুক্যদের আক্রমণ ঘটেছিল। ১১৮২ খৃষ্টাব্দে কুমারসিংহ মেবারে গুহিল অধিকার মোটামুটিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আরও পরে ১২১৩ থেকে জৈত্রসিংহের আমলে মেবারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ঘটে। জৈত্রসিংহের রাজত্বের গোড়ার দিকে সুলতান ইলতুৎমিশ মেবারের উপর আক্রমণ চালান, এবং গুহিল রাজধানী নাগহ্রদ ধ্বংস করেন। কিন্তু বাঘেল বীরধবল জৈত্রসিংহকে সাহায্য করতে আসছেন এই সংবাদ পেয়ে ইলতুৎমিশ সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নেন। জৈত্রসিংহ অতংপর নাডোল লুণ্ঠন করেন এবং গুজরাতের চৌলুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শাকম্ভরীর চাহমানদের বিরুদ্ধেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। জৈত্রসিংহের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র তেজসিংহ যিনি ১২৬০ কিছু আগে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন সমর সিংহ, যিনি গুজরাত বলবন কর্তৃক আক্রান্ত হলে সেখানকার বাঘেলবংশীয় রাজা সারঙ্গদেবকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে আলাউদ্দীন খলজীর ভাই উলুঘ খান গুজরাত আক্রমণ করলে, আত্মরক্ষার জন্য সমর সিংহ আগেভাগেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেন। সমর সিংহের পুত্র রত্নসিংহ যাঁর একটি জানা তারিখ ১৩০২। তাঁর সময় আলাউদ্দীন খলজী চিতোর আক্রমণ করেন, এবং দু মাস বাধা দেবার পর রত্নসিংহ গোপনে আলাউদ্দীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন চিতোর দুর্গ দখল করে নিজপুত্র খিজির খানকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন, এবং বন্দী রত্নসিংহকে দিল্লী নিয়ে যান। পরে অবশ্য রত্নসিংহ মুক্ত হন। আলাউদ্দীন খিজির খানকে দিল্লীতে ফেরত নিয়ে আসেন এবং চিতোরের শাসনভার রত্নসিংহের ভাগ্নে মালদেবের উপর অর্পণ করেন। মালদেব আলাউদ্দীনের সামন্ত হিসাবেই শাসন করেছিলেন।

শিশোদিয়ায় গুহিলদের আর একটি শাখাবংশ রাজত্ব করত যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাহপ। তুঘলকবংশীয়দের রাজত্বকালে এই বংশের হম্মীর মালদেবের পুত্র জেসোকে উৎখাত করে চিতোরে শিশোদিয়াদের প্রাধান্য স্থাপন করেন।

চাহমানদের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। একাদশ শতক থেকে চতুর্দশ শতকের সূত্রপাত পর্যন্ত চাহমানদের পাঁচটি শাখা শাকম্ভরী, রণস্তম্ভপুর, নাডোল, জাবালিপুর ও দেবড়ায় যথাক্রমে রাজত্ব করত।

আমরা আগেই দেখেছি যে দশম শতকের শেষের দিকে দুর্লভরাজের অধীনে শাকম্ভরীর চাহমানরা একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ সুলতান মাহমুদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসেছিলেন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বাক্‌পতি গুহিল অম্বাপ্রসাদকে পরাজিত করেন। তাঁর ভাই, যিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, পরমার ভোজের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর নাম ছিল বীর্যরাম। পরবর্তী রাজা ছিলেন তাঁর ভাই চামুণ্ড যাঁর পর যথাক্রমে বীর্যরামের চার পুত্র সিংঘট, তৃতীয় দুর্লভরাজ, বীরসিংহ ও তৃতীয় বিগ্রহরাজ রাজত্ব করেন। বিগ্রহরাজের পর রাজা হন তাঁর পুত্র প্রথম পৃথ্বীরাজ, অজয়রাজ ও অর্ণোরাজ যাঁরা সম্পর্কে প্রত্যেকেই পিতাপুত্র ছিলেন। এই সকল রাজারা গুজরাতের চৌলুক্য ও মালবের পরমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বহু সামন্তরাজ্য নিজেদের অধিকারে আনেন। অর্ণারাজ তুরুস্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন বলা যায় না। ১১৫৩ সাল নাগাদ তিনি তাঁর পুত্র জুগদেব কর্তৃক নিহত হন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁর ভাই চতুর্থ বিগ্রহরাজ তাঁকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।

এই বিগ্রহরাজের সময়ই শাকম্ভরীর চাহমানরা বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়। তিনি শুধু ঢিল্লিক (দিল্লী) তোমরদের হাত থেকে কেড়ে নেননি, পাঞ্জাবের হিসার জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। পূর্বে তাঁর রাজত্ব সহারাণপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি মুসলমানদেরও কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র অপরগাঙ্গেয় এবং তারপর জুগদেবের পুত্র দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ। ১১৬৮-৬৯এ তাঁর কাকা, অর্ণোরাজের পুত্র সোমেশ্বর রাজা হন। ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে সোমেশ্বরের উত্তরাধিকারী হন তার পুত্র তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। এই পৃথ্বীরাজের সঙ্গে কনৌজের গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা সংযোগিতার বিবাহ নিয়ে একটি রোমান্টিক কাহিনী চন্দ বরদাই-এর লেখা পৃথ্বীরাজ-রাসো কাব্যে পাওয়া যায়।

১১৭৮ খৃষ্টাব্দে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘূরী মুলতান ও উচ হয়ে গুজরাতের দিকে অগ্রসর হন। তিনি পৃথ্বীরাজের কাছে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়ার জন্য একজন দূত পাঠিয়েছিলেন যার ফলাফল কি হয়েছিল জানা যায় না। অতঃপর মুহম্মদ ঘূরী মারবারের কিরাডু নামক স্থানে হাজির হন এবং সেখানকার সোমেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করেন। তারপর তিনি চাহমানদের অপর একটি শাখাবংশের রাজধানী নাডোল অধিকার করেন। কিন্তু অপর দিকে তাঁর এক বাহিনী চৌলুক্য দ্বিতীয় মূলরাজের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয় এবং এবং এই সংবাদে পৃথ্বীরাজ খুবই পুলকিত হন। কিন্তু মুহম্মদ ঘূরীর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল আরও অনেক পরে।

ইতিমধ্যে পৃথ্বীরাজকে কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রথমে তিনি তাঁর পিতৃব্যপুত্র নাগার্জুনের বিদ্রোহ দমন করেন। ১১৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাদানকদের জয় করেন, এবং ওই বছরেই তিনি জেজকভূক্তি বা বর্তমান বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল কিছুকালের জন্য অধিকার করেন। এ ছাড়া তিনি গুজরাতের চৌলুক্যভীমের (দ্বিতীয়) সঙ্গেও যুদ্ধ করেন।

এদিকে ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে আবু পাহাড়ের নিকট চৌলুক্য দ্বিতীয় মূলরাজের হাতে পরাজয়ের পর মুহম্মদ ঘূরী নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইয়ামিনি বংশের শেষ শাসক খুসরব মালিককে পরাজিত করে গজনী অধিকার করেন, এবং শক্তি সংহত করার পর ভারতের দিকে পুনরায় নজর দেন। তিনি প্রথমেই তবরহিন্দের (সিরহিন্দ) দুর্গ অধিকার করেন যা পৃথ্বীরাজের রাজত্বের এলাকার মধ্যে ছিল। এই সংবাদ পেয়ে পৃথ্বীরাজ মুহম্মদ ঘূরীর বাহিনীকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয় ১১৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বর থেকে ১৪ মাইল দূরে তরইন নামক স্থানে। মুহম্মদ ঘূরী পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পৃথ্বীরাজ তবরহিন্দের দুর্গ পুনরাধিকার করেন।

কিন্তু পরাজিত হয়ে মুহম্মদ ঘূরী নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের দিকে মন দেন এবং একবছরের মধ্যেই তবরহিন্দ পুনরধিকার করেন এবং তরইনের প্রান্তরে আবার পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দের এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। মুহম্মদ ঘূরী হানসী, স্বরস্বতী, কুহরাম, সামানা ও আজমীর জয় করেন।

জৈন গ্রন্থসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হরিরাজ শাকম্ভরীর সিংহাসনে বসেন, কিন্তু হাসান নিজামী লিখেছেন যে মুহম্মদ ঘূরী

পৃথ্বীরাজের এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। আজমীরের বিষয়াদি মিটিয়ে মুহম্মদ ঘূরী দিল্লী অভিযান করেন। দিল্লীর শাসক গোবিন্দরাজ পৃথ্বীরাজের হয়ে দুটি যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তরইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র মুহম্মদ ঘূরীর বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং মুহম্মদ ঘূরী দিল্লীর দায়িত্ব তাঁর সেনাপতি কুতবুদ্দীনের হাতে অর্পণ করে ফিরে যান।

আজমীরের সিংহাসন নিয়ে পৃথ্বীরাজের ভাই হরিরাজের সঙ্গে তাঁর পুত্রের সংঘর্ষ হয়েছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে হরিরাজ ওই সময়ে আজমীরের রাজা ছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই কুতবুদ্দীন আজমীর দখল করে নেন, যার ফলে চাহমান শক্তির চূড়ান্ত পতন ঘটে।

চাহমানদের দ্বিতীয় একটি শাখা রাজত্ব করত রণস্তম্ভপুর বা রণথম্ভোর অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতকে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাজ, এবং তাঁর পুত্র বালহণদেব, ইলতুৎমিশের সামন্ত ছিলেন। কিন্তু বালহণদেব ১২১৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ রণথম্ভোর জয় করেন, কিন্তু ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর চাহমানরা আবার তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বালহণের পরবর্তী রাজারা ছিলেন প্রহ্লাদ, বীর-নারয়ণ, বাগভট, জৈত্রসিংহ ও হম্মীর। জৈত্রসিংহ মণ্ডপ নামক স্থানে (বর্তমান মাণ্ডু) পরমার জয়সিংহকে পরাজিত করেছিলেন। ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীনের হাতে পরাজিত হলেন। ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র হম্মীর রণথোম্ভোরের সিংহাসন লাভ করেন। হম্মীর শাকম্ভরী, সরসপুর, গঢ়মণ্ডল, ধারা, চিত্রকূট, বর্ধমানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান করেন এবং দুবার মালব আক্রমণ করেন। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে জালাউদ্দীন খলজী হম্মীরের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ সামরিক অভিযান করেন। আলালদ্দীন খলজী তাঁর সেনাপতি উলুঘ খানকে হম্মীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, কিন্তু এ অভিযানও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দীন নিজেই যুদ্ধযাত্রা করেন এবং ১৩০১ খৃষ্টাব্দে হম্মীরকে নিহত করে রণথম্ভোর দখল করেন।

চাহমাদের তৃতীয় শাখাটি রাজত্ব করত নাডোলে। একাদশ শতকের গোড়ার দিকে এখানে রাজত্ব করতেন অশ্বপাল যাঁর পুত্র অহিল চৌলুক্য প্রথম ভীমের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। পরবর্তী রাজা অনহীল্ল চৌলুক্য ও তুরুস্কদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন বালপ্রসাদ, জিন্দুরাজ (১০৭৫) পৃথিবীপাল (যিনি চৌলুক্য কর্ণের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন), জোজল্ল

(১০৯০, যিনি অনহিলপাটক কিছুকালের জন্য জয় করেছিলেন), আশারাজ, রত্নপাল, রায়পাল, কটুদেব, আলহণদেব ও কেলহণ (১১৬৩-৯৪)। কেলহণ কামহ্রদ নামক স্থানে চৌলুক্যদের সঙ্গে মুহম্মদ ঘূরীকে প্রতিহত করেছিলেন। যাদব ভিল্লমের আক্রমণও তিনি প্রতিহত করেন। তাঁর পুত্র জয়তসীহের আমলে (১১৯৭) খৃষ্টাব্দে কুতুবুদ্দীন নাডোলের অনেকখানি অংশ দখল করে নেন। পরবর্তী রাজার নাম সামন্তসিংহ, যিনি গোদওয়ার ও শিরোহির একাংশে রাজত্ব করতেন। জয়তসীহের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল জানা যায় না।

চাহমানদের চতুর্থ শাখাটি রাজত্ব করত জাবালিপুর বা জালোরে। নাডোল শাখার কীর্তিপাল এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা যাঁর পুত্র সমরসিংহের লেখমালা থেকে ১১৮২ খৃষ্টাব্দকে তাঁর কাল মনে করা যায়। সমরসিংহের দুই পুত্র—মানবসিংহ এবং উদয়সিংহ। মানবসিংহ থেকে চাহমানদের দেবড়া শাখার উদ্ভব হয়েছিল। সমরসিংহের পরবর্তী রাজা উদয়সিংহ (১২০৫-১২৬২) যাঁর রাজত্ব মান্দোর থেকে সান্‌চোর এবং মল্লনি থেকে গোদওয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ১২২৬ খৃষ্টাব্দে নাডোল জয় করেন এবং লটের চাহমান সিন্ধুরাজকে পরাজিত করেন। ইলতুৎমিশ ১২১১ থেকে ১২১৬-এর মধ্যে কোন সময়ে জালোর দুর্গ জয় করেন, এবং উদয়সিংহ তাঁর সামন্তে পরিণত হন। ইলতুৎমিশের গুজরাত অভিযান কালে তিনি গুজরাতের বাঘেল বীরমদেবকে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন চাচিগ (১২৬২-৭৭), সামন্তসিংহ (১২৭৭-৯৬) এবং কানহড় (১২৯৬-১৩১১)। ১৩১১ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী কানহড়কে পরাস্ত করে জালোর দখল করেন।

চাহমানদের পঞ্চম শাখাটির একটি অংশ রাজত্ব করত সত্যপুর বা সানচোর অঞ্চলে, অপরটি দেবাড়ে। সানচোর ছিল যোধপুরে, দেবাড় ছিল আবুপাহাড় অঞ্চলে। সানচোর শাখার রাজারা ছিলেন বিজয়সিংহ, পার্থসিংহ, সালহ, বিক্রমসিংহ, সংগ্রামসিংহ ও প্রতাপসিংহ। এই বংশটি ১৩৮৭ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। দেবাড় শাখার রাজারা ছিলেন দেবরাজ, লুন্টিগ, তেজসিংহ ও কানহড়। শেষোক্তজন ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

৫ ॥ মধ্যাঞ্চল (১০০০-১৩০০)

মালবের পরমারগণ ঃ মুঞ্জ ও সিন্ধুরাজের অধীনে পরমারদের শক্তি সঞ্চয়ের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সিন্ধুরাজের পুত্র ভোজ ১০০০ খৃঃ

মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে তিনি কলচুরি গাঙ্গেয়দেব ও তাঞ্জোরের রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে একটি চুক্তি করে কল্যাণের চালুক্যবংশীয় জয়সিংহকে পরাজিত করেন। অবশ্য পরে ১০৪২ খৃঃ ওই চালুক্য জয়সিংহের পুত্র প্রথম সোমেশ্বর এর প্রতিশোধ নেন। তিনি মালব আক্রমণ করে ধারা, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করেন ও ভোজকে পলায়ন করতে বাধ্য করেন।

রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে সমঝোতা করে ভোজ গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত আদিনগরের (বর্তমান মুখলিঙ্গম) শাসক ইন্দ্ররথকে পরাস্ত করেন। ১০২০ খৃঃ তিনি শিলাহার কেশিদেবকে পরাজিত করে কোংকন দখল করেন। লাটের চৌলুক্যবংশীয় কীর্তিরাজ তাঁর হাতে পরাজিত হন। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডে অধিকার বিস্তৃত করতে গিয়ে চন্দেল্ল বিদ্যাধরের কাছে পরাজিত হন। তাঁর গোয়ালিয়র দখল করার প্রচেষ্টাও কচ্ছপঘাত কীর্তিরাজ ব্যর্থ করে দেন। শাকম্ভরীর চাহমানদের তিনি পরাস্ত করেছিলেন, কিন্তু নাডোলের চাহমানদের হাতে তিনি নিজেই পরাজিত হন।

ভোজ বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, পরাজিতও হয়েছিলেন বহুবার। তার ফলে এক কোংকণ ভিন্ন আর কোন অঞ্চলই ভোজের আমলে মালবের সঙ্গে কার্যত সংযুক্ত হয়নি। তবে তুর্কো-আফগান আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ভোজের অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ১০০৮ খৃষ্টাব্দেই তিনি গজনীর মাহ্‌মুদের বিরুদ্ধে শাহি-আনন্দপালকে সাহায্য করেছিলেন। ১০১৯ খৃঃ তিনি আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচন পালকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১০৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিজোট গঠন করেছিলেন এবং সাতমাস-কাল লাহোর দুর্গ অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন।

গুজরাতের চৌলুক্যদের সঙ্গে ভোজের সম্পর্ক ভাল ছিল না। চৌলুক্য চামুণ্ডরাজকে তিনি অপমানিত করেছিলেন, ফলে তাঁর দুই পুত্র বল্লভরাজ ও দুর্লভরাজ ভোজের বিপক্ষে চলে গিয়েছিলেন। দুর্লভরাজের উত্তরাধিকারী প্রথম ভীমের আমলে ভোজ চৌলুক্যদের রাজধানী অণহিলপাটক লুঠ করেন, কিন্তু ভীম শেষ পর্যন্ত কলচুরিরাজ কর্ণের সহায়তায় ভোজের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এবং যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ভোজের মৃত্যু হলে ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে মালব চৌলুক্য ও কলচুরিদের হাতে চলে আসে।

কিন্তু ভোজের পুত্র জয়সিংহ চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সহায়তায় চৌলুক্য

ও কলচুরিদের বিতাড়ন করে মালবের সিংহাসন ফিরে পান। কিন্তু ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের দাদা দ্বিতীয় সোমেশ্বর জয়সিংহকে তাঁর সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুগত মনে করে চৌলুক্য কর্ণের সহায়তায় তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করেন। অতঃপর ভোজের ভাই উদয়াদিত্য চাহমান তৃতীয় বিগ্রহরাজের সাহায্যে মালব উদ্ধার করেন। তাঁর দুটি তারিখ লেখমালা থেকে পাওয়া যায় ১০৮০ এবং ১০৮৬। উদয়াদিত্যের দুই পুত্র লক্ষ্মদেব ও নরবর্মা পরপর রাজা হন। তিনি অঙ্গের রাষ্ট্রকূট মথনদেব, কলিঙ্গের অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ, কলচুরি যশঃকর্ণ ও চোল কুলোত্তুঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পাঞ্জাবের শাসক মাহমুদ উজ্জয়িনী আক্রমণ করলে তিনি তাঁকে প্রতিহত করেছিলেন।

উদয়াদিত্যের জগদ্দেব নামে এক পুত্র ছিল, হোয়সলদের লিপিতে যাঁর দিগ্বিজয়ের উল্লেখ আছে, এবং ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে লক্ষ্মদেব ও জগদ্দেব একই ব্যক্তি। পরবর্তী রাজা নরবর্মা ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নরবর্মা চন্দেল্ল সল্লক্ষণবর্মা ও শাকম্ভরীর চাহমান অজয়দেবের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরাজয় হয়েছিল চৌলুক্য জয়সিংহ সিদ্ধরাজের হাতে, এবং তিনি বন্দী হয়েছিলেন। এইসব পরাজয়গুলি পরমারশক্তিকে রীতিমত দুর্বল করেছিল। ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র যশোবর্মা যখন রাজা হন তখন জনৈক বিজয়পাল মালবের অভ্যন্তরে দেওয়াস-এ একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, চন্দেল্ল মদনবর্মা ভিলসা অঞ্চলটি অধিকার করেন এবং ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্য জয়সিংহ সিদ্ধরাজ অবশিষ্ট মালব নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

যশোবর্মার পুত্র জয়বর্মা মালবের কিছুটা চৌলুক্যদের হাত থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন, কিন্তু এবারে কল্যাণের চালুক্য জগদেকমল্ল ও হোয়সল প্রথম নরসিংহ মালব আক্রমণ করেন ও তাঁকে উৎখাত করে জনৈক বল্লালকে সিংহাসনে বসান। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্য কুমার পাল ওই বল্লালকে সিংহাসনচ্যুত করে মালব নিজ রাজ্যের অঙ্গীভূত করে নেন। এরপর কুড়ি বছর মালব গুজরাতের অধীনে থাকে। দ্বাদশ শতকের সপ্তম দশকে জয়বর্মার পুত্র বিন্ধ্যবর্মা চৌলুক্য দ্বিতীয় মূলরাজকে হারিয়ে আবার পিতৃকুলের রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় মালবে পরমাররা বেশ গুছিয়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর পুত্র সুভটবর্মা গুজরাট ও লাটে অভিযান করেন এবং অনহিলপাটক লুণ্ঠন করেন ও সোমনাথ পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু চৌলুক্য

দ্বিতীয় ভীমের সামন্ত শ্রীধর ও মন্ত্রী লবনপ্রসাদের চেষ্টায় তাঁকে ফিরে আসতে হয়। সুভটবর্মা যাদব জৈতুগির হাতেও পরাজিত হয়েছিলেন। ১২১০ সাল নাগাদ সুভটবর্মার পুত্র অর্জুনবর্মা রাজা হন এবং তিনি গুজরাতের শাসক জয়সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যাদব সিংঘণের হাতে পরাজিত হন।

১২১৫ থেকে ১২১৮-র মধ্যে মালবের সিংহাসনে আসেন অর্জুনপালের পুত্র দেবপাল, যাঁর সময় ১২৩৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ মালবে তুর্কী আক্রমণ ঘটে। ইলতুৎমিশ ভিলসা জয় করেন ও উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করেন। কিন্তু এই মুসলিম বিজয় ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তী রাজা দেবপালের পুত্র জৈতুগিদেবের সময় মালবের রাজনৈতিক সংকট অত্যন্ত ঘনীভূত হয়েছিল। যাদবরাজ কৃষ্ণ মালব আক্রমণ করেন। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন বলবন মালবে হানা দেন। এবং একই সময়ে গুজরাতের বাঘেল বীসলদেব ধারা লুণ্ঠন করেন। ১২৫৬ থেকে ১২৭০ পর্যন্ত মালবে রাজত্ব করেন দ্বিতীয় জয়সিংহ যাঁদের সময় রণথম্ভোরের চাহমানরা বারবার মালবে অভিযান করে। পরবর্তী রাজা অর্জুন-বর্মার সময়ে রণথম্ভোরের চাহমান হম্মীর, যাদব রামচন্দ্র ও বাঘেল সারঙ্গদেব মালবে অভিযান করেন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় ভোজের সময়, অর্থাৎ ১২৮৩র পর, চাহমান আক্রমণ ছাড়াও, সুলতান জালালুদ্দীন খলজী মালব লুণ্ঠন করেন। পরবতী রাজা মহ্লকদেবের সময়ে ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী মালব অধিকার করেন।

জেজাকভুক্তির চন্দেল্লগণ ঃ বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লদের অভ্যুত্থানের কাহিনী পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। চন্দেল্লদের রাজত্ব ছিল জেজাকভুক্তি অঞ্চলে যার উত্তর সীমা ছিল আগ্রা থেকে শুরু করে যমুনা নদী বরাবর এলাহাবাদে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত, দক্ষিণ সীমা ছিল বর্তমান জব্বলপুর পর্যন্ত। পশ্চিমে খজুরাহো ও পূর্বে কালঞ্জর জেজাকভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

রাজা ধঙ্গের পর তাঁর পুত্র গণ্ড ১০০২ খৃষ্টাব্দে জেজাকভুক্তির রাজা হন, এবং গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আমলে ১০১৯ ও ১০২২ খৃষ্টাব্দে দুবার গজনীর মাহ্‌মুদ কালঞ্জর আক্রমণ করেন। বিদ্যাধর পরমার ভোজ এবং কলচুরি (ত্রিপুরী শাখার) দ্বিতীয় কোক্কলের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেছিলেন, এবং তাঁর পুত্র বিজয়পাল কলচুরি গাঙ্গেয়দেবকে পরাস্ত করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন দেবেন্দ্রবর্মা (১০৫০) এবং তাঁর ভাই কীর্তিবর্মা (১০৭৩-১০৯০) যিনি গোড়ার

দিকে কলচুরি কর্ণের নিকট পরাজিত হলেও পরে তাঁর সামন্ত গোপালের সাহায্যে কর্ণকে পরাজিত করেন এবং ১০৯০-এর কিছু আগে পাঞ্জাবের মুসলমান শাসনকর্তা মাহ্‌মুদকে পরাস্ত করেন। তাঁর পুত্র সল্লক্ষণবর্মা মালবের পরমার নরবর্মা ও কলচুরি যশঃকর্ণকে পরাজিত করেন, এবং গাহড়বালদের পরাজিত করে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেন।

১১১৭ খৃষ্টাব্দে সল্লক্ষণবর্মার পুত্র জয়বর্মা এবং তারপর সল্লক্ষণবর্মার ভাই পৃথিবীবর্মা রাজা হন। পৃথিবীবর্মার পুত্র মদনবর্মা, যাঁর জানা তারিখগুলি ১১২৯ ও ১১৬৩র মধ্যবর্তী, পরমার যশোবর্মাকে হারিয়ে ভিলসা দখল করেন। চৌলুক্য জয়সিংহ সিদ্ধরাজ জেজাকভুক্তির অন্তর্গত মহোবা আক্রমণ করেন এবং অধিকৃত ভিলসা প্রদেশটি মদনবর্মা তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১১৬৩ থেকে ১২০২ পর্যন্ত রাজত্ব করেন মদনবর্মার পৌত্র পরমর্দী। তিনি ১১৮২ খৃষ্টাব্দে চাহমান পৃথ্বীরাজের হাতে পরাজিত হন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন কালঞ্জর আক্রমণ করলে পরমর্দী অপমানজনক শর্তে সন্ধি করেন, যাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর মন্ত্রী অজয়দেব তাঁকে হত্যা করেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশ্য তিনি জয়লাভ করতে পারে নি। কুতবুদ্দীন কালঞ্জর লুঠ করেন এবং মহোবা অধিকার করেন।

কিন্তু পরমর্দীর পুত্র ত্রৈলোক্যবর্মা (১২০৫-৪১) মুসলিম বাহিনীকে ককড়াদহের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং হৃত সমস্ত এলাকাই উদ্ধার করেন। এছাড়া তিনি কলচুরি বিজয়সিংহকে পরাজিত করে ডাহল-মণ্ডল, অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের বেশ কিছুটা অঞ্চল জয় করেন। কলচুরিদের কয়েকজন সামন্ত তাঁর আমলে চন্দেল্লদের নিকট আনুগত্য পরিবর্তন করেন। ত্রৈলোক্যবর্মার সময় ইলতুৎমিশের সেনাপতি নসরতুদ্দীন তয়সাই কালঞ্জর লুণ্ঠন করেছিলেন। ত্রৈলোক্যবর্মার পুত্র বীরবর্মা, যাঁর জানা তারিখ ১২৫৪, চন্দেল্ল রাজ্যের স্বাভাবিক সীমা মোটামুটি অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন ভোজবর্মা ও হম্মীরবর্মা যাঁর শেষ জানা তারিখ ১৩০৮। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী হম্মীরবর্মা বা তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে দামোহ্ জেলাটি দখল করেন। বুন্দেলখণ্ডের পরবর্তী চন্দেল্লরাজ ছিলেন বীরবর্মা যাঁর উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

ত্রিপুরীর কলচুরিগণ ঃ ডাহল বা জব্বলপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল সমূহে দ্বিতীয় কোক্কল ও তৎপুত্র গাঙ্গেয়দেবের আমলে কলচুরিদের বিশেষভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ঘটে। গাঙ্গেয়দেব, যিনি ১০১৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ক্ষমতায়

এসেছিলেন, পরমার ভোজ ও রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে একটি জোট করে চালুক্য দ্বিতীয় জয়সিংহের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সোমবংশী মহাশিবগুপ্ত যযাতিকে পরাজিত করে কোসলের একাংশ দখল করেন যার ফলে কলচুরিদের রাজ্যের সীমানা কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত হয় এবং কলিঙ্গের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল স্পর্শ করে, যদিও দক্ষিণ-পূর্বে এই প্রসারের সবটাই গাঙ্গেয়-দেবের হাতে হয়নি। পরে তাঁর একদা মিত্র পরমার ভোজের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে এবং ভোজ তাকে পরাস্ত করেন। চন্দেল্ল বিজয়পালের হাতেও তাঁর পরাজয় হয়। উত্তর-পূর্বে তিনি কাশী দখল করেছিলেন ১০২৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ পালবংশীয় প্রথম মহীপালকে পরাস্ত করে। তিনি অঙ্গ বা ভাগলপুর অঞ্চলটিও জয় করেছিলেন। ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের মুসলিম শাসনকর্তা আহমদ নিয়াল-তিগিন কাশী লুণ্ঠন করেন। গাঙ্গেয়দেব তার শোধ নিয়েছিলেন মুসলিম অধিকৃত কাংরা উপত্যকায় আক্রমণ চালিয়ে।

গাঙ্গেয়দেবের পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ, যিনি কর্ণ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, ১০৩৪ থেকে ১০৪২এর মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর লেখমালাসমূহ থেকে জানা যায় যে বারাণসী এবং এলাহাবাদ তাঁর রাজ্যের মধ্যে ছিল, এবং তিনি রাঢ়া বা পশ্চিমবঙ্গ কিছুকালের জন্য জয় করেছিলেন। ১০৩৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে তিনি পশ্চিমদিকে অভিযান করেন এবং কির বা কাংরা অঞ্চলে তুর্কীদের পরাজিত করেন। পূর্বদিকে তিনি দুটি অভিযান চালিয়েছিলেন, একটি পালবংশীর নয়পালের বিরুদ্ধে অপরটি তাঁর পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের বিরুদ্ধে। তাঁর এই অভিযানদুটি সফল হয়নি। নিজকন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ দিয়ে তিনি পালদের সঙ্গে সন্ধি করেন। রাঢ়া বা পশ্চিমবঙ্গের একাংশ তিনি অধিকার করেছিলেন সম্ভবত ওখানকার রাজা রণশূর বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে পরাস্ত করে। বঙ্গ অঞ্চলে তাঁর সঙ্গে জাতবর্মার যুদ্ধ হয়েছিল যাঁকে তিনি পরাস্ত করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। জাতবর্মার সঙ্গে পরে তাঁর এক কন্যা বীরশ্রীর বিবাহ হয়েছিল। ওড্র ও কলিঙ্গের বিরুদ্ধেও কর্ণ সফল হয়েছিলেন। কলিঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গঙ্গ বংশের পঞ্চম বজ্রহস্ত। তিনি চোল রাজাধিরাজকে পরাজিত করে কাঞ্চী দখল করে-ছিলেন। এছাড়া নোড়ম্ববাড়ির পল্লবদের, সালেম জেলার কুঙ্গদের, মালাবার উপকুলের মুরলদের এবং মাদুরার পাণ্ড্যদের তিনি পরাজিত করেছিলেন বলে তাঁর ১০৪৮ খৃষ্টাব্দের রেওয়া-লিপিতে দাবি করা হয়েছে। কুন্তলের চালুক্য প্রথম

সোমেশ্বরকেও তিনি পরাজিত করেছিলেন। ১০৫১ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে কর্ণ চন্দেল্ল কীর্তিবর্মাকে হারিয়ে বুন্দেলখণ্ড দখল করেন, কিন্তু কীর্তিবর্মার সামন্ত গোপাল তাঁকে সেখান থেকে হটিয়ে দেন। অতঃপর গুজরাতের চৌলুক্য প্রথম ভীমের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তাঁরা দুজনে দুদিক থেকে মালব আক্রমণ করেন এবং মালবের রাজা পরমার ভোজ ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে মারা গেলে উভয়ে মালব ভাগাভাগি করে নেন। কিন্তু ভোজের পুত্র জয়সিংহ চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সহায়তায় মালব থেকে চৌলুক্য ও কলচুরি উভয় শক্তিকে উৎখাত করেন। পরে চৌলুক্য ভীমের সঙ্গে কর্ণের বিবাদ বাধে এবং ভীম কর্ণকে পরাজিত করেন। কর্ণ নিকটে ও দূরে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করলেও এলাহাবাদ অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই পাকাপাকিভাবে নিজ রাজ্যে যুক্ত করতে পারেননি। কর্ণ ত্রিকলিঙ্গাধিপতি উপাধি নিয়েছিলেন।

১০৭৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর পুত্র যশঃকর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন যিনি চম্পারণ্য (বর্তমান উত্তর বিহারের চম্পারণ) ও অন্ধ্রের পূর্বী চালুক্য রাজা সপ্তম বিজয়াদিত্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করেছিলেন যার ফলাফল কি হয়েছিল জানা যায় না। তাঁর আমলে চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের ভাই জয়সিংহ ডাহল আক্রমণ করেন ১০৮১ নাগাদ। এছাড়া গাহড়বাল চন্দ্রদেব তাঁদের হাত থেকে এলাহাবাদ ও বারাণসী কেড়ে নেন, পরমার লক্ষ্মদেব ত্রিপুরী লুণ্ঠন করেন। এই সকল আক্রমণ কলচুরিদের শক্তিহীন করে দেয়। যশঃকর্ণের পুত্র গয়াকর্ণের আমলে (১১৫১) চন্দেল্ল মদনবর্মা কলচুরিদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন নরসিংহ ও তাঁর পুত্র জয়সিংহ (১১৫৯-৮০) যিনি চৌলুক্য কুমারপাল ও কুন্তলের রাজাকে (কলচুরি বিজ্জল) পরাজিত করেছিলেন, এবং একটি তুরস্ক আক্রমণ (খুসরব মালিকের নেতৃত্বাধীন), প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর পুত্র বিজয়সিংহের লেখমালাসমূহ থেকে জানা যায় যে তিনি ১২১১ পর্যন্ত বাঘেলখণ্ড ও ডাহলমণ্ডলের উপর অধিকার বজায় রেখেছিলেন। তারপর ওই অঞ্চলগুলি চন্দেল্ল ত্রৈলোক্যবর্মার হাতে চলে যায়। বিজয়সিংহের পুত্রের নাম অজয়সিংহ, যাঁর সম্পর্কে খুব কম কথাই আমাদের জানা আছে।

রতনপুরের কলচুরিগণ : ত্রিপুরীর কলচুরিদের সামন্ত হিসাবে তাদেরই একটি শাখা কলচুরি-অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ উড়িষ্যা সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশে শাসন করত যাদের রাজধানী ছিল বিলাসপুরের নিকটবর্তী রতনপুর যা ওই বংশের তৃতীয় রাজা রত্নের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রত্নের পুত্র পৃথ্বীদেব

১০৭৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র জাজল্লদেবের ১১১৪ খৃষ্টাব্দের একটি লিপি পাওয়া গেছে যিনি রত্নপুরের সীমানা যথেষ্ট বর্ধিত করেছিলেন। ১১২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রত্নদেব রাজা হন যিনি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের একটি আক্রমণ প্রতিহত করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন দ্বিতীয় পৃথ্বীদেব, দ্বিতীয় জাজল্ল, জগদ্দেব, তৃতীয় রত্নদেব, তৃতীয় পৃথ্বীদেব ও প্রতাপমল্ল। শেষোক্তজনের সময়ে কলিঙ্গের গঙ্গ তৃতীয় অনঙ্গভীমের সেনাপতি বিষ্ণু রতনপুরের কলচুরিদের হটিয়ে নিজে রাজা হন এবং এই অঞ্চলে ১২১৮ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

৬॥ পূর্ব ভারত (১০০০-১৩০০)

নেপালঃ একাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত নেপালের রাজনৈতিক ইতিহাস একেবারেই বৈচিত্রহীন, ভারতের রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার সঙ্গে তার কোন যোগই ছিল না। বংশাবলী ও লেখমালাসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে এই সময়ের মধ্যে মোট তিনটি রাজবংশ নেপালে রাজত্ব করেছে—গুণকামদেবের বংশ ১০৪৬ পর্যন্ত, নয়কোটের ঠাকুরিগণ ১২০০ পর্যন্ত ও মল্লগণ ১৩২৬ পর্যন্ত। নয়কোটের ঠাকুরিদের আমলে ১০৭৮ থেকে ১০৯৮ পর্যন্ত ওদেরই আর একটি ভিন্ন শাখার দুইজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন।

আসামঃ সালস্ত বা প্রালম্ভ বংশের শেষ রাজা ত্যাগসিংহ দশম শতকের শেষের দিকে মারা যাবার পর প্রাগজ্যোতিষের সিংহাসনে জনৈক ব্রহ্মপাল নির্বাচিত হন। তাঁর পুত্র রত্নপাল ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করেন। এই বংশের পরবর্তী রাজারা ছিলেন ইন্দ্রপাল, গোপাল, হর্ষপাল ও ধর্মপাল। এঁরা সকলে দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

কামরূপে দ্বাদশ শতকে আমরা একটি রাজবংশের পরিচয় পাই যাঁদের পরপর চারজন রাজত্ব করেছিলেন—ভাস্কর, রায়ারিদেব, উদয়কর্ণ ও বল্লভদেব। শেষোক্তজন সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। ১২০৫ সাল নাগাদ মুহম্মদ বক্তিয়ার খলজী কামরূপে অভিযান করতে গিয়ে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্বোক্ত বল্লভদেব অথবা তাঁর উত্তরাধিকারী কে ছিলেন ঠিক বলা যায় না। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দীন উজবক তুঘ্রিল খান কামরূপে পরাজিত ও নিহত হন। ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ শাহের কামরূপ অভিযানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একাদশ শতকের গোড়ার দিকে ঢেক্করি অঞ্চলে জনৈক মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ রাজত্ব করতেন যিনি গৌড়ের পালদের সামন্ত ছিলেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে শ্রীহট্টে একটি রাজবংশ রাজত্ব করতেন যাঁদের পাঁচজনের নাম পাওয়া গেছে—খরবান, গোকুলদেব, নারায়ণ, কেশবদেব ও ঈশানদেব। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফীরূজ শাহের রাজত্বকালে সিকন্দর খান গাজী শ্রীহট্ট দখল করেন।

ত্রয়োদশ শতকে কাছারিরা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে দিখু থেকে কলঙ্গ পর্যন্ত অঞ্চলে নিজেদের প্রভূত্ব বিস্তৃত করেছিল। কাছাড় জেলা এবং ধানসিরি নদী উপত্যকা তাদের করতলগত ছিল।

অহোমরা পূর্ব-আসামে ১২৫৩ সালে বসতি স্থাপন করে। তাদের নেতারা ছিলেন সুকা-ফা, সুতেউ-ফা, সুবিন-ফা এবং সুখাঙ্গ-ফা। শেষোক্তজন মারা গিয়েছিলেন ১৩৩২ সালে।

মিথিলার কর্ণাটক বংশ : মিথিলায়, অর্থাৎ তীরভূক্তি বা বর্তমান তিরহুত অঞ্চলে, ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কর্ণাটক বংশীয় জনৈক নান্যদেব ক্ষমতায় এসেছিলেন। ইনি পূর্বে পালদের সামন্ত ছিলেন, যিনি সম্ভবত কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ইনি গৌড়ের পালবংশীয় কুমারপাল ও বঙ্গের যাদব শাসক হরিবর্মার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। রাঢ়ের সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেনের কাছে নান্যদেব পরাজিত হয়েছিলেন। নান্যদেবের পরবর্তী রাজারা ছিলেন গঙ্গদেব, নৃসিংহ, রামসিংহ, শক্তিসিংহ, ভূপালসিংহ ও হরিসিংহ। হরিসিংহ ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের একটি আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন ও নেপাল অধিকার করেছিলেন। পরে তিরহুত তুর্কীদের হাতে চলে গেলে হরিসিংহ ও তাঁর বংশধরগণ নেপালে রাজত্ব করেন।

জয়পুরের গুপ্তগণ : বর্তমান মুঙ্গের জেলার কিছুটা অংশ নিয়ে ছিল জয়পুর রাজ্য যেখানে দ্বাদশ শতকে গুপ্ত উপাধিধারী একটি বংশ রাজত্ব করত, যে বংশের পাঁচজন রাজার নাম পাওয়া গেছে : যজ্ঞেশ গুপ্ত, দামোদর গুপ্ত, দেব গুপ্ত, রাজাদিত্য গুপ্ত ও সংগ্রাম গুপ্ত।

পীঠীর সেনগণ : পীঠী রাজ্যটি ছিল গয়া অঞ্চলে যেখানে ত্রয়োদশ শতকে সেন বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন, যাঁদের দুজনের নাম জানা গেছে। এঁরা হচ্ছেন বুদ্ধসেন ও তাঁর পুত্র জয়সেন।

জাপিলের খয়রবাল বংশ : জাপিল রাজ্যটি ছিল সাহাবাদ জেলায়

যেখানে দ্বাদশ শতকে খয়রবাল বংশ রাজত্ব করেছিল। এই বংশের সাধব, রণধ্বল, প্রতাপধ্বল, বিক্রম ও ইন্দ্রধ্বল নামক রাজাদের উল্লেখ পাওয়া গেছে। এঁরা গাহড়বালদের সামন্ত ছিলেন।

বাংলা বিহারের পালবংশ ঃ ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর যখন প্রথম মহীপাল রাজা হন, তখন পালদের রাজত্বের আসল অংশ বাংলাদেশই তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, শুধু দক্ষিণ বিহারের মগধ অঞ্চলেই তারা কায়ক্লেশে টিঁকে আছে। প্রথম মহীপাল এই হতমান অবস্থা থেকে পালদের রক্ষা করেন, এবং উত্তর বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ পুনরায় দখল করেন যা তাঁর বাণগড় লিপি থেকে বোঝা যায়। তবে বাংলাদেশের সব অঞ্চলে তিনি অধিকার পুনঃস্থাপিত করতে পারেন নি। বাংলার বাইরে তিনি অবশ্যই অধিকতর সফল হয়েছিলেন। উত্তর বিহারের অনেকটা অংশ এবং পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত এলাকা তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন।

মহীপালের আমলে বাংলাদেশে রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ ঘটে। রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, বঙ্গালের (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ) গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে পরাজিত করেছিলেন বলে জানা গেছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে মহীপাল বাংলাদেশের একাংশেই মাত্র তাঁর অধিকার স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ১০২৬ থেকে ১০৩৪ এর মধ্যে কলচুরি গাঙ্গেয়দেবের সঙ্গে মহীপালের যুদ্ধ হয় যাতে মহীপাল বারাণসী অঞ্চলটি হারাতে বাধ্য হন।

১০৩৮ খৃষ্টাব্দে মহীপালের মৃত্যুর পর পুত্র নয়পাল সিংহাসনে বসেন যিনি কলচুরি কর্ণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন। কোসলের সোমবংশী রাজা মহাশিব গুপ্ত যযাতির একটি আক্রমণও তিনি প্রতিহত করেন।

১০৫৫ খৃষ্টাব্দে নয়পাল মারা গেলে তাঁর পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজা হন। তাঁর আমলে কলচুরিরাজ কর্ণের আর একটি আক্রমণ ঘটে। কিন্তু বিগ্রহপাল কর্ণকে পরাজিত করেন এবং তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। কর্ণ যে বীরভূম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তার প্রমাণ রামপুরহাটের নিকটবর্তী পাইকোর নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি লিপি, যেখানে চেদিরাজ কর্ণের পরাজিত হবার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য এই পরাজয়টা নয়পালের আমলের না বিগ্রহপালের আমলের তা বলা যায় না। ১০৬৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তৃতীয় বিগ্রহপাল চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন।

পরবর্তী রাজা বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপালের আমলে পালশক্তি আবার বিপন্ন হয়ে ওঠে। গয়া-মণ্ডলের সামন্ত বিশ্বাদিত্য, ঢেক্কারির সামন্ত বিশ্বযোগ প্রভৃতিরা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। এদিকে দ্বিতীয় মহীপালের সঙ্গে তাঁর দুই ভাই দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপালের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই অবস্থার সুযোগে দিব্য নামক জনৈক কৈবর্ত নেতা দ্বিতীয় মহীপালকে নিহত করে বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ দখল করে নেন। পালেরা সমগ্র বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হয়ে তাঁদের বিহারের অংশটুকুর মধ্যেই টিঁকে থাকেন। এখানে প্রথমে শূরপাল রাজত্ব করেন, এবং পরে তাঁর ভাই রামপাল ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে।

এদিকে ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে কৈবর্ত দিব্য বরেন্দ্রীতে রাজত্ব শুরু করেছিলেন। তিনি বিহারে রামপালের এলাকার উপর অভিযান চালিয়েছিলেন বলে প্রকাশ। পূর্ববঙ্গের যাদব বংশের জাতবর্মা দিব্যকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। সে যাই হোক, দিব্য শক্তিমান রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রুদোক এবং তারপর রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হন। ভীমও বিশেষ শক্তিমান ছিলেন যেকথা সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রামচরিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভীমকে শীঘ্রই বিভিন্ন আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর আমলে পরমার লক্ষ্মদেব বরেন্দ্রী আক্রমণ করেন। ওদিকে বিহারে পালবংশীয় রামপাল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। চোদ্দজন সামন্ত ও বন্ধুরাজার সহায়তায় তিনি একটি বাহিনী গঠন করেন। তাঁকে একাজে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন তাঁর মামা অঙ্গের শাসক মথনদেব। এই বাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করে ভীমকে পরাস্ত করে এবং বরেন্দ্রী আবার পালদের অধিকারে আসে।

অতঃপর রামপাল পূর্ববঙ্গের যাদবরাজ হরিবর্মার আনুগত্য আদায় করেন। রামপালের সেনাপতি তিঙ্গ্যদেব কামরূপ দখল করেন। কিন্তু পশ্চিমে রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে রামপাল কনৌজের গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের নিকট পরাজিত হন। এটা ঘটেছিল ১১০০ থেকে ১১০৯ সালের ভিতরে। উড়িষ্যার রাজনীতিতেও রামপাল মাথা গলান এবং অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গকে পরাজিত করে তাঁর নিজের লোক দণ্ডভুক্তির জয়সিংহকে উৎকলের শাসক করে দেন। ১১১২ সালের কিছু আগে অনন্তবর্মা ওই জয়সিংহকে হটিয়ে তাঁর নিজের লোক কর্ণ-কেশরী বা তাঁর পুত্রকে উৎকলের শাসক করে দেন।

১১২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও মাতুল মথনদেব মারা গেলে শোকগ্রস্ত রামপাল মুঙ্গেরে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন দেন। তাঁর পুত্র রাজ্যপালের হাতে

রামপাল তাঁর শেষজীবনে ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যপালের অকাল-মৃত্যু হওয়ায় রামপালের দ্বিতীয় পুত্র কুমারপাল রাজা হন যাঁর সময় বিদ্রোহ করে তাঁদের বহু সামন্ত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন, এবং ক্রমাগত একের পর এক বাইরের আক্রমণ চলেছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিলেন গয়ামণ্ডলের সামন্ত-শাসক বিশ্বাদিত্যের পুত্র যক্ষপাল, মগধের শাসক বর্ণমান ও তাঁর পুত্র রুদ্রমান, মিথিলার নান্যদেব যিনি খোদ কুমারপালকেই যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। এদিকে গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্র ১১২৪ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে পালদের হাত থেকে দিনাপুর পর্যন্ত বিহারী অঞ্চল দখল করে নেন। বল্লভরাম নামক কলচুরিদের এক সামন্তও পালরাজ্যে হানা দিয়েছিলেন। কামরূপে তিঙ্গ্যদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব তিঙ্গ্যদেবকে উৎখাত করে-ছিলেন, কিন্তু মনিবের হাতে কামরূপ অর্পণ না করে তিনি নিজেই সেখানকার রাজা হয়ে বসেন। এদিকে পালদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ গঙ্গাতীরবর্তী হুগলী জেলা পর্যন্ত জয় করেন, এবং তাঁর মিত্র সেনবংশীয় বিজয়-সেন রাঢ়ে রীতিমত ক্ষমতা সঞ্চয় করেন।

১১২৫ খৃষ্টাব্দে কুমারপালের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র তৃতীয় গোপাল ১৪ বছর রাজত্ব করেন। ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তাঁর কাকা, রামপালের কনিষ্ঠপুত্র, মদনপাল রাজা হন। ইনিই পালবংশের শেষ রাজা। ১১৪৬ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে, রাজত্বের সূচনাতেই, মদনপাল গাহড়বাল গোবিন্দ-চন্দ্রের নিকট পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরের অধিকার হারিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি গোবর্ধন নামক এক বিদ্রোহী সামন্তকে দমন করেন। কিন্তু কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ ও সেনবংশীয় বিজয়সেনের সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেননি। কালিন্দী নদীর তীরে তিনি বিজয়-সেনের আক্রমণ প্রথম দিকে প্রতিহত করতে পারলেও শেষরক্ষা করতে পারেন নি। পরাজিত হয়ে তিনি বরেন্দ্রীর অধিকার বিজয়সেনকে দিতে বাধ্য হয়ে-ছিলেন। অতঃপর মদনপাল অঙ্গদেশে চলে আসেন এবং সেখানে ১১৬১ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পালবংশের ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত। গোবিন্দপাল নামক জনৈক 'গৌড়রাজ' যিনি মদনপালের কেউ হলেও হতে পারেন গয়া অঞ্চলে কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন, যিনি ১১৬২ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন কর্তৃক পরাজিত হন।

বঙ্গের যাদবগণঃ চন্দ্রবংশের পতনের পর (যে বংশের শেষ রাজা গোবিন্দ চন্দ্র রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন) বঙ্গাল বা পূর্ববঙ্গে বর্মা উপাধি-

ধারী একটি যাদব বংশ ক্ষমতায় আসে, যে বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বজ্রবর্মা, এবং পরবর্তী রাজারা ছিলেন জাতবর্মা, তাঁর দুই পুত্র হরিবর্মা ও সামলবর্মা, এবং সামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মা যাঁর বেলাব তাম্রশাসন থেকে এই বংশের ইতিকথা জানা যায়। জাতবর্মার সময় কলচুরি কর্ণ বঙ্গাল আক্রমণ করেছিলেন, জয়ী হয়েছিলেন বলেও তিনি দাবি করেছেন। তবে কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর সঙ্গে জাতবর্মার বিবাহ হয়েছিল। কৈবর্ত দিব্য পালদের হটিয়ে বরেন্দ্রী জয় করার পর জাতবর্মা একটি যুদ্ধে দিব্যকে পরাজিত করেন। তিনি অঙ্গদেশের উপরেও প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন বলে প্রকাশ। এছাড়া তিনি কামরূপের রাজাকে যিনি সম্ভবত ছিলেন হর্ষপাল, পরাজিত করেছিলেন। পরবর্তী রাজা হরিবর্মা রামপালের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। তাঁর আমলেই মিথিলার নান্যদেব বঙ্গাল আক্রমণ করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন সামলবর্মা ও তাঁর পুত্র ভোজবর্মা, যিনি বা যাঁর উত্তরাধিকারী দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সেনবংশীয় বিজয়সেনের দ্বারা উৎখাতপ্রাপ্ত হন।

বাংলাদেশের সেনবংশ : সেনবংশীয় রাজারা, যাঁরা নিজেদের কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলতেন, সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের কোনো কন্নড়ভাষী দেশ থেকে এসেছিলেন, এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত সামন্তসেন সম্ভবত পালদের সামন্ত ছিলেন এবং পরে রাঢ় অঞ্চলে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। সামন্তসেন দক্ষিণ ভারতে একটি যুদ্ধ করেছিলেন যা থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে তিনি চালুক্যদের হয়ে চোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, আবার কেউ কেউ বলেন যে কর্ণাট দেশের রাজা চালুক্য জয়সিংহকে হারিয়ে রাজেন্দ্র চোল যখন বাংলাদেশে অভিযান করেন সামন্তসেন তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন বাংলাদেশে কলচুরি আক্রমণের সুযোগে রাঢ় অঞ্চলে নিজের শক্তি আরও বাড়িয়েছিলেন, এবং কৈবর্ত-বিদ্রোহের সময় শূরপাল এবং রামপাল বরেন্দ্রী থেকে পালিয়ে এলে সম্ভবত তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

১০৯৫ খৃষ্টাব্দে হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন রাজা হন। ওদিকে রামপালের মৃত্যুর পর পালশক্তি দুর্বল হয়ে গেলে তিনি গোটা বাংলাদেশটাকেই জয় করার পরিকল্পনা করেন এবং তদনুযায়ী কলিঙ্গের গঙ্গরাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং গঙ্গার পশ্চিম তীর ধরে হুগলী জেলা পর্যন্ত জয় করেন। তিনি পালদের সামন্ত বীর (কোটাটবীর বীরগুণ) ও বর্ধনকে

(কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্ধন) পরাস্ত করেন, এবং গঙ্গার উপর দিয়ে একটি নৌ অভিযান প্রেরণ করেন সম্ভবত গাহড়বাল রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে। ওই অভিযানকালেই তিনি মিথিলা আক্রমণ করেন ও নান্যদেবকে পরাস্ত করেন। অতঃপর তিনি বঙ্গালের যাদবরাজা ভোজবর্মা বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে পরাস্ত করেন এবং মদনপালের হাত থেকে বরেন্দ্রী অধিকার করেন। দেওপারা, বারাকপুর ও পাইকোরে প্রাপ্ত তাঁর লেখমালা সমূহে তাঁর দিগ্বিজয়ের উল্লেখ আছে। তিনি কামরূপের রাজাকেও, যিনি সম্ভবত দিলেন রায়ারিদেব, পরাজিত করেন, এবং অনন্তবমা চোড়গঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাঘবকে পরাজিত করেন। তিনি অরিরাজবৃষভ শংকর উপাধি নেন। তাঁর দুটি রাজধানী ছিল একটি বিক্রমপুর, অপরটি বিজয়পুর (নদীয়া)। কবি উমাপতি ধর তাঁর সভাপতি ছিলেন, বিখ্যাত দেওপারা প্রশস্তি যার রচনা।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন রাজা হন ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি গয়া অঞ্চলের জনৈক গৌড়রাজ গোবিন্দ পালকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব ছিল মূলত বঙ্গ, রাঢ়া, বাগড়ি, বরেন্দ্রী ও মিথিলা নিয়ে, আশেপাশের এলাকাগুলিতেও তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। বল্লাল সেন স্মৃতি ও পুরাণ-বিশারদ ছিলেন। তিনি দানসাগর নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং অদ্ভুতসাগর নামক আর একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন, যা শেষ করেছিলেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন। কথিত আছে তিনি বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই।

১১৭৮ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁর সাতটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় যে পিতা ও পিতামহের অর্জিত রাজ্য তিনি বজায় রেখেছিলেন। ১১৮৩ থেকে ১১৯২-এর মধ্যে কোন সময়ে গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্র পূর্বদিকে তাঁর রাজ্য বোধগয়া পর্যন্ত বিস্তার করেছিলেন লক্ষ্মণ সেন তাঁকে পরাস্ত করে হটিয়ে দেন। আসামেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের লেখমালাসমূহে তাঁকে কাশী ও কলিঙ্গবিজেতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ। এই আক্রমণ চালিয়েছিলেন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী এবং তাতে পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চল লক্ষ্মণ সেনের হাতছাড়া হয়ে যায়। বখতিয়ার খলজী বিজয়লাভ করেছিলেন এটা খুবই সত্য কথা, কিন্তু কিভাবে সেই বিজয় হয়ে-

ছিল সেটা সঠিক জানা যায় না। এই ঘটনার বহু পরে মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজ তাঁর তবকাৎ-ই নাসিরী গ্রন্থে যা লিখেছিলেন তা হচ্ছে এই যে লক্ষ্মণ সেন তখন নদীয়ায় বাস করছিলেন এবং তুর্কী বাহিনী সেদিকে এগিয়ে আসছে এই সংবাদ পেয়ে নদীয়াবাসীরা পলায়ন করতে শুরু করেছিল, কিন্তু লক্ষ্মণ সেন সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। এই বক্তব্যটির মধ্যেই প্রচণ্ড স্ববিরোধ রয়েছে। লক্ষ্মণ সেন নিশ্চয়ই নির্বোধ রাজা ছিলেন না। তুর্কী বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেলে তাঁর সামনে দুটি বিকল্পই ছিল, হয় প্রতিরোধ করা না হয় পলায়ন করা। মিনহাজ-উদ্দীনের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি দুটির কোনটিই করেন নি। এরপর মিনহাজ বলেছেন যে আঠারো জন লোক নিয়ে মুহম্মদ খলজী অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে একেবারে সোজা লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদে ঢুকে যান এবং সেখানে আকস্মিক আক্রমণ চালান। তখন লক্ষ্মণ সেন ভোজনে বসেছিলেন, তিনি তদণ্ডে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে বঙ্গ অভিমুখে পলায়ন করেন। এ বর্ণনায় নাটকীয়তা আছে, তবে কতদূর বিশ্বাস্য বলা শক্ত। তবে বখতিয়ার খলজী নদীয়া ও উত্তরবঙ্গ ১২০২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জয় করেছিলেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেন তার পরেও রাজত্ব করেছেন।

১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন মারা যাবার তাঁর উত্তরাধিকারী হন বিশ্বরূপ সেন। তাঁর লেখমালা থেকে জানা যায় যে তিনি মুসলিমদের পরজিত করে-ছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সম্ভবত লক্ষ্মণাবতীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন আইওয়াজ। বিশ্বরূপ সেন ১৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং তারপর সিংহাসনে আসেন তাঁর ভাই কেশব সেন যিনিও একটি মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করে-ছিলেন বলে তাঁর লেখমালার দাবি করেছেন। তাঁর প্রাতদ্বন্দ্বী ছিলেন মালিক সৈফুদ্দীন (১২৩১-৩৩)। মিনহাজ-উদ্দীন লিখেছেন যে সেনরাজারা পূর্ববঙ্গে ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তারপর বঙ্গের সিংহাসনে কোন এক দেববংশীয় দনুজমাধব দশরথদেব অধিষ্ঠিত হন। এই বংশের কথায় আমরা পরে আসছি।

পট্টিকেরা : ত্রিপুরার ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলে একটি রাজ্য দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বর্তমান ছিল যার রাজধানী ছিল পট্টিকেরা। কয়েকটি বর্মী গ্রন্থে এই রাজ্যের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। ময়নামতী পাহাড়ে প্রাপ্ত একটি লিপি থেকে জানা গেছে যে এখানে ১২০২ থেকে ১২১৯ পর্যন্ত জনৈক হরিকালদেব রণবংকমল্ল রাজত্ব করেছিলেন।

সমতট ও বঙ্গের দেববংশ : সেন রাজাদের পতনের যুগে সমতট ও বঙ্গে দেববংশীয় কয়েকজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে দামোদরের তারিখ পাওয়া গেছে ১২৩৪ ও ১২৪৩ খৃষ্টাব্দ। দামোদরের পিতা ছিলেন বাসুদেব, পিতামহ পুরুষোত্তম, যিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দামোদরে পুত্র দনুজমাধব দশরথদেব সেনদের অবশিষ্ট রাজ্য অধিকার করেছিলেন। তারিখ-ই মুবারক শাহী গ্রন্থে সুলতান বলবনের সঙ্গে এই দনুজমাধব বা দনুজরায়ের সাক্ষাৎকারের কথা আছে। তুঘ্রিলখানের বিরুদ্ধে দনুজ বলবনকে সাহায্য করেছিলেন ১২৮৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। এই বংশের পরবর্তী সংবাদ জানা যায় না। দনুজমাধবের পর সমতট ও বঙ্গ নিশ্চয়ই তুর্কীদের অধীনে এসেছিল।

৭॥ দক্ষিণ ভারত : মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল (১০০-১৩০০)

কল্যাণের পরবর্তী চালুক্যগণ : দ্বিতীয় তৈল কর্তৃক শেষ রাষ্ট্রকূট রাজা দ্বিতীয় কর্কের পরাজয়ের কথা, যা ঘটেছিল ৯৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে, আমরা আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় তৈল বাদামির চালুক্যদের একটি শাখাবংশের অন্তর্গত ছিলেন। রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করার পর তৈল গঙ্গবংশীয় পঞ্চলদেবকে পরাস্ত করেন, মহীশূর পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেন, এবং অতঃপর তিনি দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম দিকে নজর দেন, যেখানে কোংকন অঞ্চলে শিলাহাররা রাজত্ব করত। দক্ষিণ কোংকনের শিলাহার তৃতীয় অবসর অথবা তাঁর পুত্র রট্টরাজ তৈলের বশ্যতা স্বীকার করেন। দেবগিরির (আওরঙ্গাবাদ জেলা) যাদববংশীয় দ্বিতীয় ভিল্লমও তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। তৈল উত্তর-পশ্চিমে লাট অঞ্চলেও একটি অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি মালবের পরমার রাজা মুঞ্জের বিরুদ্ধে ছয়বার ব্যর্থ আক্রমণ চালিয়েছিলেন। সপ্তম বারে তিনি তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করতে সক্ষম হন। তৈলের রাজ্য ছিল দক্ষিণে সিমোগা, চিতলদ্রুগ ও বেলারি জেলাশ্রয়, পশ্চিমে তা ছিল কোংকন পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর রাজত্বকাল ৯৭৩ থেকে ৯৯৭ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় তৈলের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র সত্যাশ্রয় (৯৯৭-১০০৮ খৃঃ) যিনি সিংহাসনে বসেই দুটি পরাজয়ের সম্মুখীন হন। মালবের পরমার সিন্ধুরাজ তাঁকে পরাজিত করে মুঞ্জের কাছ থেকে তৈল কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর দ্বিতীয় পরাজয় হয় ত্রিপুরীর কলচুরিরাজ দ্বিতীয় কোক্কলের কাছে। সত্যাশ্রয় এই পরাজয় দুটির ক্ষোভ মেটান কোংকনের

দুর্বল শিলাহারদের পরাজিত করে। কোংকন থেকে তিনি গুর্জর রাজ্যেও একটি অভিযান চালিয়ে প্রথম মূলরাজের পুত্র চৌলুক্য চামুণ্ডরাজকে পরাস্ত করেন। কিন্তু সত্যাশ্রয়ের সবচেয়ে বড় কীর্তি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজরাজ চোলের আক্রমণ প্রতিরোধ। বিরাট বাহিনী নিয়ে রাজরাজ উত্তরদিকে অভিযান করেছিলেন, এবং চালুক্যরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল জয় করেছিলেন। সত্যাশ্রয়ের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত রাজরাজ চোলকে ফিরে যেতে হয়েছিল। চোলদের পশ্চাদ্ধাবনকালে সত্যাশ্রয় কুর্নুল ও গুন্টুর জেলার উত্তর-সীমা পর্যন্ত এলাকা নিজের অধিকারে এনেছিলেন।

সত্যাশ্রয়ের পর তাঁর ভাই-এর ছেলে পঞ্চম বিক্রমাদিত্য (১০০৮-১০১৪ খৃঃ) রাজা হন যাঁর আমলে উত্তরপূর্বে কোসল অর্থাৎ দক্ষিণ কোসলের কিছু অংশ সোমবংশী দ্বিতীয় ভীমরথ মহাভব গুপ্তের কাছ থেকে চালুক্যদের অধিকারে আসে। পরবর্তী রাজা তাঁর ভাই দ্বিতীয় অয্যণ মাত্র এক বছর রাজত্ব করেন। এর পর রাজা হন তাঁর ছোট ভাই দ্বিতীয় জয়সিংহ (১০১৫-১০৪৩) যাঁর আমলে ১০১৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কলচুরি গাঙ্গেয়দেব, পরমার ভোজ ও রাজেন্দ্র চোল মিলিতভাবে চালুক্যদের আক্রমণ করেন। জয়সিংহ এই শক্তিজোটকে পরাস্ত করেছিলেন বলে দাবি করেছেন, তবে পরমার ভোজ যে উত্তর কোংকন অঞ্চলটি নিজ রাজ্যের এলাকাভুক্ত করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ আছে। রাজেন্দ্র চোল জয়সিংহকে মুসঙ্গির যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়সিংহ চোলদের বিতাড়ন করতে সক্ষম হন এবং তাঁদের অনুসরণ করে গঙ্গবাড়ি এবং চের দেশ পর্যন্ত অগ্রসর হন। ১০২৪ খৃঃ নাগাদ তিনি এবং তাঁর সেনাপতি চবনরস পরমার ভোজকে হারিয়ে দিয়ে কোংকন পুনরুদ্ধার করেন। জয়সিংহের সময়ে চালুক্যদের সামন্তরাও বিদ্রোহী হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা দমন করতে সমর্থ হন।

জয়সিংহের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল (১০৪৩-১০৬৮) যিনি প্রথমেই চোল রাজাধিরাজের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন। চালুক্যরা তিন জায়গায় চোলদের প্রচণ্ড বাধা দেওয়া সত্ত্বেও রাজাধিরাজ শেষ পর্যন্ত বিজয়লাভ করেন, এবং কল্যাণ শহরে প্রবেশ করে চালুক্যদের রাজপ্রসাদ পুড়িয়ে দেন। সোমেশ্বর কোল্লিপ্পাকুই নামক স্থানে আরও একবার চোলবাহিনীর মুখোমুখি হন, কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে আবার রাজাধিরাজ চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন

এবং কৃষ্ণা নদীর তীরে পূণ্ডুর নামক শহরটি লুণ্ঠন করেন। কিন্তু সোমেশ্বরের সেনাপতি, বনবাসীর শাসনকর্তা চামুণ্ডরাজ, চোলদের শেষ পর্যন্ত হটিয়ে দিতে সমর্থ হন। তৃতীয়বার চোল আক্রমণ ঘটে ১০৫১-৫২ সাল থেকে এবং চোলবাহিনী কোল্লপুরম নামক একটি শহর পুরোপুরি ধ্বংস করে। অবশেষে কোপ্পম নামক স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়, এবং সোমেশ্বরের সামন্ত মদরস নিক্ষিপ্ত একটি তীরের আঘাতে চোল রাজাধিরাজ নিহত হন। চোল বাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, কিন্তু মৃত রাজার ভাই দ্বিতীয় রাজেন্দ্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সৈন্যবাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি স্বরাজ্যে ফিরে যান, ফলে পরাজিত হলেও চালুক্যদের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

এরপর সোমেশ্বর চোলদের পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করেন। ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কাঞ্চী দখল করেন এবং সেখানকার চোল শাসক পালিয়ে যান। ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার চোল দেশে অভিযান করেন। ১০৫৯ থেকে ১০৬২-র মধ্যে তিনি তাঁর পুত্র বিক্রমাদিত্য এবং সেনাপতি বলদেবকে নিয়ে আর একবার চোলরাজ্য হানা দেন, কিন্তু এবারে মুড়কারুর যুদ্ধে তিনি চোল বীররাজেন্দ্রের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। এর কিছু কাল পরেই উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয় কুড়াল-শঙ্গমম্ নামক স্থানে। কিন্তু এবারেও বীর রাজেন্দ্র জয়ী হন। ১০৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে সোমেশ্বর বীররাজেন্দ্রের হাতে আবার পরাজিত হন তুঙ্গভদ্রার তীরে মুড্ডুকাকোর নামক স্থানে। কিন্তু এরপরেও সোমেশ্বর কূড়াল-শঙ্গমমে বীররাজেন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান জানান। প্রত্যুত্তরে ১০৬৭ খৃষ্টাব্দে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বীররাজেন্দ্র সেখানে হাজির হন, কিন্তু সোমেশ্বর হাজির না হওয়ায় তিনি তুঙ্গভদ্রার তীরে একটি জয়স্তম্ভ স্থাপন করে চলে আসেন। সোমেশ্বর তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে চোলদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করেছিলেন। ১০৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র বিক্রমাদিত্যের নেতৃত্বে চালুক্যবাহিনী চোলদের রাজধানী গঙ্গইকোণ্ড লুণ্ঠন করতে সমর্থ হয়েছিল।

চোল ছাড়াও প্রথম সোমেশ্বরকে আরও কয়েকটি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। উত্তর কোংকনে শিলাহারদের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া তিনি গুজরাতের চৌলুক্য প্রথম ভীম ও লাটের চৌলুক্য বৎসরাজ বা তাঁর উত্তরাধিকারী ত্রিলোচন পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি মালব আক্রমণ করে মণ্ডপ (মাণ্ডু) উজ্জয়িনী ও ধারা লুণ্ঠন

করেন এবং পরমার ভোজ এই অভিযানের সম্মুখীন হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। পরে ১০৫৫ সালে কলচুরি কর্ণ ও চৌলুক্য ভীম যখন মালব দখল করে নেন, সোমেশ্বর নিজ পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং বিক্রমাদিত্য ভোজের পুত্র জয়সিংহকে মালব উদ্ধার করতে সাহায্য করেন। ১০৪৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সোমেশ্বর কলচুরি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ১০৪৯ সাল নাগাদ তিনি অন্ধ্রের পূর্বী চালুক্য রাজারাজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন, কিন্তু রাজরাজের উত্তরাধিকারী সপ্তম বিজয়াদিত্য তা অস্বীকার করে চোলদের সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন করেন। চোল-চালুক্য যুদ্ধের ধারাবাহিকতার এটাও ছিল একটা বড় কারণ।

সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় সোমেশ্বর (১০৬৮-৭৬) রাজা হয়ে তাঁর ভাই ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন, যিনি তাঁর শ্বশুর চোলরাজ বীররাজেন্দ্রের সহায়তায় চালুক্য সিংহাসন দখল করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বীররাজেন্দ্র ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোমেশ্বর তাঁকে পরাজিত করেন। অতঃপর বিক্রমাদিত্য সোমেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন এবং উভয়ের সদ্ভাব ১০৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বজায় থাকে। দ্বিতীয় সোমেশ্বর গুজরাতের চৌলুক্য কর্ণের সঙ্গে চুক্তি করেন, এবং উভয়ে একত্রে পরমার জয়সিংহকে পরাজিত করে মালব জয় করেন। কিন্তু বেশিদিন তাঁরা মালব হাতে রাখতে পারেননি। চাহমানদের সহায়তায় পরমার উদয়াদিত্য উভয় শক্তিকেই বিতাড়িত করেন।

১০৭৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সোমেশ্বরকে হটিয়ে তাঁর ভাই ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন, যাঁর কীর্তিকলাপ অবলম্বনে বিল্‌হন বিক্রমাংকদেবচরিত রচনা করেছিলেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য নিজের নামে একটি অব্দেরও প্রচলন করেছিলেন। তাঁর ছোট ভাই জয়সিংহ, যিনি বনবাসী, সান্তলিজে এবং কদুরের শাসক ছিলেন, তাঁর রাজত্বের গোড়াতেই, অর্থাৎ ১০৮২-র কিছু পরে, বিদ্রোহ করেন। বিক্রমাদিত্য তাঁকে কৃষ্ণা নদীর তীরে পরাজিত করে বন্দী করেন, কিন্তু পরে তাঁকে মুক্ত করে দেন।

১০৮৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বিক্রমাদিত্য চোলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কাঞ্চী দখল করেন। ১০৯১ থেকে ১০৯৩-র মধ্যে কোন সময়ে তিনি তাঁর সেনাপতি গোবিন্দরসের সহায়তায় বেঙ্গি ধ্বংস করেন, বেলনান্টি প্রথম গোঙ্ককে পরাজিত করেন এবং বীর চোড়ের নিকট থেকে অন্ধ্র অঞ্চল কেড়ে নেন। ১০৯৯ সাল

নাগাদ কুলোত্তুঙ্গ চোল চালুক্যদের কাছ থেকে বেঙ্গি দখল করেন এবং ১১১৭ পর্যন্ত তা নিজ কর্তৃত্বে রাখেন। ১১১৮ থেকে অন্ধ্র আবার বিক্রমাদিত্যের হাতে চলে যায় এবং ১১২৪ পর্যন্ত তা বজায় থাকে।

গঙ্গবাড়ির হোয়সলদের, যাদের রাজ্য বর্তমান হাসান, তুমকুর এবং মহীশূরের কয়েকটি জেলা নিয়ে ছিল এবং রাজধানী ছিল দোরসমুদ্র, সঙ্গে বিক্রমাদিত্য অতঃপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁর বন্ধু পরমার জগদ্দেবকে হোয়সলদের বিরুদ্ধে পাঠান, এবং ক্রমাগত যুদ্ধের পর হোয়সলরা বিক্রমাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই যুদ্ধ ঘটেছিল দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে। গোয়ার কদম্বরাজ বিজয়াদিত্য এই সময়ই বিক্রমাদিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সামন্ত এরমবরজের সিন্দ দ্বিতীয় আচ সেই বিদ্রোহ দমন করেন। দ্বিতীয় আচ পাণ্ড্যরাজ উচ্চঙ্গির বিদ্রোহও দমন করেছিলেন। করহাটকের (বর্তমান সাতরা জেলার করাদ) শিলাহাররাজ ভোজেরও একটি বিদ্রোহ বিক্রমাদিত্য দমন করেন। উত্তরেও বিক্রমাদিত্য অভিযান করেছিলেন এবং সম্ভবত চৌলুক্য কর্ণকে পরাজিত করেছিলেন। এটা ঘটেছিল তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে।

বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেছিলেন ১০৭৬ থেকে ১১২৬ পর্যন্ত। তাঁর রাজত্ব ছিল মোটামুটি দক্ষিণে হাসান, তুমকুর এবং কুড্‌ডাপা জেলাত্রয়, পূর্বে ও দক্ষিণ পূর্বে খম্মেট ও গোদাবরী জেলা ও উত্তরে নর্মদা। কিন্তু তাঁর প্রভাবাধীন এলাকা ছিল বহু বিস্তৃত। বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী, তাঁর পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৬-১১৩৮) হোয়সল বিষ্ণুবর্ধনের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হোয়সলদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। তাঁর সময় দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল ১১৩৪-এর কিছু পূর্বে চালুক্যদের কাছ থেকে অন্ধ্র অঞ্চলটি কেড়ে নেন।

তৃতীয় সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জগদেকমল্ল (১১৩৮-১১৫১) রাজা হয়েই গঙ্গবাড়ির হোয়সলদের এবং গোয়ার কদম্বদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন কিন্তু অনুগত সামন্ত সিন্দ পের্মাড়িদেবের সহায়তায় তা দমন করতে সক্ষম হন। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তিনি হোয়সল নরসিংহের সহায়তায় পরমার জয়সিংহকে পরাজিত করে মালবের সিংহাসন জনৈক বল্লালের হস্তে অর্পণ করেন। ওই সময়ই তিনি লাট লুণ্ঠন করেন এবং গুর্জর রাজা কুমারপালকে পরাস্ত করেন। দক্ষিণে তিনি দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল এবং কলিঙ্গের অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের

বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং নোড়ম্ব-পল্লবদের একটি বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

জগদেকমল্লের উত্তরাধিকারী তৃতীয় তৈল (১১৫১-১১৫৬) চৌলুক্য কুমার-পাল ও চোল দ্বিতীয় কুলোতুঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করলেও কাকতীয় প্রোলের বিদ্রোহ দমন কালে বন্দী হন। অবশ্য কাকতীয়রা পরে তাঁকে ছেড়ে দিলেও আভ্যন্তরীণ আরও বহু বিদ্রোহে চালুক্যরা প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে চালুক্যদেরই সামন্ত কলচুরি বিজ্জল ক্ষমতা দখল করেন ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে। ১১৬৩ সাল পর্যন্ত তৃতীয় তৈল বেঁচে ছিলেন। ততদিন অবশ্য বিজ্জল তাঁর প্রতি একটা আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। কলচুরিরা কল্যাণে রাজত্ব করে ২৫ বছর ১১৫৬ থেকে ১১৮১ পর্যন্ত। শেষ চালুক্য রাজা তৃতীয় তৈলের পুত্র চতুর্থ সোমেশ্বর ১১৮১ থেকে ১১৮৯ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে, কিন্তু যাদব ভিল্লমের হাতে পরাজিত হয়ে গোয়ার কদম্বদের আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করাই তাঁর নিয়তি ছিল।

কল্যাণের কলচুরিগণ ঃ চালুক্য তৃতীয় তৈলের আমলে বিজ্জল কর্তৃক ক্ষমতা দখলের কথা আমরা একটু আগেই বলেছি। বিজ্জল ছিলেন কলচুরিদের বহু শাখার একটির বংশধর যারা চালুক্যদের সামন্ত ছিল। ১১৫৬তে ক্ষমতা দখল ও ১১৬০ এ কল্যাণ অধিকার করার পর বিজ্জল হোয়সল প্রথম নরসিংহকে তুঙ্গভদ্রার তীরে পরাজিত করেন। এ ছাড়া তিনি মালাবার উপকূলে চেরদের বিরুদ্ধে, পাণ্ড্যরাজ বিজয় পাণ্ড্যের বিরুদ্ধে, চোল দ্বিতীয় রাজরাজ, অন্ধ্রের বেলনান্টি রাজেন্দ্র চোড়, কলিঙ্গের গঙ্গ রাঘব প্রভৃতির বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করেন এবং উত্তরেও চৌলুক্য কুমার পাল ও কলচুরি জয়সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, তাঁর মন্ত্রী বসব, যিনি বীর শৈব ধর্মমতের প্রবক্তা, তাঁর হাতে উৎপীড়িত হন যার প্রতিবাদে বসবের কয়েকজন অনুগামী বিজ্জলকে হত্যা করে। বিষয়টি বিতর্কমূলক।

বিজ্জলের পর তাঁর প্রথম পুত্র সোমেশ্বর ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা হন, যিনি ১১৭২ এর পূর্বে চোল, গুর্জর ও লাট দেশের রাজাদের পরাস্ত করেছিলেন বলে প্রকাশ। ১১৭৭-এর কিছু পরে তাঁর ভাই শংকম সিংহাসনে বসেন। তিনিও অন্ধ্রের বেলনান্টি দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোড়, চোল দ্বিতীয় রাজরাজ, হোয়সল দ্বিতীয় বল্লাল ও চৌলুক্য দ্বিতীয় ভীমকে পরাস্ত করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। ১১৮০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বিজ্জলের তৃতীয় পুত্র আহবমল্ল রাজা হন, এবং তিনিও

অন্ধ্রের বেলনাটি তৃতীয় গোঙ্ক, চোল তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ, হোয়সল দ্বিতীয় বল্লাল, গোয়ার কদম্ব বিজয়াদিত্য, উত্তর কোংকনের শিলাহার দ্বিতীয় অপরাদিত্য এবং মালবের পরমার বিন্ধ্যবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। ১১৮১ সালে পূর্ববর্তী কল্যাণের চালুক্যবংশের শেষ রাজা, তৃতীয় তৈলের পুত্র চতুর্থ সোমেশ্বর, কল্যাণসহ চালুক্যদের অধিকাংশ প্রাক্তন এলাকা আহবমল্লের কাছ থেকে দখল করে নেন, শুধু বেলবোলা ও বনবাসি কলচুরিদের হাতে থাকে। পরবর্তী কলচুরি রাজা, আহবমল্লের ছোট ভাই সিংঘন বেলবোলা ও ও বনবাসি চতুর্থ সোমেশ্বরের হাতে অর্পণ করে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন।

কোংকনের শিলাহারগণ ঃ শিলাহারদের তিনটি শাখার সন্ধান পাওয়া গেছে যারা উত্তর কোংকন, দক্ষিণ কোংকন এবং দক্ষিণ মারাঠা দেশে (কোলহাপুর, মিরাজ এবং করহাদ জেলাত্রয়ে) রাজত্ব করত, যারা মাঝে মাঝে প্রথমে রাষ্ট্রকূট ও পরে চালুক্যদের অধীনতা মানতে বাধ্য হত। দশম শতকে দক্ষিণ মারাঠা দেশে শিলাহার শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন জনৈক জতিক। ১০৫৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ শিলাহারদের এই শাখা দক্ষিণ কোংকন জয় করে। দ্বাদশ শতকে গণ্ডরাদিত্য এবং তাঁর পুত্র বিজয়াদিত্য ক্ষমতা সঞ্চয় করেন। বিজয়াদিত্য কলচুরি বিজ্জলকে ক্ষমতালাভে সহায়তা করেন। পরে কল্যাণের এই কলচুরিদের সঙ্গে বিজয়াদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় ভোজের সংঘর্ষ হয়, কিন্তু শিলাহারা তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখে। পরবর্তীকালে যাদবদের হাতে তাদের পতন ঘটে।

দেবগিরির যাদবগণ ঃ দেবগিরির যাদবগণ প্রথমে মান্যখেটের রাষ্ট্রকূট ও পরে কল্যাণের চালুক্যদের সামন্ত হিসাবে খান্দেশ, নাসিক ও আহমদনগর জেলা অঞ্চলে রাজত্ব করত। নবম শতকের গোড়ার দিকে সুবাহুর পুত্র দৃধপ্রহার নাসিক জেলার চান্দোরে নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র সেউনচন্দ্রের উত্তরাধিকারীরা নিজেদের সেবুন বলতেন, এবং ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশের ভিল্লম সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন কল্যাণের শেষ চালুক্য রাজা চতুর্থ সোমেশ্বরকে পরাজিত করে। কার্যত বর্তমান মহারাষ্ট্রের অনেকটা এলাকা জুড়েই যাদবদের রাজত্ব ছিল, এবং ভিল্লমই ছিলেন প্রথম স্বাধীন রাজা যিনি দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

ভিল্লম রাজা হয়েই হোয়সলদের রাজধানী দোরসমুদ্রে একটি সামরিক অভিযান করেন এবং হোয়সলরাজ দ্বিতীয় বল্লালকে পরাজিত করেন। তাঁর

এই অভিযানকালে তিনি চোল তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গকেও পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু ১১৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হোয়সলরাজ দ্বিতীয় বল্লালের হাতে শোচনীয়-ভাবে পরাজিত হন। ভিল্লম উত্তরাঞ্চলেও অভিযান করেছিলেন। তিনি পরমার বিন্ধ্যবর্মা এবং গুর্জর দ্বিতীয় ভীমকে পরাজিত করে নাডোল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু নাডোলের চাহমান রাজা কেলহণ তাঁকে পরাজিত করেন যার ফলে তিনি স্বরাজ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে হোয়সল দ্বিতীয় বল্লাল দেবগিরি অভিযান করেন, এবং হঙ্গল, গুত্তি ও রট্টপল্লি দখল করে যাদব সেনাপতি জৈত্র সিংহকে পরাস্ত করে লোক্কুণ্ডির দুর্গ অধিকার করেন। এরপর তিনি যাদবদের তাড়া করে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল ১১৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে।

ভিল্লম মারা যান ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তার দু বছর আগেই তিনি তাঁর পুত্র জৈতুগির হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেছিলেন। নিজ রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের উপর হোয়সলরা দ্বিতীয় বল্লালের নেতৃত্বে যে অধিকার স্থাপন করেছিল জৈতুগি সেখান থেকে তাদের উৎখাত করার প্রবল চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন (১১৯৫)। কিন্তু বরঙ্গলের কাকতীয় মহাদেবের বিরুদ্ধে তিনি সফল হন, এবং কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গ ভীম ও চোল তৃতীয় কুলোতুঙ্গকে পরাজিত করেছিলেন। পিতার মত জৈতুগিও উত্তরে অভিযান করে পরমার সুভটবর্মা ও চৌলুক্য দ্বিতীয় ভীমের রাজ্য লুণ্ঠন করেছিলেন, এবং ওই উত্তর অভিযানকালেই গুজরাত অঞ্চলে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কুতউদ্দীন আইবকের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়।

১২০০ খৃষ্টাব্দে জৈতুগির পুত্র সিংঘন রাজা হন, এবং ১২১১ খৃষ্টাব্দে তিনি হোয়সল দ্বিতীয় বল্লালের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক অভিযান চালান। ১২১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বনবাসি এবং সান্তলিজে দখল করে তুঙ্গ নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। অতঃপর তিনি দোরসমুদ্র অভিমুখে অভিযান করেন এবং কাবেরীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, এবং তুঙ্গ নদীর উত্তর দিক পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্দিষ্ট হয়। এছাড়া তিনি দক্ষিণের বহু সামন্ত শক্তিকেও নিজের অধীন করেছিলেন। গোয়ার কদম্ব রাজা ত্রিভুবন-মল্ল এবং বেলগাঁওয়ের রট্টবংশের চতুর্থ কার্তবীর্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সিংঘন শিলাহারদের কোলহাপুর শাখার উচ্ছেদ ঘটান। বরঙ্গলেও তিনি প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেন, কিন্তু কাকতীয় গণপতি তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

এর পর সিংঘণ উত্তরদিকে নজর দেন। তাঁর সময়ে লাট অঞ্চল পরমার অর্জুনবর্মার অধীনে এসেছিল এবং পরমারদের সামন্ত সিন্ধুরাজ সেখানে শাসন করতেন। সিংঘণ সিন্ধুরাজকে পরাস্ত করে গুর্জরদেশ অভিমুখে অভিযান করেন। বাঘেল বংশীয় লবণপ্রসাদ তখন গুর্জরদেশের কার্যত শাসক ছিলেন কিন্তু যাদবদের বাধা দেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। এরপর তিনি দুবার লাটের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান এবং সেখানকার শাসক সিন্ধুরাজের পুত্র শংখকে বন্দী করেন। পরে তিনি শংখকে মুক্তি দিয়ে নিজের অনুগত করে নেন। গুজরাতের বিরুদ্ধেও তিনি আরও দুটি অভিযান চালিয়েছিলেন। ১২২১ এবং ১২২৯ এর মধ্যে কোন সময় তিনি গুজরাতের বিরুদ্ধে লাটের শাসক শংখ, পরমার দেবপাল প্রভৃতিকে নিয়ে একটি শক্তিজোট গঠন করেন। ওদিকে তুর্কী বাহিনীর গুজরাতের উত্তরদিকে অভিযানের সংবাদ পেয়ে গুজরাতের বাঘেলরাজ বীর ধবল তা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যান, এবং তাঁর মন্ত্রী বস্তুপাল কৌশলে সিংঘণের শিবিরে ভেদ ঘটান, যাতে বিরক্ত হয়ে সিংঘণ গুজরাত দখলের পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। পরে তিনি আর একবার গুজরাত অভিযান করেছিলেন কিন্তু বাঘেল বীসলদেব তা ব্যর্থ করে দেন। এই সময়ে (১২৩৩-৩৪) সম্ভবত ইলতুৎমিশের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়।

১২৪৭ খৃষ্টাব্দে সিংঘণের মৃত্যু হলে তাঁর পৌত্র কৃষ্ণ রাজা হন যিনি হোয়সল-রাজ সোমেশ্বরের কাছ থেকে কোগালি পরগণাটি দখল করেন। কোংকনের শিলাহারদের ও নোঢ়ম্ববাড়ির পাণ্ড্যদেরও তিনি বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। পূর্বে তিনি দক্ষিণ কোসলেও একটি অভিযান করেছিলেন এবং বিলাসপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি গুজরাতের বাঘেল ও মালবের পরমারদের বিরুদ্ধেও কিছু সাফল্য অর্জন করেন এবং ১২৫০ নাগাদ মালবেই সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন বলবনের একটি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সিমোগা, চিতলদ্রুগ, বেলারি, ধারওয়ার ও বেলগাঁও জেলায় কৃষ্ণের বহু লেখমালা পাওয়া গেছে যা থেকে মনে হয় তিনি পিতৃপুরুষের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

১২৬১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই মহাদেব রাজা হয়ে উত্তর কোংকণের শিলাহার, গুজরাতের বাঘেল, মালবের পরমার, বরঙ্গলের কাকতীয় ও দোরসমুদ্রের হোয়সলদের বিরুদ্ধে পূর্বপুরুষদের শত্রুতার নীতিই বজায় রাখেন। হোয়সলদের বিরুদ্ধে তিনি একটি নিষ্ফল অভিযান চালিয়েছিলেন। তবে বাঘেল বীসলদেবকে তিনি পরাস্ত করেছিলেদ, তাছাড়া শিলাহারদের

একেবারে উচ্ছেদ করে পাকাপাকিভাবে উত্তর কোংকণ নিজ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার কৃতিত্বও তাঁর।

১২৭১-৭১ খৃষ্টাব্দে মহাদেবের মৃত্যু হলে যাদবদের মধ্যে একটি গৃহযুদ্ধ শুরু হয় যাতে তাঁর ভাইপো, কৃষ্ণের পুত্র, রামচন্দ্র বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা দখল করেন। হোয়সলের বিরুদ্ধে রামচন্দ্র একটি সর্বাত্মক অভিযান করেন, কিন্তু হোয়সলদের রাজধানী দোরসমুদ্র বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত রামচন্দ্রকে পরাজিত হয়ে শূন্য হস্তে ফিরতে হয়। এরপর তিনি গুজরাত অভিযান করেন কিন্তু বাঘেল সারঙ্গদেবের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী দেবগিরি আক্রমণ করে রামচন্দ্রকে পরাজিত করেন। তাঁর পুত্র শংকরদেবও আলাউদ্দীনের হাতে পরাজিত হন। এই দুটি পরাজয়ের ফলে যাদবদের বহু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। দেবগিরির যাদবদের এই দুর্বলতার সুযোগে বরঙ্গলের কাকতীয় প্রতাপ রুদ্র মেদক এবং রায়চুর পর্যন্ত অঞ্চল জয় করে নেন। ১৩০৩ ও ১৩০৫ সালে হোয়সল তৃতীয় বল্লাল যাদবদের কাছ থেকে বনবাসি সান্তলিজে ও কোগলি দখল করে নেন। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করে রামচন্দ্রকে বন্দী করেন। দিল্লীতে ছয় মাস বন্দী থাকার পর আলাউদ্দীন তাঁকে মুক্ত করে দেন এবং তিনি দেবগিরিতে আবার আলাউদ্দীনের সামন্ত হিসাবে ফিরে আসেন। ১৩০৮খৃষ্টাব্দে যখন মালিক কাফুর তেলেঙ্গনা এবং ১৩১১ খৃষ্টাব্দে দোরসমুদ্র আক্রমণ করেন রামচন্দ্র তাঁকে সাহায্য করেন।

১৩১১ সালে রামচন্দ্রের পুত্র শংকরদেব রাজা হয়ে দিল্লীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন, এবং আলাউদ্দীন খলজীর নির্দেশে মালিক কাফুর তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে দেবগিরি দখল করে নেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর দিল্লীতে গোলযোগের সুযোগে শংকরদেবের জামাতা হরপালদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৩১৭ সালে আলাউদ্দীনের উত্তরাধিকারী মুবারক পুনরায় দেবগিরি দখল করে নেন।

৮॥ দক্ষিণ ভারত : পূর্বাঞ্চল (১০০০-১৩০০ খৃঃ)

কাকতীয়গণ : কাকতীয়দের রাজ্য ছিল গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী বর্তমান অন্ধ্র ও তেলেঙ্গনা অঞ্চল, এবং রাজধানী ছিল বরঙ্গল, অবশ্য তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এই সীমার মাঝে মাঝে পরিবর্তন ঘটেছে। ১১২৬ থেকে ১১৫৮

এর মধ্যে কাকতীয় দ্বিতীয় প্রোল কল্যাণের চালুক্যদের অধীনতা ছিন্ন করে বরঙ্গলে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পূর্ববর্তীরা ছিলেন প্রথম বেত, প্রথম প্রোল ও দ্বিতীয় বেত। এঁরা সকলেই চালুক্যদের সামন্ত ছিলেন। দ্বিতীয় প্রোলের পুত্র প্রথম রুদ্র ১১৬২ খৃষ্টাব্দে চালুক্য তৃতীয় তৈলকে পরাজিত করেন এবং বেলনাটিদের কাছ থেকে কুর্ণুল জেলাটি দখল করেন। ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে রুদ্রের ভাই মহাদেবের রাজত্বকালে কাকতীয়রা দেবগিরির যাদবরাজ জৈতুগির হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং সাময়িকভাবে কাকতীয়রা যাদবদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মহাদেবের পুত্র গণপতি রাজা হয়ে বেলনাটিদের উচ্ছেদ করে গোদাবরী নদীর পশ্চিমাঞ্চল দখল করেন এবং গঙ্গ রাজা তৃতীয় অনঙ্গ ভীমকে পরাজিত করে গোদাবরী নদীর পূর্ব তীরের গোদাবরী জেলাটি দখল করেন। নেল্লোর ও কাঞ্চীও তাঁর অধিকৃত হয়। অমরাবতীর কোটগণ, গুন্টুরের তেলুগু-চোড়গণ এবং কৃষ্ণা জেলার নাথবাড়িগণ তাঁর অধীনতা মেনে নেয়। যাদব সিংঘনের সঙ্গে গণপতির সংঘর্ষ হয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলাফল জানা যায় না। ১২৫০ সাল নাগাদ গণপতি মাদুরার জটাবর্মা সুন্দর পাণ্ডের কাছে পরাজিত হয়ে কাঞ্চী ও নেল্লোর হারান।

গণপতির মৃত্যুর পর, ১২৬১-র কিছু পরে, তাঁর কন্যা রুদ্রাম্বা ক্ষমতায় আসেন। তিনি যাদব মহাদেবের হাতে পরাজিত হন, এবং কাকতীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সামন্তরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে। কিন্তু পরবর্তী রাজা প্রতাপ রুদ্র, যিনি রুদ্রাম্বার পালিত পুত্র ছিলেন, কাকতীয়দের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর সময়ে ১৩০৯-১০ সালে আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর বরঙ্গল আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনী চলে যাবার পর তিনি পুনরায় দক্ষিণে বিস্তৃত এলাকায় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। উত্তরে গোদাবরী থেকে দক্ষিণে ত্রিচিনোপোলি, এবং মেদক জেলা থেকে পূর্বে সমুদ্র পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ১৩২২ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র উলুঘ খান তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এর পরেও তিনি রাজত্ব করেছিলেন, কেননা, ১৩২৬ খৃষ্টাব্দের তাঁর একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে গুন্টুর জেলায় যা তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। তাঁর উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

পূর্বী চালুক্যগণ ঃ অন্ধ্র অঞ্চলে পূর্বী চালুক্যদেরও একটি রাজত্ব ছিল।

এঁদের রাজধানী ছিল বেঙ্গী। ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে এই বংশের দানার্ণবের পুত্র প্রথম শক্তিবর্মা তাঞ্জোরের চোলদের মিত্রশক্তি হিসাবে শাসন শুরু করেছিলেন। ১০১১ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভাই বিমলাদিত্য রাজা হন। তাঁর দুই পত্নীই ছিলেন চোল রাজকুমারী, একজনের গর্ভে জন্মান রাজরাজ, অপরজনের গর্ভে বিজয়াদিত্য। ১০২২ খৃষ্টাব্দে রাজরাজ রাজা হবার পর বিজয়াদিত্য বিদ্রোহ করে ১০৩০ নাগাদ বিশাখপতনম জেলায় একটি ক্ষুদ্র পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন। রাজরাজ তাঁর মাতুল বিখ্যাত প্রথম রাজেন্দ্র চোলের কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং এঁর গর্ভে জন্মান দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল যিনি প্রথম কুলোত্তুঙ্গ চোল নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ। এই কুলোত্তুঙ্গ, যিনি খোদ চোলরাজ্যে তাঁর দিদিমার কাছে (প্রথম রাজেন্দ্র চোলের পত্নী) মানুষ হয়েছিলেন, পরে চোল সিংহাসন লাভ করেন।

রাজরাজ ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই বিজয়াদিত্য কর্তৃক বিতাড়িত হন, কিন্তু বিজয়াদিত্য বেঙ্গীর রাজা হবার পরেই কল্যাণের চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ও পরমার জয়সিংহের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁকে রক্ষা করেন চোলরাজ বীর রাজেন্দ্র। কিন্তু বীররাজেন্দ্রের মৃত্যুর পর নূতন চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ, যিনি বিজয়াদিত্যের দাদা রাজরাজের পুত্র তাঁর রাজত্ব দাবি করে বসেন। ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গী কলচুরি যশঃকর্ণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় যাতে বিজয়াদিত্য রীতিমত হীনবল হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে তিনি কুলোত্তুঙ্গের দাবি মেনে নেন। ১০৭৬ সালে কুলোত্তুঙ্গ অন্ধ্র এলাকাটি চোল রাজত্বের অঙ্গীভূত করে নেন।

পূর্বী গঙ্গগণ : অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ পর্যন্ত পূর্বী গঙ্গ রাজবংশের সংবাদ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গের রাজা হবার পর তাঁকে চোলরাজ প্রথম কুলোত্তুঙ্গের আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত হতে হয়। চোলরা বিশাখপতনম জয় করে নেয় এবং উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত গোটা কলিঙ্গ দেশটাই তাদের হস্তগত হয়। কিন্তু অনন্তবর্মা ১০৯০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বিশাখপতনমসহ হারানো রাজ্য চোলদের হাত থেকে পুনরায় দখল করে নেন। ১১২৬ সালে কল্যাণের চালুক্য-রাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইলে তিনি গোদাবরী পর্যন্ত অন্ধ্র অঞ্চল দখল করে নেন, কিন্তু ১১৩৪-এর কিছু আগে দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল গোদাবরী জেলাটি গঙ্গদের কাছ থেকে কেড়ে নেন।

পূর্বদিকে অনন্তবর্মা পালবংশীয় রাজা রামপালের মনোনীত উৎকলের

রাজাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের লোক কর্ণকেশরীকে সেখানকার সিংহাসনে বসান। ১১১৮ খৃষ্টাব্দের আগেই তিনি সমগ্র উড়িষ্যায় কর্তৃত্ব স্থাপন করে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি আখ্যা নিয়েছিলেন। বাংলার পাল শাসনের অবক্ষয়ের যুগে তিনি বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন এবং হুগলী জেলার আরামবাগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। রাঢ়ের সামন্ত বিজয়সেন, যিনি পরে সেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হয়েছিলেন, তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর অধিকতর দিগ্বিজয় রতনপুরের কলচুরি দ্বিতীয় রত্নদেব ও মালবের পরমার লক্ষ্মদেবের দ্বারা ব্যাহত হয়।

অনন্তবর্মার পর তাঁর পুত্রগণ—কামার্ণব (১১৪৮-৫৫), রাঘব (১১৫৫-৭০), দ্বিতীয় রাজরাজ (১১৭০-৯২) ও দ্বিতীয় অনঙ্গ ভীম (১১৯২) যথাক্রমে রাজত্ব করেন। রাঘবের রাজত্বকালে বিজয়সেন বাংলাদেশ থেকে গঙ্গদের বিতাড়ন করেন। অনঙ্গ ভীমের উত্তরাধিকারী তৃতীয় রাজরাজের সময় উড়িষ্যার জাজনগরে তুর্কী আক্রমণ ঘটে, কিন্তু বখতিয়ার খলজীর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে তাদের উড়িষ্যা আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তৃতীয় রাজরাজ বেলনাণ্টিদের কাছ থেকে গোদাবরী জেলার কিছুটা অঞ্চল জয় করেছিলেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় অনঙ্গ ভীমের আমলে (১২১৬-৩৮) বাংলার তুর্কী শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দীন আইওয়াজ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন কিন্তু অনঙ্গ ভীম তা ব্যর্থ করে দেন। তবে অনঙ্গ ভীম দক্ষিণের কাকতীয় গণপতির কাছে পরাজিত হয়ে গোদাবরী জেলার উপর তাঁর অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অনঙ্গ ভীমের উত্তরাধিকারী প্রথম নরসিংহ ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় ভারতীয় রাজাদের একজন যাঁরা তুর্কীদের সঙ্গে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করে'ছলেন। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তিনি তুগ্রিল খানকে পরাজিত করে রাঢ় অঞ্চলকে তুর্কী প্রভাব মুক্ত করেন, এবং ১২৪৫-এর মধ্যে তিনি বরেন্দ্র অভিযান করে লক্ষ্মণাবতী পর্যন্ত অগ্রসর হন। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের পরবর্তী তুর্কী শাসক উজবক রাঢ় উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারেও তিনি নরসিংহের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অবশ্য ১২৫৫ সালে উজবক রাঢ় উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

১২৬৪ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ মারা যান। কোণারকের সূর্যমন্দির তাঁরই সৃষ্টি। নরসিংহের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন তাঁর পুত্র প্রথম ভানুদেব (১২৬৪-৭৯) এবং ভানুদেবের পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহ (১২৭৯-১৩০৬)।

সোমবংশীগণ ঃ প্রথম যযাতি মহাশিবগুপ্ত পর্যন্ত কোসলের সোম-

বংশীদের কথা আগে উল্লেখ করেছি, যাঁর পুত্র দ্বিতীয় ভীমরথ মহাভব গুপ্ত একাদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ধর্মরথ দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্ত (১০১৫-২০) এবং নহুষ তৃতীয় মহাভব গুপ্তের (১০২০-২৫) পর রাজা হন চণ্ডীহর যযাতি তৃতীয় মহাশিব গুপ্ত (১০২৫-৫৫) যিনি বিশৃংখল ও শত্রুদের দ্বারা পর্যুদস্ত কোসল ও উৎকলকে (ওড্র) মুক্ত করেন বলে লেখমালা সমূহে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর পুত্র উদ্দ্যোতকেশরী চতুর্থ মহাভব গুপ্তের (১০৫৫-৮০) ভুবনেশ্বর লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি ডাহল, ওড্র ও গৌড়ের রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সমকালীন ছিলেন, এবং তাঁর বংশধরগণ গঙ্গদের সামন্ত হিসাবেই রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশেরই কর্ণকেশরী বাংলার পালরাজা রামপাল কর্তৃক উৎখাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ রামপালের লোক জয়সিংহকে হটিয়ে দিয়ে কর্ণকেশরীকে আবার উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সোমবংশীদের আরও কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া গেছে। রতনপুরের কলচুরিগণ, যাঁদের কথা আগে বলা হয়েছে, সোমবংশীদের এলাকাসমূহের উপরেই প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন।

ক্ষুদ্র শক্তিসমূহ : বস্তার অঞ্চলে ছিন্দুক-নাগদের (যারা কন্নরদেশের সিন্দদের সঙ্গে সম্পর্কিত) কয়েকজন শাসকের নাম বিভিন্ন লেখমালায় পাওয়া গেছে যাঁরা একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন নৃপতিভূষণ, ধারাবর্ষ, মধুরান্তক, সোমেশ্বর, কনহর, রাজভূষণ দ্বিতীয় সোমেশ্বর, জগদেকভূষণ নরসিংহ, জয়সিংহ ও হরিশ্চন্দ্র।

তেলুগু-চোড়গণ, যারা আসল চোলদের একটি শাখা, একাদশ-দ্বাদশ শতকে রাজত্ব করত কুড্‌ডাপা, কুর্ণুল ও অনন্তপুর জেলায়। এদের শাসকদের প্রাপ্ত নাম চল্লম, যশোরাজ, সোমেশ্বর, চন্দ্রাদিত্য, যশোরাজ (২য়), সোমেশ্বর (২য়), ধারল্ল ও সোমেশ্বর (৩য়)। বস্তার এবং দক্ষিণ কোসলেও এদের শাখা-বংশের সন্ধান পাওয়া গেছে।

দ্বাদশ শতকে শাসন করেছে, রাষ্ট্রকূটদের এমন একটি বংশের পরিচয় সম্বলপুর থেকে পাওয়া গেছে। গঞ্জাম জেলায় তৈলপবংশী নামক একটি রাজ-বংশের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা একাদশ-দ্বাদশ শতকে রাজত্ব করেছিল।

৯॥ সুদূর দক্ষিণ (১০০০-১৩০০ খ্রীঃ)

হোয়সলগণ : হোয়সলদের আদি নিবাস ছিল মহীশূরের কদূর জেলায় পরে তাদের এলাকা আরও দক্ষিণে প্রসারিত হয়। চোল-চালুক্যদের সংঘর্ষের সুযোগে তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়। হোয়সল রাজবংশের সূত্রপাত সাল বা নৃপকাম থেকে। পরবর্তী রাজারা ছিলেন বিনয়াদিত্য, এরেয়ঙ্গ ও প্রথম বল্লাল, যিনি দোরসমুদ্র বা দ্বারসমুদ্রে (বর্তমান হালেবিদ) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বল্লাল চালুক্যদের সামন্ত ছিলেন।

১১০৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের ভাই বিট্টিগ বা বিষ্ণুবর্ধন রাজা হয়ে নোঢ়ম্ববাড়ি ও গঙ্গবাড়ি দখল করেন, এবং তারপর কঙ্গুদেশ (সালেম ও কোয়েম্বাটোর জেলাদ্বয়) দখল করে দক্ষিণে একটি গণনীয় শক্তিতে পরিণত হন। উত্তরে তিনি কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য তাঁকে হটিয়ে দেন, এবং বিষ্ণুবর্ধন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

বিষ্ণুবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিজয় নরসিংহ ১১৭৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, অতঃপর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বল্লাল দেবগিরির যাদবদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হন। কল্যাণের কলচুরিদের বিরুদ্ধেও, যারা চালুক্যদের সাময়িকভাবে উৎখাত করেছিল, তিনি যুদ্ধ করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরোপুরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কারণ, তখন আর তাঁর উপরওয়ালা চালুক্য রাজারা বর্তমান ছিলেন না। সুন্দর পাণ্ড্যের বিরুদ্ধে তিনি চোল তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ ও তৃতীয় রাজরাজকে সাহায্য করেছিলেন।

১২২০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বল্লালের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহ ১২৩৪ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, যিনি একদিকে যেমন যাদব আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন অপরদিকে তেমনই পাণ্ড্যদের বিরুদ্ধে চোলদের সাহায্য করেছিলেন। ১২৩১ খৃঃ তিনি সুন্দর পাণ্ড্যকে কাবেরীর তীরে পরাজিত করেন, এবং পাণ্ড্যদের হাতে বন্দী তৃতীয় রাজরাজকে মুক্ত করেন। পরবর্তী রাজা সোমেশ্বর (১২৩৪-৬৩) সুন্দর পাণ্ড্য এবং যাদব কৃষ্ণের হাতে পরাজিত হন।

১২৬৩-তে সোমেশ্বরের মৃত্যু হলে হোয়সল রাজত্ব দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, উত্তরাঞ্চলের মালিক হন সোমেশ্বরের বড় ছেলে তৃতীয় নরসিংহ, দক্ষিণাঞ্চলের মালিক হন তাঁর ছোট ছেলে রামনাথ। নরসিংহ দীর্ঘকাল ধরে যাদব মহাদেব ও রামচন্দ্রকে প্রতিহত করেন। ১২৯১ খৃষ্টাব্দে নরসিংহের পুত্র তৃতীয় বল্লাল হোয়সল রাজত্বের দুই অংশকে পুনরায় এক করেন, এবং যাদবদের

শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু ১৩১০ সালে আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর তাঁকে পরাজিত করেন এবং তিনি দিল্লীর অধীনতা মানতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে খলজী ও তুঘলকদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্থানীয় তুর্কীশক্তিগুলির বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন সংগ্রাম চালিয়ে যান, এবং ত্রিচিনোপোলীতে একটি যুদ্ধ চলাকালীন জয়লাভের মুহূর্তে তিনি নিহত হন। বল্লালের এই প্রতিরোধ পরবর্তী বিজয়নগর রাজ্য গঠনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়েছিল।

পরবর্তী পাণ্ড্যগণ ঃ সুদূরতম দক্ষিণের পাণ্ড্যশক্তির পূর্ব ইতিহাস আমরা আগে উল্লেখ করেছি। চোলশক্তির প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, এবং ১১৬৯ থেকে ১১৭৭ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের ফলে পাণ্ড্যরাজ জটাবর্মা কুলশেখর (১১৯০-১২১৬) বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল ১১৮২, ১১৮৯ ও ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তিনবার পাণ্ড্যরাজ্যে আক্রমণ চালান এবং কুলশেখরকে পরাজিত করেন।

পরবর্তী রাজা, কুলশেখরের ভাই মারবর্মা সুন্দর পাণ্ড্য (১২১৬-১২৩৮), চোল তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গকে পরাজিত করে উরইউর ও তাঞ্জোর অগ্নিদগ্ধ করেন, এবং যদিও হোয়সলদের পাল্টা আক্রমণে চোলদের উপর তাঁর বিজয় বেশি কার্যকর হতে পারেনি। পরবর্তী রাজা মারবর্মা দ্বিতীয় সুন্দর পাণ্ড্যের (১২৩৮-৫১) দুর্বলতার সুযোগে চোল তৃতীয় রাজেন্দ্র পাণ্ড্যদের উপর আবার প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

কিন্তু পরবর্তী রাজা জটাবর্মা প্রথম সুন্দর পাণ্ড্যের আমলে (১২৫১-৬৮) অবস্থার আবার পরিবর্তন হয়। প্রথমেই তিনি চের রাজা উদয়মার্তণ্ডকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি হোয়সলদের দুবার পরাজিত করেন, এবং দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে হোয়সলরাজ সোমেশ্বর নিহত হন। তেলুগু চোড় গণ্ডগোপাল এবং কাকতীয় গণপতি তাঁর হাতে পরাজিত হন। তিনি কঙ্গুদেশও তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি ছিল কার্যত চোলদের উৎখাত করা। সিংহলের উত্তরাঞ্চলেও তিনি প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

পরবর্তী রাজা মারবর্মা কুলশেখর পাণ্ড্য (১২৬৮-১৩১০) তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল ও হোয়সল রামনাথকে পাকাপাকিভাবে পরাজিত করেন (১২৭৯) এবং সিংহলের বশ্যতাও আদায় করেন। তাঁর বৈধ পুত্র ছিলেন সুন্দর পাণ্ড্য এবং অবৈধ পুত্র ছিলেন বীর পাণ্ড্য, কিন্তু কুলশেখর বীর পাণ্ড্যকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে সুন্দর পাণ্ড্য ১৩১০ খৃঃ কুলশেখরকে হত্যা করে সিংহাসন দখল

করেন। কিন্তু বীর পাণ্ড্য সুন্দর পাণ্ড্যকে উৎখাত করলে শেষোক্তজন আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুরের সাহায্য চান। কাফুর দক্ষিণে যুদ্ধ করলেও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন কিনা, করলেও তা কি ধরণের ছিল, এবং তা আদৌ কোন ফল প্রসব করেছিল কিনা, জানা যায় না। কিন্তু এরপরেও দীর্ঘকাল পাণ্ড্যরাজ্য স্বাধীনভাবে টিঁকে ছিল।

চোল সাম্রাজ্য: ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে সুন্দর চোলের পুত্র প্রথম রাজরাজ তাঞ্জোরের সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে চোলশক্তির এক অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। তাঁর রাজত্বের ২৯তম বছরে রচিত তাঞ্জোর লিপিতে তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী লিখিত হয়েছে। ৯৯১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তিনি পশ্চিম গঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত গঙ্গবাড়ি, তড়িগইবাড়ি ও নোঢ়ম্ববাড়ি জয় করেন ও পরে সেগুলি নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। ১০০৭ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে তিনি পশ্চিমী চালুক্যদের রাজ্যে (ইরট্টপাড়ি) ব্যাপক লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চালান, যদিও রাজা সত্যাশ্রয় শেষ পর্যন্ত চোলদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পূর্বী চালুক্যদের (বেঙ্গী) ব্যাপারে রাজরাজ হস্তক্ষেপ করেন এবং শক্তি-বর্মাকে বেঙ্গীর সিংহাসন দখল করতে সাহায্য করেন। শক্তিবর্মার ভাই বিমলাদিত্যের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে তিনি পূর্বী চালুক্যদের সঙ্গে চোলদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ করে তোলেন। বেঙ্গীর উপর অধিকার স্থাপন করে তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। তিনি সিংহল ও মালদ্বীপসমূহ দখল করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকেই তিনি ত্রিবান্দ্রমে চেরদের নৌবাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন।

রাজরাজ মারা যান ১০১৪ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তার বহু আগে থেকেই তাঁর পুত্র প্রথম রাজেন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। রাজেন্দ্র ছিলেন চোলদের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি যাঁর দিগ্বিজয় ও অপরাপর বিষয়সমূহ জানা যায় তিরুবালঙ্গাড়ু লিপি (৩১টি তাম্রশাসন) ও তিরুমালাই পর্বতলিপি থেকে।

রাজেন্দ্র চোল যে সকল দেশ জয় করেছিলেন বলে তিরুমালাই প্রস্তর-লিপিতে উল্লেখ আছে সেগুলি হচ্ছে, ইড়্ইতুর্রইনাড়ু বা রায়চুর দোয়াব, বনবাসি, কোল্লিপ্পাক্কই (হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী কুলপক), মন্নৈকড়ক্কম (মান্যখট, মালখেদ), ঈঢ়ম (সিংহল), মালদ্বীপপুঞ্জ, শান্দিমত্তিবু (আরব সাগরের একটি দ্বীপ), ইরট্টপাড়ি (পশ্চিমী চালুক্য অর্থাৎ কল্যাণের চালুক্য রাজ্য), মুশঙ্গী

(হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত মাসকি), শক্করকোট্টম (বস্তার জেলার অংশ), মতুর-মণ্ডলম, নামনৈকোনম ও পঞ্চপল্লী (পূর্ব মধ্যপ্রদেশ), আদিনগর (উড়িষ্যার জাজনগর), ইন্দ্ররথ (কোসলের সোমবংশীদের কোন এলাকা), ওড্‌ড-বিষয় (উড়িষ্যা), কোসলই-নাড়ু (মহানদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ), তণ্ডভুক্তি (দণ্ডভুক্তি, মেদিনীপুর জেলা), তক্কণলাড়ম ও উত্তিরলাড়ম (দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়) এবং বঙ্গালদেশ (পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ)। যে সকল পরাজিত রাজার নাম ওই লিপিতে উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন পশ্চিমী চালুক্য জয়সিংহ, ধর্মপাল, রণশূর ও গোবিন্দচন্দ্র (বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক) এবং মহীপাল (পালবংশীয় রাজা)।

১০১৮ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সিংহল দখল করেছিলেন। ওই বছরেই চেরদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ তাঁর অধিকারে আসে। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর এক পুত্রকে মাদুরার শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১০২১ খৃষ্টাব্দে তিনি মুশঙ্গির (মাস্কি) যুদ্ধে কল্যাণের চালুক্যরাজ জয়সিংহকে পরাজিত করেন, যদিও পরে জয়সিংহ চোলদের হটিয়ে রায়চুর দোয়াব অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন। এরপর রাজেন্দ্র চোল সমুদ্রের উপকূল ধরে পূর্ব ভারতে অভিযান চালান, এবং গোদাবরী পার হয়ে বস্তার ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে চোলবাহিনী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে পাল-বংশীয় মহীপাল প্রভৃতিকে পরাজিত করেন। গঙ্গা থেকে পবিত্র জল এনে চোলগঙ্গম নামক একটি পুষ্করিণীতে তা ফেলা হয়। তিনি গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরমে (চিদাম্বরমের নিকট) তাঁর নূতন রাজধানীর পত্তন করেন। গঙ্গৈকোণ্ড কথাটির অর্থ গঙ্গাবিজয়ী।

১০২৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ রাজেন্দ্র চোল বর্তমান ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় অভিযান চালান। এই অভিযানের ফলে শ্রীবিজয় (সুমাত্রা), পন্নই (সুমাত্রার পূর্বাঞ্চল), মলইয়ুর (সুমাত্রার নিকটস্থ একটি দ্বীপ), মায়িরুডিঙ্গম (মালয়ের অন্তর্গত লিগোর), ইলঙ্গাশোক (লিগোরের দক্ষিণে), মাপ্পপাড়ম (ক্রা খাঁড়ি), মেবিড়িম্বঙ্গম ও বলইপণ্ডুর (নির্দিষ্ট করা যায় না), তলইতক্কোলম (তক্কোল), মাদমালিঙ্গম (মালয় উপদ্বীপের বান্দোন উপসাগরের নিকট), ইলামুরিদেশম (উত্তর সুমাত্রার অন্তর্গত লামরি), মাণক্কবারম (নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ), ও কড়ারম (পেনাঙের নিকটবর্তী কেডা) তাঁর অধিকারে আসে। কার্যত বঙ্গোপসাগরকে রাজেন্দ্র চোল একটি চোল-হ্রদে পরিণত করেন।

নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই বহির্ভারতে রাজেন্দ্র চোল যুদ্ধ বিগ্রহ চালিয়েছিলেন। রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র উভয়েই ছিলেন নিষ্ঠুর যোদ্ধা, যাঁরা যুদ্ধে ন্যায় নীতির ধার ধারতেন না, লুণ্ঠন, ধ্বংস ও উৎপীড়নে যাঁদের সমকক্ষ খুব কম রাজাই ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন। চোলবাহিনীর হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা প্রবাদ স্বরূপ পরিণত হয়েছিল। ১০২৯ খৃষ্টাব্দে চোলদের বিরুদ্ধে সিংহলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পাণ্ড্য ও চের রাজত্বেও বিদ্রোহ হয় যেগুলি অত্যন্ত নৃশংসতার সঙ্গে রাজেন্দ্রের পুত্র রাজাধিরাজ দমন করেন। রাজেন্দ্রের রাজত্বের শেষের দিকে রাজাধিরাজ কল্যাণের চালুক্য সোমেশ্বর আহরমল্লকে আক্রমণ করেন এবং কৃষ্ণার ওধারে পুণ্ডি নামক স্থানে তাঁকে পরাজিত করে কল্যাণ লুণ্ঠন করেন।

বত্রিশ বছর রাজত্ব করে ১০৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল মারা যান। তাঁর পুত্র রাজাধিরাজ ১০১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে যুবরাজ হিসাবে রাজকার্যে অংশগ্রহণ করতেন। ১০৪৪ থেকে ১০৫২ পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। সিংহলীদের বিদ্রোহ তিনি কঠিন হস্তে দমন করেন এবং সেখানকার প্রাক্তন রাজমাতার নাক কেটে নেন। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে কোপ্পমের যুদ্ধে রাজাধিরাজ চালুক্য সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন, কিন্তু নিজে সেই যুদ্ধে মারা যান। তাঁর ছোট ভাই দ্বিতীয় রাজেন্দ্র (১০৫২-৬৪) যুদ্ধ ক্ষেত্রেই অভিষিক্ত হন। ১০৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গীর পূর্বী চালুক্যদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং পশ্চিমী চালুক্য সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় রাজেন্দ্রের কন্যার সঙ্গে পূর্বী চালুক্য রাজকুমার রাজেন্দ্রের (যিনি প্রথম কুলোত্তুঙ্গ নামে পরে পরিচিত হয়েছিলেন) বিবাহ হয়।

দ্বিতীয় রাজেন্দ্রের পর তাঁর ভাই বীররাজেন্দ্র (১০৬৩-৭০) রাজা হয়ে পশ্চিমী চালুক্য সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন। সোমেশ্বর দ্বিতীয়বার তাঁকে কূড়ল সঙ্গমে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন, যাতে বীর রাজেন্দ্র সাড়া দেন, কিন্তু সোমেশ্বর সেবারে হাজির হননি। তাঁর আমলেও সিংহলে বিদ্রোহ হয়েছিল এবং তিনি তা দমন করেছিলেন। পশ্চিমী চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের দুই পুত্রের—দ্বিতীয় সোমেশ্বর ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের মধ্যে বিরোধ লাগলে তিনি বিক্রমাদিত্যের (যিনি তাঁর জামাতা ছিলেন) হয়ে চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করেন। বীর রাজন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অধিরাজেন্দ্র মাত্র কিছুদিন রাজত্ব করে মারা যান। অতঃপর বিজয়ালয়ের বংশ শেষ হয়ে যায় এবং চোল সম্রাট হন পূর্বী-চালুক্য রাজকুমার কুলোত্তুঙ্গ।

মূল চোলোদের সঙ্গে কুলোত্তুঙ্গ দুদিক দিয়ে সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁর বাবার মা ছিলেন প্রথম রাজরাজ চোলের কন্যা, এবং তাঁর মা ছিলেন প্রথম রাজেন্দ্র চোলের কন্যা। ১০৭০ খৃষ্টাব্দে চোলরাজ হবার আগে কুলোত্তুঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে পশ্চিমী চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ১০৭৩ খৃঃ কলচুরি যশঃকর্ণ কুলোত্তুঙ্গের আসল এলাকা বেঙ্গী আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। ওই বছরেই সিংহল স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এবং কুলোত্তুঙ্গ সিংহলের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়ায় আসতে বাধ্য হন। বেঙ্গীর পূর্বী চালুক্য রাজত্বের সঙ্গে চোল রাজত্বের সংযুক্তি পশ্চিমী চালুক্য-রাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য সুনজরে দেখেন নি, ফলে চোল-চালুক্য সংঘর্ষ আবার শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য ও চেরদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বের প্রথম দিকটা এভাবে অশান্তির মধ্যে কাটলেও, তিনি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেন। ১০৯৬ ও ১১০৬ খৃঃ তিনি পর পর দুবার কলিঙ্গ আক্রমণ করেন এবং অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গকে পরাজিত করেন। উত্তরে কনৌজের গাহড়বালদের সঙ্গে তিনি ভাল সম্পর্ক রেখেছিলেন। কুলোত্তুঙ্গ চোলসাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। সিংহল হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। হোয়সল বিষ্ণুবর্ধন চোলদের কাছ থেকে গঙ্গবাড়ি ও নোড়ম্ববাড়ি দখল করেছিলেন। ১১১৮ খৃঃ পশ্চিমী চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বেঙ্গী দখল করে নেন। ১১২০ খৃঃ কুলোত্তুঙ্গ মারা যান।

কুলোত্তুঙ্গের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিক্রম চোল (১১১৮-৩৫) ১১২৬ খৃঃ পশ্চিমী চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বেঙ্গী পুনরায় দখল করেন। এ ছাড়াও কোলার ও গঙ্গবাড়ির কিছু অংশ পুনরাধিকার করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গের আমলে (১১৩৩-৫০) চোলদের বিশেষ কোন বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়নি। কুলোত্তুঙ্গের পুত্র দ্বিতীয় রাজরাজের আমলে (১১৪৬-৭২) ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে চোলেরা পাণ্ড্যদের আভ্যন্তরীণ সিংহাসনের দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করে এবং কুলশেখর পাণ্ড্যকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু কুলশেখর সিংহলের সহায়তায় চোলদের বিপক্ষে যান, যার ফলে দ্বিতীয় রাজরাজ কুলশেখরের প্রতিদ্বন্দ্বী বীর পাণ্ড্যকে সিংহাসনে বসান। পাণ্ড্যসিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব পরবর্তী চোলরাজ দ্বিতীয় রাজাধিরাজের (১১৬৩-১১৭৯) আমলে শেষ হয়েছিল, এবং বীর পাণ্ড্য সিংহাসন পেয়েছিলেন।

পরবর্তী রাজা তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের আমলে (১১৭৮-১২১৬) বীর পাণ্ড্য

চোলদের বিপক্ষে যান, এবং ১১৮২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কুলোত্তুঙ্গ তাঁকে পদচ্যুত করে কুলশেখরের আত্মীয় বিক্রম পাণ্ড্যকে সিংহাসনে বসান। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে বীর পাণ্ড্য কেরল ও সিংহলের সহায়তায় হৃত অধিকার ফিরে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১১৯০ থেকে ১১৯৪-এর মধ্যে কঙ্গুদেশ চোলদের অধিকারে আসে। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে কুলোত্তুঙ্গ তেলুগু চোড়দের কাছ থেকে কাঞ্চী দখল করেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পাণ্ড্যদেশে অভিযান করেন এবং বিক্রম পাণ্ড্যের পুত্র জটাবর্মা কুলশেখরকে পরাজিত করেন ও মাদুরা ধ্বংস করেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অন্ধ্রদেশ আক্রমণ করেন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্যরাজ মারবর্মা প্রথম সুন্দর পাণ্ড্যের হাতে পরাজিত হন, কিন্তু হোয়সলদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারবর্মা ওই বিজয়ের ফল ভোগ করতে পারেননি।

পরবর্তী চোল রাজা তৃতীয় রাজরাজ (১২১৬-৪৬) হোয়সল, কাকতীয়, কাড়ব ও তেলুগু-চোড়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নাস্তানাবুদ হন এবং পাণ্ড্যদের দ্বারা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে চোলদের বহু সামন্ত হয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে না হয় আনুগত্য বদল করে। পরবর্তী রাজা তৃতীয় রাজেন্দ্র (১২৪৬-৭৯) তেলুগু চোড়দের সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করেন এবং পাণ্ড্যরাজ মারবর্মা দ্বিতীয় সুন্দর পাণ্ড্যকে পরাজিত করেন। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে কাকতীয় গণপতি কাঞ্চী দখল করেন। চোলদের দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে পাণ্ড্যরাজ জটাবর্মা সুন্দর পাণ্ড্য তাদের সমূলে বিনাশ করার জন্য এক বিরাটবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। হোয়েসল সোমেশ্বর, যিনি চোলদের মিত্র ছিলেন, তাঁর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। চোলশক্তি চূড়ান্তভাবে পাণ্ড্যদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। চোলদের মিত্র তেলুগু-চোড়রা উৎখাত প্রাপ্ত হয়, কাকতীয়রা কাঞ্চী থেকে বহিষ্কৃত হয়, নেল্লোর পাণ্ড্যদের অধিকারে আসে। চোলরাজ তৃতীয় রাজেন্দ্র কার্যত পাণ্ড্যদের সামন্তে পরিণত হন।

প্রমাণপঞ্জী

ABBREVIATIONS

ASR=Annual Report of the Archaeological Survey of India ; ABORI=Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute ; CHI=Cambridge History of India, Vol. I, ed. E. J. Rapson ; CII=Corpus Inscriptionum Indicarum ; EI=Epigraphia Indica ; HCIP=History and Culture of the Indian People, Vols. I-V., ed. R. C. Majumder, Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 1951 ff ; IA=Indian Antiquary ; IC=Indian Culture ; IHQ=Indian Historical Quarterly ; JA=Journal Asiatique ; JAHRS=Journal of the Andhra Historical Research Society ; JASB=Journal of the Asiatic Society of Bengal ; JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society ; JBRS=Journal of the Bihar Research Society ; JBORS=Journal of the Bihar and Orissa Research Society ; JDL=Journal of the Department of Letters ; JIH=Journal of Indian History ; JMU=Journal of the Madras University ; JNSI=Journal of the Numismatic Society of India ; JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society ; JRASB (L)=Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal (Letters) ; JUB=Journal of the University of Bombay ; JUPHS=Journal of the U. P. Historical Society ; MASI=Memoirs of the Archaeological Survey of India ; NIA=New Indian Antiquary ; PIHC=Proceedings of the Indian History Congress.

প্রথম অধ্যায়

W. W. Hunter, Imperial Gazetteer of India (1881), 4 : 174ff ; R. C. Dutt, The Pesantry of Bengal (1884) 11ff ; L. T. Hobhouse, et al, Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples (1930) 34ff ; G. Thomson, Studies in Ancient Greek Society (1949) 1 : 33 ; E. O. James, Prehistoric Religion (1957) ch. VI ; N. N. Bhattacharyya, Indian Mother Goddess (1970) 65ff ; History of Indian Cosmogonical Ideas (1971) 13-49 ; D. Chattopadhyaya, Lokayata (1968) 177-231 ; D. N. Majumdar,

Races and Culture of India (1947) 106 ; W. H. R. Rivers, The Todas (1906) ; E. F. V. Haimendorf, An Anthropological Bibliography of South Asia (1958) 485, 491, 493 ; L. A. Cammiade and M. C. Burkitt in Antiquity 4 : 327-39 ; S. N. Chakravarti in JUB 10 : and JRASB (L) 10 : 81-98 ; G. S. Ghurye in NIA 6 : 26-57, 100-139 ; H. De Terra and T. T. Paterson, Studies on the Ice Age in India (1939) 233ff ; V. D. Krishnaswami in 'Ancient India' 3 : 11-57 and 16 ; J. Marshall, Mohenjodaro and the Indus Civilization. 1 (1931) ; M. S. Vats, Excavations at Harappa (1940) ; N. G. Majumdar in MASI, 48 (1934) ; A. Stein in ib, 37 (1929), 42 (1930), 43 (1930) ; E. J. H. Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro (1938) ; V. G. Childe, What Happened in History (1957) ; New Light on the Most Ancient East (1964) 172-188 ; S. Piggott, Prehistoric India (1950) 132-243 ; B and R. Allchin. The Birth of Indian Civilization (1968) ; R. E. M. Wheeler in Ancient India 3 : 58-130 ; Early India and Pakistan (1968) 34ff ; The Indus Civilization (1968) 24ff ; V. R. R. Dikshitar in JMU 16 : 23-37 ; M. Winternitz, History of Indian Literature I (1973) ; B. K. Ghosh in HCIP 1 : 205-244, 337-354, 407-428 ; V. M. Apte in ib 355-406, 429-470, 487-532 ; M. A. Mehendale in ib 471-486 ; A. A. Macdonell, Vedic Mythology (1897) ; A. B. Keith in CHI. 1 : 69-133 ; E. W. Hopkins in ib 203-63.

দ্বিতীয় অধ্যায়

T. W. Rhys Davids, Buddhist India (1903) 1-41 ; in CHI 1 : 152-175 ; C. A. F. Rhys Davids in ib 176-96 ; E. J. Rapson in ib 276-284 ; A. V. W. Jackson in ib, 285-386 ; E. R. Bevan in ib 309-345 ; B. C. Law. India as Described in the Early Texts of Buddhism and Jainism (1941) 134ff ; G. Buhler in EI 1 and 2 ; D. C. Sircar, Select Inscriptions (1942) 1 ff ; R. K. Mukherji in HCIP 2 : 18-100 ; Chandragupta Maurya and His Times (1946); B. M. Barua, Asoka and His Inscriptions (1946) ; D. R. Bhandarkar, Asoka (1932) ; V. A. Smith, Asoka (1920) ; R. Thapar, Asoka and the Decline of the Mauryas (1961) ; H. C. Raychaudhuri, Political History of Ancient India, 5th ed. 302 ff ;

K. Chattopadhyaya in PIHC 4 : 140-147 ; K. G. Sarkar in ABORI 12 : 301-363.

তৃতীয় অধ্যায়

G. Macdonald in CHI, 1 : 384-409 ; F. J. Rapson in ib 463-536 ; D. C. Sircar in HCIP *2* : 101-153, 159-227 ; Successors of the Satavahanas in Lower Deccan (1939) ; S. K. Aiyangar in HCIP 2 : 228-233 ; in ABORI 5 : 34-54 ; in JIH 5 and 6 ; W. W. Tarn, The Greeks in Bactria and India (1938) ; A. Cunningham, Coins of Alexander's Successors in the East (1873) ; A. N. Lahiri, Corpus of Indo Greek Coins (1965) ; R. C. Majumdar in JDL 1 : 65-112 ; in Sir Asutosh Memorial Volume (1926) 2 : 107-117 ; A. P. Banerji.Sastri in IHQ 13 : 199ff ; J. F. Fleet in JRAS (1907) ; K. P. Jayaswal in JBORS 16 : 227-316 ; Sten konow in JIH 12 : 1-46 ; S. Levi in IA 32 : 381ff, 33 : 10 ff, 110 ff ; J. Kennedy in JRAS (1912) 665 ff, 920 ff ; T. W. Kingsmill in JRAS (1882) 74ff ; E. Senart in EI 7 and 8 ; M. Winternitz, History of Indian Literature 2. 611-14 ; H. C. Raychaudhuri PHAI 358 ff, 388-94 ; A. S. Altekar in JNSI 1 : 18-19, 5 : 21-26, 111-134 ; in EI 27 : 252 ff ; Moti Chandra in JNSI *2* : 95-108 ; G. V. Acharya in JRASB (L) 3 (Num. Supp. 47 : 95ff) ; D, R. Bhandarkar in ASR (1913-14) 227 ff ; R. D. Banerji in JRAS (1917) 273 ff ; V. V. Mirashi in JNSI, 2. 83-94 ; S. A. Joglekar in ABORI 27 : 237-287 ; K. D. Bajpai in JUPHS 18 : 204 ; V. A. Smith in JRAS (1914) 317 ff ; M. H. Krishna, Mysore Archaeological Report (1929) 197 ff ; Y. M. Kale in JIH 24 : 124 ff ; M. G. Pai in ib 16 : 1-26, 165-204 ; B. L. Rice, Mysore and Coorg from Inscriptions (1909) ; K. N. S. R. Pillai, The Chronology of the Early Tamils (1932) ; K. G. Sesha Aiyar, Chera Kings of the Sangam Period (1937) ; G. Yazdani, Early History of Deccan (1960), 1-65.

চতুর্থ অধ্যায়

D. R. Bhandarkar, List of Inscriptions, App. to EI 19-23 ; in IHQ, 1 : 150 ff ; in JBBRAS 21 : 405 ff ; J. F. Fleet, CII 3 (1888) ; D. C. Sircar, Select Inscriptions (1942), in HCIP 3 : 117-226 ; in IHQ 9 : 208-214, 20 : 76-82, 26 : 75 ff, 166-69, in

JRASB 11 : 69-74, in QJMS 25 : 299-301. R. C. Majumdar (ed) New History of the Indian People 6 (1946), in HCIP 3 ; 1-95, in JDL 10 : 1-76, in IHQ 20 : 345-350 ; R. D. Banerji, Age of the Imperial Guptas (1933) ; in JBORS 14 : 254-265 ; V. A. Smith in JRAS (1893) 78-148, (1899) 1-141 ; B, Bhattacharyya in JBRS 30 : 1-46 ; B. C. Chabra in IHQ 24 : 104-113 ; B. A. Saletore in ABORI 24 : 120-141 ; P. L. Gupta in JNSI 12 : 103-111 ; A. K. Narain in ib 112-15 ; H. Sastri in JASB, Num. Supp. 11 : 447-477 ; B. P, Sinha in JBRS 34 : 3-4, 18-36 ; J. Nath in IC 5 : 407-414 ; N. R. Ray in IHQ 4 : 453-474 ; K. Gopalachari, Early History of the Andhra Country (1941) K. S. Vaidyanathan in QJMS 30 ; 308-331, 31 : 13-24 ; G. Yazdani, Early History of Deccan (1960) 149-200 ; D. C. Ganguli in IHQ 10 : 337-343, 613-623, 762, 11 : 167-168 ; in JBORS 24 : 221-230 ; B. Ghosh in IC 1 : 510-512 ; D. Sharma in JIH 22 : 93-105 ; R. S. Tripathi in JBORS 20 : 49-79 ; R. S. Saletore in NIA 2 : 354-358, 20 : 49-79 ; R. K. Mookerji in JBORS 15 : 251.62 ; H. C. Ray in IC 8 : 133-36 ; H. C. Raychaudhuri in JBORS 15 : 651-654 ; V. V. Mirashi in IHQ 24 : 148-55 ; in ABORI 25 : 36-50.

পঞ্চম অধ্যায়

R. S. Tripathi, History of Kanauj (1938) ; R. C. Majumder (ed) History of Bengal (1943) chs 4, 5 ; in B. C. Law Volume 1 : 626-641 ; in JBORS 9 : 321-325 ; in JIH 10 (1) ; N. R. Ray in IHQ, 3 ; 769-793 ; D. C. Sircar, The Early Pallavas (1935) ; in IHQ 19 ; 272-281, 26 : 75-79, 241-246, 27 : 321 ff in ; HCIP 3 : 227-254, 275-290 ; C. V. Vaidya in JBBRAS 24 : 236-276 ; D. C. Ganguli in IHQ 23 : 51-55 ; R. G. Basak in ib 8 : 1-20 ; A. C. Banerji in JAHRS 6 : 147-158 ; R. Sathianathier in HCIP 3 : 255-74 ; J. F, Fleet in IA 14 : 342ff ; N. K. Bhattasali in IHQ 21 : 19-28, 143 ff. 22 : 7 ff, 112 ff, 245 ff : R. D. Banerji, History of Orissa, 2 Vols (1930-31) ; H. Sastri in EI 20 : 37-46 ; S. Levi in JA 15 : 401-68 ; U. N. Ghosal in IHQ 18 : 195-207, 302-341, 19 : 27-38, 156-172 ; Rajatarangini, Eng. tr. M. A. Stein (1900) ; B. K. Krishna Rao in PIHC 3 : 386-

410 ; in JAHRS 9 : 1-32 ; G. Yazdani. Early History of Deccan (1960) 201-46.

ষষ্ঠ অধ্যায়

A. S. Altekar, The Rastrakutas and their Times (1934) ; G. Yazdani, Early History of Deccan (1960) 247-334 , H. C. Ray, Dynastic History of Northern India (1973) 2 Vols ; B. C. Sen, Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (1942) : N. Venkataramanayya, The Eastern Calukyas of Vengi (1950) ; K. A. Nilakantha Sastri, The Colas (1955) ; History of South India (1952) ; R. C. Mazumdar (ed), HCIP 4 : 1-167 ; (ed) History of Bengal (1943) 1 : ch VI : in JDL 10 : 1-76 ; R. D. Banerji in JBORS 14 : 476-88 ; K. A. N. Sastri in PIHC 10 : 204-14 ; N. R. Ray in IA, 57 : 230-234 ; S. Levi, Le Nepal 2 : 172-187 ; B. V. Krishna Rao in PIHC 3 : 386-410.

সপ্তম অধ্যায়

H. M. Elliot, History of India (1867 ff) 2 : 434 ff ; A. L. Srivastava, The Sultanate of Delhi (1953) : H. C. Ray, Dynastic History of Northern India (1973) 2 vols ; R. D. Banerji, Haihayas of Tripuri and their Monuments (MASI 23) ; A. K. Majumdar, Chaulukyas of Gujarat (1956) ; N. Venkatarama-nayya, Eastern Calukyas of Vengi (1950) ; K. A. Nilakantha Sastri, The Colas (1955) ; History of South India (1952) ; G. Yazdani, Early History of Deccan (1960), 335 ff, D. C. Ganguli in HCIP 5 : 24 ff, 161 ff ; in IHQ 9 : 951-956, 11 : 564-569, 12 : 607-612 ; P. Saran in HCIP 5 : 116-129 ; A. B. M. Habibullah in ib 130-160 ; S. K. Aiyanger in ib 226-233 ; R. Sathianathaier in ib 234-260 ; A. K. Sur in IHQ 5 : 86-102 ; M, B. Garde in IA 47 : 241 : V. A. Smith in IA 37 : 114-48 ; D. R Bhandarkar in EI 11 : 67 ff ; S. C. Dutt in IHQ 7 : 287 ff ; H. C. Ray in IC 8 : 323-328 ; D. Sharma in IC 11 : 51-73 ; R. C. Majumdar in MM Potdar Commemoration Volume 341 ff ; S. L. Katare in IHQ 13 : 244-254, 17 : 11-34 ; A. Venkatasubbia in IA 47, 48 ; in IC 4 : 233-40 : K. A. N. Sastri in IC 10 ; 35ff ; A. V. V. Ayyar in IA 48 : 112 ff, 133 ff ; M. H. Krishna in PIHC 7 : 177-79 ; B. R. Joshi in IHQ 22 : 172-179.

নির্দেশিকা

—

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯৩৪-) বর্তমানকালের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর *Indian Puberty Rites, Indian Mother Goddess, History of Indian Cosmogonical Ideas*, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। বিভিন্ন গবেষণা-মূলক পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংখ্যাও বড় কম নয়। ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ প্রমুখ বিভিন্ন সংস্থার তরফ থেকে তাঁর উপর বহু গবেষণা প্রকল্প ন্যস্ত আছে। ডঃ ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের অধ্যাপনা করে থাকেন এবং ওই বিভাগেরই উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট আছেন।

আরো বই

ঘোষ, নির্মলকুমার—ভারতশিল্প। সচিত্র।
ভারতের চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সৌন্দর্যতত্ত্ব, শিল্পের বর্ণমালা, শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ ও তৎসহ চৈনিক শিল্পের ষড়ঙ্গ ও পাশ্চাত্ত্যের শিল্পসূত্র সম্পর্কে ইতিহাস ও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ।

মিত্র, অমলেন্দু—রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর। ১৫·০০
সচিত্র গবেষণা। রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল—বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম। ৬·০০
বৌদ্ধধর্মের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য সম্পর্কে একখানি সংক্ষিপ্ত পূর্ণাংগ ইতিহাস।

মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচৈতন্য—ফাহিয়েনের দেখা ভারত। ৩·০০
বাংলায় অনূদিত ভারতের ইতিহাস বিষয়ক বহু পরিচিত গ্রন্থ।

জানা, মনোরঞ্জন—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ ৪·০০

সান্যাল, তারাপদ—নবদ্বীপে তন্ত্র সাধনা। ৫·০০
তন্ত্র সাধনার এক অধ্যায়।

ভট্টাচার্য, অবিনাশচন্দ্র—বহির্ভারতের মুক্তিপ্রয়াস। ৬·০০
আমেরিকা, জার্মাণী, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকার বিবরণ।

সেন, অমলেন্দু—জীব অভিধান ৫·০০

সিংহ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ—বাংলার অর্থ নৈতিক জীবন ৭·০০

চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ১০·০০
আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব